আধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও বহুমুখী বিদ্যালয়সমূহের নবম ও দশম শ্রেণীর জন্য মধ্যশিক্ষা পর্ষদের তারিখ 30. 3 1962 SYL/1/62 নং সার্কুলারের পাঠ-ক্রম অনুসারে লিখিত

বিজ্ঞান প্রবেশিকা

[General Science : *Classes IX & X*]

শ্রীরমেশচন্দ্র সেন, এম্. এস্-সি.,

অধ্যাপক, রামকৃষ্ণ মিশন কলেজ, নরেন্দ্রপুর, প্রাক্তন অধ্যাপক, বঙ্গবাসী কলেজ, বি, এম, কলেজ, কলিকাতা ও বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষক

ও

শ্রীচিত্তরঞ্জন দাসগুপ্ত, এম্. এস্-সি.

অধ্যাপক, সিটি কলেজ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষক। 'A Text Book of Intermediate Physics', (উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের) 'পদার্থ বিজ্ঞান', 'ব্যবহারিক পদার্থ বিজ্ঞান' (Practical Physics) প্রভৃতির লেখক।

বুক সিণ্ডিকেট প্রাইভেট লিমিটেড

৬, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট ঃ কলিকাতা-৯

প্রথম সংস্করণ,—মার্চ, ১৯৫৬

দ্বিতীয় সংস্কবণ—মে, ১৯৫৮

তৃতীয় সংস্করণ—এপ্রিল, ১৯৫৯

চতুর্থ সংস্করণ—ফেব্রুয়ারী, ১৯৬০

পঞ্চম সংস্করণ—নভেম্বর, ১৯৬০

Published and Printed by Sri P. C. Bhowal, for Book Syndicate
Private Ltd., 6, Ramanath Mazumdar Street, Calcutta-9
at Nabasakti Press, 123, Acharya Jagadish Bose
Road, Calcutta-14.

ভূমিকা

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নব-প্রবর্তিত উচ্চ মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠ-ক্রম অনুযায়ী সাধারণ বিজ্ঞানের এই পুস্তকখানি রচিত হইল। কাব্যে অথবা কথা-সাহিত্যে বাংলা ভাষা আঙ্গিকের দিক দিয়া যেমনই সুপরিণত ও সমৃদ্ধ, বৈজ্ঞানিক বিষয়বস্তুর প্রকাশে উহা তেমনই দরিদ্র। ইহার প্রধান কারণ, বিজ্ঞান আমাদের জীবনযাত্রার সহিত আজও অঙ্গাঙ্গি নহে। বিভিন্ন বিজ্ঞানের অতি মৌলিক বিষয়গুলি আলোচনা করিতে গেলেও সর্বজনগ্রাহ্য কথার অভাবে পুস্তকের ভাষা খানিকটা জড় ও অপরিচিত হইয়া পড়ে। সর্বক্ষেত্রে স্থানীয় ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান স্বীকার করিয়া না লইলে বৈজ্ঞানিক কথাগুলির সহিত সহজ পরিচয় আরও বিলম্বিত হইবে। বিজ্ঞান শিক্ষা, বিশেষতঃ প্রাথমিক পর্যায়ে, একান্তভাবেই পরীক্ষামূলক বলিয়া শিক্ষা-ব্যবস্থায় যাহাতে বিভিন্ন প্রকারের পরীক্ষা দেখিবার ও দেখাইবার সুযোগ থাকে সেদিকেও আমাদের বিশেষ মনোযোগ না থাকিলে বিজ্ঞানশিক্ষণ সম্যক্ সফল হইবে না।

এই পুস্তকে সাধারণ বিজ্ঞানের বিষয়গুলি সহজ ও সাধারণ ভাবেই বলিবার চেষ্টা করা হইয়াছে এবং প্রসঙ্গানুযায়ী বিভিন্ন পরীক্ষার উল্লেখ করা হইয়াছে। পুস্তক যন্ত্র মাত্র; যিনি শিক্ষাদান করিবেন, তিনিই শিক্ষাযজ্ঞের হোতা। তাঁহাদের নিকট হইতে এই পুস্তকের ত্রুটি-বিচ্যুতি ও উন্নয়ন সম্পর্কে মতামত সাদরে গৃহীত হইবে।

শ্রীরমেশচন্দ্র সেন
শ্রীচিত্তরঞ্জন দাশগুপ্ত

BOARD OF SECONDARY EDUCATION, WEST BENGAL

[FOR BOTH CLASS X AND CLASS XI SCHOOLS]

Vide Notification No. SYL/1/62 dated the 30th March, 1962. School Final Examination, 1965 onwards.

The curriculum and syllabuses for the X-Class Schools as have been modified to bring about parity, as much as practicable, with those of the XI-Class schools are given in the following pages. Instructions to authors and publishers for preparation of the books according to these modified syllabuses are also given.

The modified syllabuses will be introduced in the schools from the academic session commencing from 1st January, 1963. The first batch of pupils following the modified curriculum and syllabuses will take the school final examination in 1963.

SYLLABUS IN GENERAL SCIENCE

CLASS IX

Course Contents	Demonstration & Experiments
A. *MECHANICS :*	
1. What makes work hard, weight, friction, inertia.	
2. General notion of gravitation, Newton's Law of attraction. Simple explanation of movement of Moon and of artificial satelities. Simple explanation of tides.	
3. Simple machines to make work easier: inclined plane; lever, pulleys. (Simple pulleys).	Demonstration, experiments with inclined plane, pulleys.
1. Light travels in a straight line ; shadows ; eclipses.	Construction of a pinhole camera.

B. *LIGHT :*

No.	Topic	Experiments
2.	Light travels with finite velocity (simple statement); Light from the sun takes 8 mins. to reach us. Light travels faster than sound. Lighting is seen before thunder is heard.	
3.	Reflection of light at plane and spherical mirrors; convex and concave (focus and focal length). Real and virtual images (no mathematical formulae).	Construction of a periscope. Formation of images by mirrors.
4.	Refraction; convex lens. Focus and focal length (no mathematical formulae).	Experiments on refraction through glass and water. Formation of images by lenses.
5.	The eye as a lens (simple explanation).	Demonstration of principal parts of telescope and of simple and compound microscope.
6.	The Prism, dispersion of colours.	Demonstration of model of an eye. Use of prism to show formation of spectrum.

C. *HEAT :*

No.	Topic	Experiments
1.	Main sources of heat: Sun, mechanical action (friction), chemical reactions (burning of fuels), electricity.	
2.	Effects of heat: Expansion of solids, liquids, gases (examples and applications). land and sea breezes.	Ball and ring experiment. Expansion of different metals, of liquid and gases.
3.	Heat and Temperature: Thermometers: fixed points scales, maximum and minimum thermometer; clinical thermometer.	
4.	Change of state: Melting, freezing; evaporation, boiling, condensation; heat is required for melting and evaporation.	Melting and boiling point of different substances; preparation of ice by rapid evaporation of ether.

5.	How heat travels; conduction (clothing and body covering), convection (heating and ventilation), Radiation.	Conduction—experiments: convection of liquids and gases.
D.	*CHEMICAL REACTIONS:*	
1.	Acids, bases and salts (to be treated mainly by examples).	Hydrochloric, sulphuric, nitric-acids; caustic potash, caustic soda and barium hydroxide; common salt.
2.	Chemical composition and principal uses of common salt, sodium carbonate, caustic soda, Hydrochloric acid.	
3.	Nitrogen cycle and nitrogen compounds in agriculture: Fertilisers—Ammonium sulphates and nitrates: Bacterial action—nodules of leguminous plants; crop rotation.	
4.	Lime and its products; chalk; lime-burning; quick-lime and slaked lime.	Action of water on quick-lime, action of carbon dioxide on lime water.
5.	Hard water and soft water—methods of softening water.	Use of soaps in different kinds of water (before and after boiling).
E.	*LIVING BEINGS:*	
1.	Outline of internal and external structure of toad or frog and of common fish.	Demonstration of principal structure by dissection.
F.	*THE HUMAN BODY:*	
1.	Human blood; the blood circulation, pumping action of heart: arteries; capillaries; veins; feeling and pulse; red and white corpuscles.	Charts on blood circulation. Demonstration of first aid in bleeding including use of tourniquet.
2.	Digestive system of man; mouth; tongue; gullet; stomach; small intestine; pancreas; Liver, Action of Enzymes in aiding digestion.	Charts on digestive system.

3. Food ; source of energy for Man ; our food needs, balanced diet (protein, fat, carbohydrate, salt, water, vitamin, roughage).

CLASS X

A. *SOUND :*

	Topic	Activity
1.	Production by a vibrating body.	Vibrating tuning fork ; sonometer ; working of sound box of gramophone.
2.	Material medium necessary for transmission of sound.	Demonstration with vacuum pump and bell.
3.	Reflection, echoes.	
4.	How we hear : the human ear.	Demonstration of model of the ear.

B. *ELECTRICITY :*

	Topic	Activity
1.	Electric current and voltaic cell ; idea of electric potential (compare with waterfall).	Working of simple voltaic cell.
2.	Effects of electric current ; magnetic, heating, chemical ; Electric bell.	Construction of electromagnet, assembling an electric bell ; electrolysis.
3.	Idea of intensity (like flow of water per unit time : something pushed). Idea of resistance (compare flow of water through pipe ; pipe offers resistance to flow).	
4.	Interaction of electricity and magnetism.	Simple experiments to show action of magnet on current and current on magnet.
5.	Electromagnetic induction (Faraday).	Experiments on electro-magnetic induction.
6.	Deniel cell, Leclanche cell and lead accumulators. (No explanation of chemical reaction required).	Handling of Deniel cell and Leclanche cell (dry and wet) and lead accumulator :

7. Electricity as energy: Motors, Heating and lighting; Electric lamps.	Working models; handling an electric iron, stove and heater; study of a fan regulator.
8. Electricity for communication: telegraph, telephone.	Model of telegraph.

C. *METALS :*

1. Study of the natural occurrence and properties and uses of the following metals and alloys. iron, copper, aluminium, zinc, steel, brass, bell-metal.
   (Details of methods of extraction are not required).

D. *LIVING BEING :*

1. Elementary idea about structrue and life history of amoeba, spirogyra (algae), yeast and fern.	Demonstration by charts and specimens.

E. *GENERAL IDEAS ABOUT :*

1. (a) Evolution, (b) Heredity, (c) Adaptation.	Demonstration by charts.

F. *COMMON DISEASES AND EPIDEMICS :*

Brief and elementary statement of main symptoms, causes, treatment and prevention in each case. (i) Air-borne diseases, common cold, influenza. (ii) Water-borne diseases, cholera, typhoid, dysentery. (iii) Insect-borne disease, Malaria, plague. (iv) Diseases by contact, Ringwarm, scabies.	Demonstration by charts.

সূচীপত্র

নবম শ্রেণী

[Class IX]

দশম শ্রেণী

[Class X]

প্রবেশক

আমাদিগকে ঘিরিয়া যে বিশাল ও বিচিত্র বস্তুজগৎ অবস্থিত, তাহাকে সম্যকরূপে জানিবার আকাঙ্ক্ষাই বিজ্ঞান শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য। বিজ্ঞান প্রধানত পরীক্ষামূলক এবং ব্যক্তি-নিরপেক্ষ। সুস্থ ও অক্ষত একটি মটরের বীজ উপযুক্ত আলো বাতাস পাইলে অঙ্কুরিত হইবে, উর্বর মাটিতে পড়িলে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে এবং যথাসময়ে ফুলে ফলে পরিশোভিত হইবে—ইহাই বৈজ্ঞানিক সত্য। এই পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে হাইড্রোজেন জ্বালাইলে উহা জ্বলে এবং হাইড্রোজেনের সহিত বায়ুস্থিত অক্সিজেনের রাসায়নিক মিলনে জল উৎপন্ন হয়, এই তত্ত্ব কাহারও ব্যক্তিগত ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না। ম্যালেরিয়ার জীবাণু মশকীর দেহে কিরূপে সংক্রমিত হয়, কি অবস্থায় উহা মানবদেহে বিস্তারলাভ করে এবং কুইনাইন কিরূপে সেই জীবাণু ধ্বংস করে, ইহা যে-কোন ব্যক্তি উপযুক্ত যন্ত্রপাতির সাহায্যে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন। কোন বিষয় জানিবার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি তিনভাগে বিভক্ত—(1) **পরীক্ষা** (experiment), (2) **নিরীক্ষা** (observation), এবং (3) **সিদ্ধান্ত** (inference)। বিজ্ঞানী কোন বিশেষ পারিপার্শ্বিক অবস্থায় কোন বিষয় লইয়া পরীক্ষা করেন, পরীক্ষার ফলে যে-সকল পরিবর্তন ঘটে, তাহা অতি সতর্কতার সহিত নিরীক্ষণ করেন এবং কোন পরিচিত প্রাকৃতিক নিয়মের সহিত কোথাও মিল ঘটিলে, তাহা পর্যালোচনা করিয়া কোন একটি বিশেষ সিদ্ধান্তে উপনীত হন। যেখানে পরীক্ষা সম্ভব নহে, সেখানে অন্যান্য সমপর্যায়ের অভিজ্ঞতা হইতে যতখানি অনুমান করা যুক্তিসঙ্গত, বিজ্ঞানী তাহাই স্বীকার করিয়া লইয়া তদনুযায়ী অগ্রসর হইয়া থাকেন। সূর্যের বর্ণালী বিশ্লেষণ করিয়া বিজ্ঞানী যখন দেখেন, উহার সহিত হাইড্রোজেন অথবা হিলিয়াম বর্ণালীর মিল আছে তখন তিনি সিদ্ধান্ত করেন যে, সূর্যমণ্ডলে হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম বর্তমান। যন্ত্রপাতির ক্ষমতা সীমিত হইলেও বিজ্ঞানী তাহার কল্পনার আলোকে জগতে নূতন নূতন তথ্য আবিষ্কার করেন। অতি সূক্ষ্মতম পরমাণুর মধ্যে আজ মানুষ যে অপরিমেয় শক্তির সন্ধান পাইয়াছে, তাহা মানব-সভ্যতায় এক নূতন যুগের সূচনা করিতেছে।

১

বল বিজ্ঞান
Mechanics

1. কার্য [Work]

আমাদের জীবনযাত্রায় কাযের উদাহরণ আমরা সর্বদাই দেখিতে পাই। যখন কুলীরা মোট বহন করে, ঘোড়া বা গরু গাড়ি টানে, মালী কুয়া হইতে জল তোলে, মাঝি দাঁড় বাহিয়া নৌকা চালায়, মানুষ হাটিয়া একস্থান হইতে অন্যস্থানে যায়, তখন তাহারা প্রত্যেকেই কিছু কায করে। প্রকৃতপক্ষে

ঘোড়া গাড়ি টানিয়া, মাঝি নৌকা বাহিয়া কার্য করে

আমরা সব সময়ই কিছু-না-কিছু কায করিতেছি। যখন আমরা ঘুমাইয়া থাকি তখনও আমাদের হৃৎপিণ্ড ধুকধুক্ করিয়া স্পন্দিত হইয়া কায করিয়া চলিয়াছে। সাধারণভাবে কায বলিতে আমরা এমন কিছু বুঝি যাহার ফলে দৈহিক ক্লান্তি বা অবসাদ ঘটে। কিন্তু বিজ্ঞানের ভাষায় 'কার্য' কথাটির একটু অন্য অর্থ আছে। নিম্নের উদাহরণে তাহা স্পষ্ট হইবে।

মনে কর, একদল রাজমিস্ত্রী বাড়ী তৈয়ারী করিবার জন্য মাথায় করিয়া ইট বহন করিয়া উচ্চে তুলিতেছে। এস্থলে দুইজন মিস্ত্রীর কাযের পরিমাণ যদি তুলনা করিতে হয় তবে স্বভাবতঃই মনে হয় যে-মিস্ত্রী বেশী সংখ্যায় ইট তুলিল সেই বুঝি বেশী কায করিল। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নয়। যদি কোন মিস্ত্রী 100 খানা ইট 40 ফুট উচ্চে তোলে এবং অন্য মিস্ত্রী ঐ 100 খানা ইট 20 ফুট তোলে তবে প্রথম জন দ্বিতীয় জন অপেক্ষা দ্বিগুণ কায করিল।

সুতরাং উপরোক্ত কার্যের পরিমাণ করিতে গেলে দুইটি জিনিসের প্রয়োজন হইতেছে — যে-দ্রব্য তোলা হইতেছে তাহার ওজনকে কাটাইবার জন্য প্রদত্ত বল (force) এবং যতদুর তোলা হইতেছে সেই দূরত্ব (distance)।

কুলী যখন মোট বহন করে তখন সে কিছু কার্য করে : রাজমিস্ত্রী ইট তুলিয়া কার্য করিবার সময় কত বল প্রয়োগ করিতেছে এবং কত উচ্চে তুলিতেছে তাহা জানা দরকার

প্রকৃতপক্ষে যে-কোন কার্যের পরিমাপ করিতে গেলে যতটা বল প্রযুক্ত হইতেছে এবং বলের প্রয়োগ-বিন্দু (point of application) যতটা সরিয়া যাইতেছে তাহার গুণফল নির্ণয় করিতে হইবে। অর্থাৎ,

কৃত কার্য = প্রযুক্ত বল × বলের প্রয়োগ-বিন্দুর স্থানচ্যুতি

পাথরখণ্ড না সরিলে লোকটির কোন কাজ হইবে না

সুতরাং ইহা হইতে বোঝা যাইতেছে যে, প্রযুক্ত বল যতই হউক না কেন, বলের প্রয়োগ-বিন্দুর কোন স্থানচ্যুতি না হইলে পদার্থ-বিজ্ঞান অনুযায়ী কোন কার্যই করা হইল না। যেমন, বিরাট্ এক পাথরখণ্ডকে যতই ধাক্কা দিয়া সরাইবার জন্য চেষ্টা করিয়া গলদ্‌ঘর্ম হওয়া যাউক না কেন পাথরখণ্ড না সরিলে কোন কার্য করাই হইল না। যদিও সাধারণভাবে আমরা বলিব যে পাথর-খণ্ডকে সরাইবার জন্য তুমি যথেষ্ট কাজ করিলে।

2. কার্য করিতে কষ্ট হয় কেন ?

যখন কামার হাতুড়ি পিটায় বা ঘোড়া ভারী মালসহ গাড়ি টানে তখন তাহাদের ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত দেখায়। অর্থাৎ, সহজ কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয় যে, কোন কার্য করিলে কিছু-না-কিছু কষ্ট হয়। কেন এরূপ কষ্ট হয় ?

আমরা জানি, বাধা অতিক্রম করিবার জন্য বলের প্রয়োজন হয় এবং যখনই বলপ্রয়োগ করিতে হয় তখনই আমাদের মাংসপেশী কার্য করে এবং তাহার ফলে আমরা ক্লান্তি অনুভব করি। এই বাধা তিন রকমে আসিতে পারে। প্রথমত বস্তুর ওজনের দরুন বাধা, দ্বিতীয়ত ঘর্ষণ (friction)-জনিত বাধা ও তৃতীয়ত জাড্য (inertia)-জনিত বাধা। নিম্নে ইহাদের সম্বন্ধে আলোচনা করা হইল।

বস্তুর ওজন ঃ

সকল বস্তুরই ওজন আছে ইহা তোমরা জান। হাতের উপর কোন বস্তুকে রাখিলে আমরা সহজেই ঐ ওজন অনুভব করি। কোন কোন বস্তুর ওজন এত বেশী যে হাতের উপর রাখা বা টানিয়া তোলা সম্ভব নয়। বস্তুর এই ওজন কোথা হইতে আসে বলিতে পার কি ? পৃথিবী প্রত্যেক বস্তুকে নিজ কেন্দ্রের দিকে আকর্ষণ করে। বস্তুর উপর পৃথিবীর এই নিম্নাভিমুখী আকর্ষণই বস্তুর ওজন। বস্তুর ভিতর যত বেশী পদার্থ থাকিবে উহার উপর পৃথিবীর আকর্ষণ বল তত বৃদ্ধি পাইবে, সুতরাং উহার ওজনও তত বাড়িয়া যাইবে। তাই, একটি বাটির যা ওজন হইবে একটি বালতির ওজন তার চাইতে বেশী হইবে ; আবার বালতিটি জল ভর্তি করিলে ওজন আরও বাড়িয়া যাইবে।

কুয়া হইতে জল তুলিতে কষ্ট বোধ হয় কারণ পৃথিবীর আকর্ষণ

যখন আমরা কুয়া হইতে বালতি করিয়া জল তুলি তখন আমরা কষ্ট অনুভব করি। কারণ বালতি এবং ভিতরকার জলের যে ওজন অর্থাৎ উহাদের উপর পৃথিবীর যে নিম্নাভিমুখী আকর্ষণ তাহাকে কাটাইয়া বালতি উপরে তুলিতে হয় বলিয়া আমরা কষ্ট অনুভব করি। এই রকম যে-কোন জিনিসকে

মাটি হইতে উপরে তুলিতে হইলে আমাদের কষ্ট হয়। যদি পৃথিবীর কোন আকর্ষণ না থাকিত তবে কোন বস্তুর ওজনও থাকিত না, এবং বস্তুকে উপরে তুলিতে কোন কষ্টই হইত না।

ঘর্ষণ ঃ

তোমরা যাহারা সাইকেল চালাইতে জান তাহারা নিশ্চয় দেখিয়াছ যে, মাঠের উপর দিয়া সাইকেল চালাইতে যতটা কষ্ট হয়, মসৃণ পীচের রাস্তার উপর ততটা হয় না।

একটি বলকে মাটির উপর গড়াইয়া দাও, উহা মাটিতে যতদূর যাইবে মসৃণ সিমেন্টের মেঝের উপর অনেক বেশী দূর যাইবে।

নতুন জুতার তলা পালিশ থাকায় মসৃণ মেঝের উপর নতুন জুতা পরিয়া হাঁটিলে পা পিছলাইয়া যায়, কিন্তু পুরানো জুতা পরিলে পিছলায় না, কেন এইরকম হয় বলিতে পার?

ইহার কারণ এই যে, দুইটি বস্তুকে সংস্পর্শে আনিলে উহাদের ভিতর ঘর্ষণজনিত বাধা কাজ করে। বস্তু দুইটি মসৃণ হইলে বাধা কম হয় এবং অমসৃণ হইলে বাধা বেশী হয়। এই কারণে যখনই একটি বস্তু অন্য বস্তুর উপর দিয়া চালাইয়া লইবার চেষ্টা করা হয় তখন বস্তু যেদিকে যাইবে ঘর্ষণজনিত বাধা তাহার বিপরীত দিকে ক্রিয়া করিয়া বস্তুর গতিকে বাধা দিবার চেষ্টা করিবে। এই বাধাকে অতিক্রম করিতে গেলে কাজ করিতে হয় এবং তাহাতে আমরা কষ্ট বোধ করি।

রোলার যেদিকে চলে ঘর্ষণ-বল তাহার বিপরীত দিকে ক্রিয়া করে

অসমতল মাঠের উপর দিয়া যখন রোলার টানা হয় তখন রোলার যেদিকে যায় ঘর্ষণ-বল তাহার বিপরীত দিকে ক্রিয়া করে। তাই রোলার টানিতে কষ্ট হয়। যদিও ঘর্ষণ বলকে অতিক্রম করিতে আমাদের কষ্ট হয়, আমরা অসুবিধা বোধ করি, তথাপি অনেক ক্ষেত্রে ঘর্ষণ আমাদের সুবিধা দেয়।

তুমি যে বইখানি হাতে লইয়া পড়িতেছ, ঘর্ষণ না থাকিলে বইখানি তুমি হাতে ধরিয়া রাখিতে পারিতে না—হাত হইতে পিছলাইয়া পড়িয়া যাইত। রাস্তা দিয়া আমরা হাঁটিতে পারি ঘর্ষণ আছে বলিয়া ; ঘর্ষণ না থাকিলে আমাদের পা পিছলাইয়া যাইত, আমরা হাঁটিতে পারিতাম না। জল পড়িয়া কোন জায়গা স্যাতসেঁতে, পিছল হইলে সেখান দিয়া হাঁটা কত শক্ত তাহা তোমরা সকলেই জান। সুতরাং অনেক ক্ষেত্রে ঘর্ষণ আমাদের সুবিধা করিয়া দেয়।

ঘর্ষণ না থাকিলে বই হাত হইতে পিছলাইয়া পড়িয়া যাইত

জাড্য :

ইহা জড় পদার্থের একটি সাধারণ ধর্ম। ইহার ফলে বস্তু আপনা হইতে নিজের অবস্থা পরিবর্তন করিতে পারে না। যে-বস্তুটি স্থির আছে তাহা চিরকালই স্থির থাকিতে চেষ্টা করিবে এবং যে-বস্তুটি গতিশীল তাহা চিরকালই সমবেগে সরলরেখা বরাবর চলিতে চেষ্টা করিবে যতক্ষণ পর্যন্ত না বাহির হইতে বস্তুর উপর কোন বলপ্রয়োগ করিয়া তাহাকে থামানো হইতেছে বা আরো জোরে চালানো হইতেছে।

তোমার সম্মুখে টেবিলের উপর যে-বইটি রহিয়াছে তাহাকে তুমি যতক্ষণ পর্যন্ত না নাড়াইতেছ ততক্ষণ উহা ঐভাবেই থাকিবে। আপনা হইতে বইটি নড়িয়া উঠিতে পারে না।

একটি বলকে মাটিতে গড়াইয়া দিলে অবশ্য আমরা দেখি যে, কিছুদূর গিয়া উহা থামিয়া যায় ; চিরকাল চলে না। আসলে বলটি আপনা হইতে থামে না। মাটির সহিত ঘর্ষণের ফলে এবং বায়ুর বাধার জন্য বলটি আস্তে আস্তে থামিয়া যায়। এই সকল বাধা না থাকিলে বলটিকে একবার চালাইয়া দিলে উহা চিরকাল গতি বজায় রাখিত। মাটি অপেক্ষা বরফ অনেক মসৃণ। তাই মাটিতে একটি বল গড়াইয়া দিলে যতদূর যাইবে বরফের উপর তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী দূর যাইবে।

অবস্থা পরিবর্তনের এই অসামর্থ্যকে জড়পদার্থের জাড্য বলা হয়। ইহা হইতে আমরা সহজে বুঝিতে পারি যে, যে-বস্তু স্থির আছে তাহার স্থিতি-জাড্য নষ্ট করিয়া চালাইতে চেষ্টা করিলে অথবা যে-বস্তু গতিশীল তাহার গতি-

জাড্য নষ্ট করিয়া থামাইতে হইলে কিছু বাধা অতিক্রম করিতে হইবে। কাজেই আমরা কষ্ট অনুভব করিব।

যেমন, মাল বোঝাই একটি ঠেলাগাড়ি প্রথমে চালাইতে হইলে যতটা কষ্ট হইবে একবার চলিতে আরম্ভ করিলে তখন আর ততটা কষ্ট হয় না।
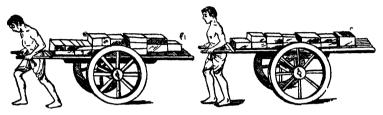
মালসহ গাড়ি চালাইতে বেশ কষ্ট হয় ; কিন্তু একবার চলিতে আরম্ভ করিলে আর তত কষ্ট হয় না

সামান্য টানিলেই গাড়ি চলিতে থাকে। তেমনি ঐ চলন্ত ঠেলাগাড়িটিকে থামাইতে গেলেও বেশ কষ্ট হইবে—সঙ্গে সঙ্গে উহাকে থামানো যাইবে না ; বিপরীত দিক হইতে যথেষ্ট বলপ্রয়োগ করিতে হইবে। সুতরাং বোঝা যাইতেছে যে, স্থির অবস্থা হইতে প্রথমে চালাইতে গেলে অথবা চলন্ত অবস্থা হইতে থামাইতে গেলে কাজটা একটু কঠিন হইয়া পড়ে। ফলে কষ্ট বোধ হয়।

3. কার্য সহজ করিবার উপায় : যন্ত্র

কার্য যত কঠিন হয় মানুষ তত তাহার বুদ্ধি প্রয়োগ করিয়া সেই কার্যকে সহজ করিবার উপায় উদ্ভাবন করে। ইহার ফলে নানাবিধ যন্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছে। যে-যুগে আমরা আজকাল বাস করিতেছি তাহাকে অনায়াসে যান্ত্রিক যুগ বলা যাইতে পারে। এই যুগে মানুষ নানা উপায়ে তাহার কায়িক পরিশ্রমকে লঘু করিয়া কঠিন কার্য সম্পাদন করিতেছে। ভারি বোঝা আর মাথায় করিয়া উপরে তুলিবার প্রয়োজন নাই—সে-কার্য সম্পাদন করিতেছে বিদ্যুৎ-চালিত ক্রেন ; গ্রীষ্মাধিক্যে কায়িক পরিশ্রম করিয়া হাতপাখা চালাইবার প্রয়োজন নাই—বৈদ্যুতিক পাখা সে-কার্যের ভার লইয়াছে ; দূরদূরান্তরে গমন করিবার জন্য পায়ে হাঁটিয়া দৈহিক পরিশ্রমের দিন শেষ

হইয়াছে—আজ মানুষ যন্ত্রের সাহায্যে অল্প সময়ে হাজার হাজার মাইল দূরত্ব অতিক্রম করিতেছে।

বিজ্ঞানের ভাষায় **যন্ত্র বলিতে আমরা সেই ব্যবস্থাকে বুঝি যাহা দিয়া সামান্য বলপ্রয়োগে বিপুল বাধাকে অতিক্রম করা যায়।** সাধারণত যন্ত্রের গঠন-প্রণালী খুব জটিল। কিন্তু নিম্নলিখিত কয়েকটি যন্ত্রকে সরল যন্ত্র (Simple machine) বলা যাইতে পারে। যথা—(1) লিভার (Lever) বা দণ্ড, (2) কপিকল (Pulley) ও (3) নত তল (Inclined plane)।

এই যন্ত্রগুলির সাহায্যে কম আয়াসে গুরুভার দ্রব্য উত্তোলন করা যায়। যন্ত্রের সাহায্যে আমরা যে-সুবিধা পাইয়া থাকি তাহাকে যান্ত্রিক সুবিধা (mechanical advantage) বলে। ইহা উত্তোলিত ভার বা বোঝা (W) ও প্রদত্ত বলের (P) অনুপাতের সমান। অর্থাৎ,

$$\text{যান্ত্রিক সুবিধা} = \frac{\text{উত্তোলিত ভার}}{\text{প্রদত্ত বল}} = \frac{W}{P}$$

নিম্নে উপরোক্ত যন্ত্রগুলির সম্বন্ধে আলোচনা করা হইল।

4. **লিভার** বা **দণ্ড**

ইহা একটি শক্ত দণ্ড এবং একটি স্থিরবিন্দুকে কেন্দ্র করিয়া অবাধে ঘুরিতে সক্ষম। এই স্থিরবিন্দুকে বলা হয় আলম্ব (fulcrum)। এই দণ্ডের এক অংশে বলপ্রয়োগ করিতে হয় এবং অপর অংশে অতিক্রমণীয় বাধা বা ভার প্রয়োগ করা হয়। লিভার তিন রকমের হইতে পারে।

(1) **প্রথম শ্রেণীর লিভার :**

চিত্রে এই লিভারের কার্যপ্রণালী ও প্রকৃত প্রয়োগ দেখানো হইল। AB হইল লিভার। ইহার আলম্ব হইল C বিন্দু এবং ইহা দণ্ডের কোন এক প্রান্তের নিকটবর্তী। চিত্রে ইহা B প্রান্তের নিকটবর্তী দেখানো হইয়াছে। দূরবর্তী প্রান্তে অর্থাৎ A প্রান্তে বলপ্রয়োগ করিতে হয় এবং নিকটবর্তী প্রান্তে

অর্থাৎ B প্রান্তে ভার বা বোঝা থাকে P যদি প্রযুক্ত বল ও W যদি ভার হয়, তবে গাণিতিক নিয়মানুযায়ী,
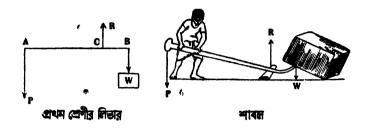
প্রথম শ্রেণীর লিভার শাবল

$$P\ AC = W.\ BC$$

অথবা, $\frac{W}{P} = \frac{AC}{BC}$

অথবা, যান্ত্রিক সুবিধা $= \frac{AC}{BC}$

যেহেতু BC অপেক্ষা AC অনেক বড়, কাজেই P অপেক্ষা W অনেক বড় হইবে। অর্থাৎ, অল্প বলপ্রয়োগে বেশী ভার তোলা যাইবে। সুতরাং

দাঁড়িপাল্লা কাঁচি
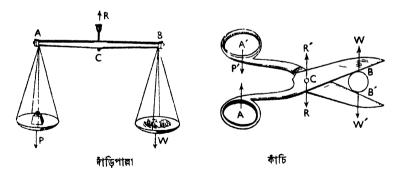
প্রথম শ্রেণীর লিভারে যান্ত্রিক সুবিধা আছে। যদি AC = BC হয় তবে ইহাতে কোন যান্ত্রিক সুবিধা থাকে না। শাবল, তুলাদণ্ড, দাঁড়িপাল্লা, রেল-লাইন উঁচু করিবার জন্য কুলীরা যে-দণ্ড ব্যবহার করে তাহা, ঢেঁকি ইত্যাদি প্রথম শ্রেণীর লিভারের দৃষ্টান্ত। কাঁচিতে দুইটি প্রথম শ্রেণীর লিভার যুক্ত থাকে।

(2) **দ্বিতীয় শ্রেণীর লিভার ঃ**

চিত্রে এই লিভারের কার্যপ্রণালী ও প্রকৃত প্রয়োগ দেখানো হইয়াছে। এই শ্রেণীতে দণ্ডের এক প্রান্তে আলম্ব থাকে এবং অপর প্রান্তে বলপ্রয়োগ করিতে হয়। ভার এই দুই প্রান্তের মধ্যবর্তী। চিত্রে C বিন্দুতে আলম্ব;
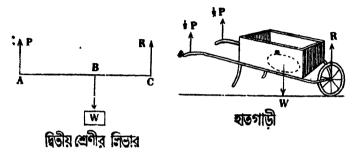
দ্বিতীয় শ্রেণীর লিভার

হাতগাড়ী

A প্রান্তে P বলপ্রয়োগ করা দেখানো হইয়াছে এবং ভার W মধ্যবর্তী B বিন্দুতে আছে। এস্থলে,

$$P.AC = W.BC$$

অথবা, $\frac{W}{P} = \frac{AC}{BC}$

অথবা, যান্ত্রিক সুবিধা $= \frac{AC}{BC}$

যেহেতু সর্বদা AC বাহু BC বাহু অপেক্ষা বড় সেইহেতু এই লিভার দ্বারা সর্বদা অল্প বলপ্রয়োগে বেশী ভারী জিনিস তোলা যাইবে। অর্থাৎ, দ্বিতীয়

নৌকার দাঁড়

যাঁতি
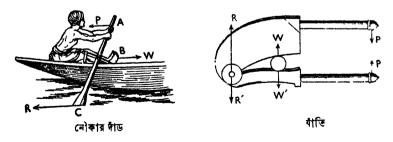
শ্রেণীর লিভারে সর্বদা যান্ত্রিক সুবিধা থাকে। হাতগাড়ী, নৌকার দাঁড়, কর্ক-চাপা (cork-squeezer) ইত্যাদি দ্বিতীয় শ্রেণীর লিভারের উদাহরণ। সুপারি-কাটা যাঁতিতে এই ধরনের দুইটি লিভার যুক্ত থাকে।

শ্রেণীর লিভার ঃ

চিত্রে ইহার কার্য-প্রণালী বুঝানো হইয়াছে। এই লিভারের এক প্রান্তে আলম্ব C এবং অপর প্রান্তে ভার W এবং মাঝামাঝি কোন বিন্দু A হইতে বলপ্রয়োগ করা হয়। এক্ষেত্রে :

$$P.AC = W.BC$$

অথবা, $\frac{W}{P} = \frac{AC}{BC}$

অথবা, যন্ত্রিক সুবিধা $= \frac{AC}{BC}$

কিন্তু যেহেতু AC সর্বদা BC অপেক্ষা ছোট অতএব W সর্বদা P অপেক্ষা ছোট। অর্থাৎ বেশী বল প্রয়োগ করিয়া অল্প ভার তোলা যাইবে।

এই কারণে **তৃতীয় শ্রেণীর লিভারে কোন যান্ত্রিক সুবিধা নাই।** কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে ভার উত্তোলনের জন্য সরাসরি বল প্রয়োগের সুবিধা

তৃতীয় শ্রেণীর লিভার মানুষের হাত
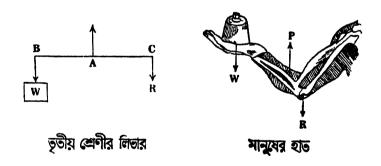
থাকে না—আবার প্রথম দুই শ্রেণীর লিভারও ব্যবহার করা যায় না। সেই সব ক্ষেত্রে অসুবিধা সত্ত্বেও তৃতীয় শ্রেণীর লিভার ব্যবহৃত হয়।

মানুষের বাহু তৃতীয় শ্রেণীর লিভারের প্রকৃষ্ট উদাহরণ (চিত্র দ্রষ্টব্য)। বাহুর হাড় হইল দণ্ড; কনুই আলম্ব এবং মাংসপেশীর সাহায্যে বাহুর মাঝ বরাবর বল প্রযুক্ত হয় এবং হাতের তালু ভার উত্তোলন করে।

কখন কখন কয়েকটি লিভার যুক্ত করিয়া একটি সম্মিলিত লিভার (combination of levers) তৈয়ারী করা হয়। ইহার ফলে খুব কম বল প্রয়োগ করিয়া অনেক ভারী জিনিস খুব সহজে তোলা যায়। রেলওয়ে প্ল্যাটফর্মে ভারী মাল খুব দ্রুত ওজন করিবার জন্য যে 'weigh-bridge' নামক যন্ত্র থাকে তাহা উক্ত সম্মিলিত লিভারের দৃষ্টান্ত।

5. কপিকল [Pulley]

কপিকল তোমরা প্রায় সকলেই দেখিয়াছ। ইহা একটি লোহার চাকা এবং ইহার পরিধিতে খাঁজ কাটা থাকে। এই খাঁজের ভিতর দিয়া একটি দড়ি গলাইয়া দেওয়া হয়। এই চাকাটি একটি অনুভূমিক (horizontal) অক্ষের চতুর্দিকে ঘুরিতে পারে এবং অক্ষটি ব্লক (block) নামক কাঠামোর সহিত যুক্ত। দড়ির একপ্রান্তে ভার সংলগ্ন থাকে এবং অপর প্রান্তে বলপ্রয়োগ করিলে পৃথিবীর আকর্ষণজনিত বাধার বিরুদ্ধে ভারকে উত্তোলন করা যায়।
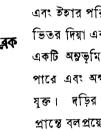
কপিকল

নিম্নের চিত্রে কপিকলের কার্যপ্রণালী বুঝানো হইয়াছে। চিত্র হইতে বোঝা যায় যে, কপিকলকে প্রথম শ্রেণীর লিভার বলা যাইতে পারে—কারণ বল P ও ভার W দুই প্রান্তে এবং আলম্ব (এখানে অক্ষ O) মধ্যস্থলে ; সুতরাং

$$P.OA = W.OB$$

যেহেতু OA এবং OB চাকার ব্যাসার্ধ, অতএব $OA = OB$। সুতরাং $P = W$, অর্থাৎ, ভারের সমান বল প্রয়োগ করিলে ভার উঁচুতে তোলা যাইবে।

কপিকলকে প্রথম শ্রেণীর লিভার বলা যাইতে পারে

এখানে যান্ত্রিক সুবিধা বিশেষ কিছুই নাই—তবুও কপিকল কতকগুলি বিষয়ে সুবিধাজনক। প্রথমত কোন ভারী জিনিসকে সোজাসুজি উপরে তুলিতে যে-পরিমাণ বলপ্রয়োগ করিতে হয় এবং যত কষ্ট হয়, বলপ্রয়োগ নিম্নদিকে করিতে পারিলে তত কষ্ট হয় না। কপিকলে সেই সুবিধা

আছে। দ্বিতীয়ত, কপিকলে নিম্নদিকে বলপ্রয়োগ করিতে হয় বলিয়া দেহ-ভার (body-weight) প্রয়োগ করা যাইতে পারে। ইহার ফলে ভার তুলিতে কম শারীরিক শক্তি প্রয়োগ করিলেই চলে। তৃতীয়ত মাটিতে দাঁড়াইয়া কোন উচ্চস্থানে ভার পৌছানো কপিকলের সাহায্যে খুব সহজে করা যায়। এই সমস্ত কারণে জাহাজে মাল তোলা, কূয়া হইতে জল তোলা, থিয়েটারের সিন তোলা ইত্যাদি নানাবিধ কার্য-সম্পাদনে কপিকলের বহুল ব্যবহার দেখা যায়।

মাটিতে দাঁড়াইয়া কোন উচ্চ স্থানে ভার পৌছানো কপিকলের সাহায্যে সহজে করা যায়

তাহা ছাড়া একাধিক কপিকল ব্যবহার করিলে ভার উত্তোলন অনেক সুবিধাজনক হয়। এই কারণে একাধিক কপিকলকে যুক্ত করিবার বিভিন্ন পদ্ধতি প্রচলিত আছে।

6. নত তল [Inclined plane]

তোমরা যাহারা পাহাড়ে বেড়াইতে গিয়াছ তাহারা জান যে, খাড়া পাহাড়ে ওঠার চাইতে একটু ঢালু পথে ওঠা সহজ। সেইজন্য পাহাড়ের কোন শহরে যাইবার জন্য গাড়িগুলি ঘুরিয়া ঘুরিয়া যতটা পারে খাড়া পথ এড়াইয়া চলে। কোন বাড়ির তিন তলা বা চারতলায় উঠিতে হইলে সিঁড়িগুলি যদি খুব খাড়া হয় তবে বেশ কষ্ট হয়, কিন্তু সিঁড়িগুলি একটু কাত হইলে উঠিতে তত কষ্ট হয় না।
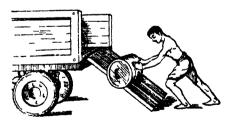
নত তলের সাহায্যে সহজে মাল গাড়িতে উঠানো যায়

এই সব উদাহরণ হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে, কোন বস্তুকে খাড়া উচ্চ স্থানে উঠাইতে যত কষ্ট হয় কাত করা পথে উঠাইতে তত কষ্ট হয় না, অল্পায়াসে উঠানো যায়। এই জন্য রাস্তায় বা স্টেশনে দেখিয়া থাকিবে যে

ভারী ভারী পিপা লরী বা রেলগাড়ির কামরায় তুলিবার জন্য কুলীরা একখানি তক্তা কাত করিয়া ফেলিয়া তাহার উপর দিয়া পিপাগুলি গড়াইয়া তুলিতেছে। ইহাতে কাজ অনেক সহজ হয়।

কোন কাঠের তক্তা বা ঐ জাতীয় কোন সমতলকে যদি অনুভূমিক না রাখিয়া কোন কোণে আনত রাখা হয় তবে উহাকে **নত তল** বলে। ধর, AB একটি নত তল যাহা AC অনুভূমিক রেখার সহিত $\angle BAC$ কোণে দণ্ডায়মান আছে (চিত্র দ্রষ্টব্য)। এবার যদি W ওজনের কোন বস্তুকে নত তলের সমান্তরাল ভাবে P বল প্রয়োগ করিয়া B পর্যন্ত তোলা হয় তবে যে-কার্য করা হইবে তাহার পরিমাণ = বল × দূরত্ব
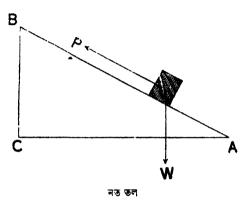
নত তল

$$= P \times AB$$

এই কাযের ফলে W ওজনকে CB উচ্চতায় লওয়া হইল। এখন যদি মনে করা যায় যে, W ওজনকে খাড়াভাবে C হইতে B বিন্দুতে লওয়া হইল তবে তাহার জন্য যে-কায করা হইবে তাহার পরিমাণ = $W \times BC$

যেহেতু এই দুই কাযের পরিমাণ সমান, অতএব

$$P \times AB = W \times BC$$

অথবা, $$\frac{W}{P} = \frac{AB}{BC}$$

ছবি হইতে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, BC অপেক্ষা AB অনেক বড়। প্রকৃতপক্ষে নত তলের বেলাতে এইরূপ সর্বদা হইবে। সুতরাং P অপেক্ষা W অনেক বড়—অর্থাৎ, কম বলপ্রয়োগে বেশী কায করা যাইবে।

শোনা যায় বহুপূর্বে পুরীর মন্দির, কোনারকের মন্দির, মিশরের পিরামিড প্রভৃতি নির্মাণে ভারী পাথরকে নত তলের সাহায্যে উচ্চস্থানে তোলা হইয়াছিল।

যন্ত্র সম্বন্ধে সর্বদা একটা কথা স্মরণ রাখিবে। যন্ত্রের সাহায্যে আমরা কাজের সুবিধা করিয়া লই—অর্থাৎ, অল্প বল প্রয়োগ করিয়া বেশী বাধা অতিক্রম করিবার ব্যবস্থা করিয়া লই, কিন্তু শক্তির দিক হইতে কিছুই লাভবান হই না। যে-শক্তি আমরা যন্ত্রে প্রয়োগ করি যন্ত্র আবার তাহাই ফিরাইয়া দেয়। যন্ত্র বেশী শক্তি সৃষ্টি করিতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে যন্ত্র যে-শক্তি ফিরাইয়া দেয় তাহা প্রযুক্ত শক্তি অপেক্ষা কিছু কম, কারণ যন্ত্রের বিভিন্ন অংশের ভিতর ঘর্ষণজনিত বাধা অতিক্রম করিবার জন্য কিছু শক্তি খরচ হয়।

মহাকর্ষ [Gravitation]

বহু প্রাচীনকালে লোকেরা বিশ্বাস করিত যে, পৃথিবী স্থির এবং সূর্য পৃথিবীর চতুর্দিক প্রদক্ষিণ করে। কিন্তু কালক্রমে তাহারা বুঝিতে পারিল যে, পৃথিবী বা সূর্য কেহই স্থির নয়—উভয়েই গতিশীল এবং পৃথিবী সূর্যের চতুর্দিক প্রদক্ষিণ করে। শুধু পৃথিবীর নয়—পৃথিবীর ন্যায় আরও কয়েকটি গ্রহও সূর্যের চতুর্দিকে নিজ নিজ কক্ষপথে পরিভ্রমণ করিয়া চলিয়াছে। কোপার্নিকাস, কেপলার প্রভৃতি প্রাচীন জ্যোতির্বিদ্‌গণ গ্রহগুলির এই গতি পর্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন। কিন্তু কেন গ্রহগুলি সর্বদা ঘুরিতেছে তাহার কোন কারণ তাঁহাদের জানা ছিল না। পরে বিখ্যাত পদার্থবিদ্ সার আইজাক্ নিউটন যখন তাঁহার মহাকর্ষ সূত্র (**Law of gravitation**) আবিষ্কার করেন তখন সেই কারণ বোঝা গেল। নিউটনের এই আবিষ্কার সম্বন্ধে একটি গল্প প্রচলিত আছে।

1666 খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডে সংক্রামক ব্যাধিরূপে প্লেগ দেখা দিল। তখন নিউটন কেম্‌ব্রিজের ট্রিনিটি কলেজের ছাত্র। বয়স মাত্র 24 বৎসর। কলেজের সমস্ত ছাত্র প্লেগের ভয়ে কলেজ ছাড়িয়া দূরদূরান্তরে পলায়ন করিল। নিউটনও পলাইয়া উল্‌সথ্রোপে তাঁহার গ্রামের বাড়িতে চলিয়া আসেন। একদিন নিউটন তাঁহার গৃহসংলগ্ন বাগানে একটি আপেল গাছের নীচে বসিয়া পুস্তক পড়িতেছিলেন। এমন সময় একটি আপেল টুপ্ করিয়া তাঁহার সম্মুখে মাটিতে পড়িল। তাহা দেখিয়া তৎক্ষণাৎ তিনি চিন্তা করিলেন, কেন আপেলটি নীচের দিকে পড়িল? উপরেও ত উঠিতে পারিত! কোন জিনিসকে কিছু উপর হইতে ফেলিলে কেন সর্বদা মাটির দিকে আসে?

নিশ্চয়ই পৃথিবী সবকিছু পদার্থকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে। এই চিন্তায় তিনি বিভোর হইয়া রহিলেন। অবশেষে তিনি আবিষ্কার করিলেন **মহাকর্ষ।** ভাবিয়া দেখ, মাত্র 24 বৎসর বয়সে তিনি আবিষ্কার করিলেন এই মহাজগতের এক চিরন্তন সত্য। এই মহাকর্ষ শুধু পৃথিবী ও পার্থিব পদার্থের ভিতর নয়—এই বিশ্বের যে-কোন দুইটি বস্তুর ভিতরেই আছে এবং এই ব্যাপারটিকে একটি সূত্রের (law) আকারে তিনি উপস্থাপিত করিলেন। সূত্রটি নিম্নরূপ :

এই বিশ্বের যে-কোন দুইটি বস্তুকণা পরস্পরকে আকর্ষণ করে এবং এই আকর্ষণের মান বস্তুকণা দুইটির ভরের গুণফলের সমানুপাতিক এবং উহাদের ভিতরকার দূরত্বের বর্গের ব্যস্ত অনুপাতিক (inversely proportional)। ইহাই নিউটনের মহাকর্ষ সূত্র।

এই সূত্র হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে, বস্তুকণা দুইটির ভিতরকার দূরত্ব ঠিক রাখিয়া উহাদের ভর দ্বিগুণ করিলে আকর্ষণের মান চারগুণ বাড়িয়া যাইবে। আবার ভর ঠিক রাখিয়া দূরত্ব দ্বিগুণ করিলে আকর্ষণের মান চার-ভাগের এক ভাগ হইয়া যাইবে।

এই মহাকর্ষের ফলে জগতের সব বস্তু অন্য সকল বস্তুকে আকর্ষণ করে। ইহা জড় বস্তুর একটি সাধারণ ধর্ম। এই ধর্ম সকল অবস্থায় এবং সকল জায়গায় সমভাবে প্রযোজ্য। ইহার ফলে একটি পরমাণু অপর পরমাণুকে আকর্ষণ করিবে, একটি তারা অপর তারাকে আকর্ষণ করিবে, সূর্য আকর্ষণ করিবে গ্রহগুলিকে, গ্রহগুলি আকর্ষণ করিবে উপগ্রহগুলিকে। এই আকর্ষণ আছে বলিয়াই তোমার হাত হইতে কোন জিনিস পড়িলে মাটিতে পড়িবে—উঁচুতে উঠিয়া যাইবে না।

8. জোয়ার-ভাঁটা

প্রত্যেক দিনে 12 ঘণ্টা অন্তর সমুদ্রের জল নিয়মিতভাবে উঠা-নামা করে বলিয়া নদীর জলেরও ঐরূপ উঠা নামা হয়। জলের এই নিয়মিত স্ফীতিকে জোয়ার এবং পতনকে ভাঁটা বলা হয়। বড় বড় নদীতে এই জোয়ার-ভাঁটা তোমরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করিয়াছ।

পৃথিবী সর্বদা আপন অক্ষের উপর আবর্তন করে বলিয়া ভূ-পৃষ্ঠের জলরাশির উপর একটি কেন্দ্রাতিগ বল (centrifugal force) কার্য করে।

ইহার ফলে জলরাশি সর্বদা বাহিরের দিকে বিক্ষিপ্ত হইতে চায়। এই কেন্দ্রাতিগ বলের একটি সাধারণ উদাহরণ দিতেছি।

একটি বালতিতে জলভর্তি করিয়া জোরে উপর-নীচ ঘুরাইলে বালতি হইতে কখনও জল পড়িয়া যায় না, ইহা তোমার হয়তো লক্ষ্য করিয়াছ। চক্রাকারে ঘুরিবার ফলে একটি কেন্দ্রাতিগ বল জলের উপর ক্রিয়া করে, ফলে জল বাহিরের দিকে বিক্ষিপ্ত হইতে চায় এবং বালতির সহিত আটকাইয়া থাকে। কাজেই জল কোন অবস্থাতেই বালতি হইতে পড়িয়া যায় না (চিত্র দ্রষ্টব্য)।
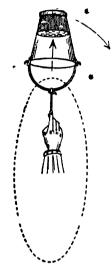
কেন্দ্রাতিগ বলের দরুন জল বালতি হইতে পড়িবে না

এই কেন্দ্রাতিগ বল কিছু পরিমাণে জোয়ার সৃষ্টি করিবার জন্য সহায়তা করে। কিন্তু প্রধানত চন্দ্রের মহাকর্ষীয় বলের জন্যই জোয়ার-ভাঁটা দেখা যায়। চন্দ্র পৃথিবীর খুব নিকটে থাকায় অন্যান্য জ্যোতিষ্ক অপেক্ষা চন্দ্রের আকর্ষণ-শক্তি খুব প্রবল। পৃথিবীর যে-অংশ চন্দ্রের ঠিক সম্মুখে উপস্থিত হয় সেই অংশ চন্দ্র কর্তৃক প্রবল আকর্ষণ অনুভব করে। স্থল-ভাগ অপেক্ষা জল ভাগের উপর আকর্ষণ-শক্তির প্রভাব বেশী হওয়ায় ঐ স্থানের চারিদিক হইতে জলরাশি ঐ অংশের দিকে প্রবাহিত হয় এবং ঐ স্থানের জলরাশি ফুলিয়া ওঠে। উপরন্তু কেন্দ্রাতিগ বল এই প্রবাহকে সাহায্য করে। ফলে পৃথিবীর ঐ অংশে জোয়ারের সৃষ্টি হয়। ইহাকে **মুখ্য** বা **প্রত্যক্ষ জোয়ার** বলে।

চন্দ্রের পূর্বোক্ত আকর্ষণস্থলের ঠিক বিপরীত দিকে মহাকর্ষজনিত বল স্থলভাগের উপর যতটা প্রযুক্ত হইবে জলের উপর ততটা হইবে না, কারণ, বিপরীত প্রান্তে অবস্থিত বলিয়া জল অপেক্ষা স্থলভাগ চন্দ্রের নিকটে থাকে। এই কারণে স্থলভাগ চন্দ্রের নিকটে কিছুটা সরিয়া যাওয়ায় ঐ স্থানের জলও স্ফীত হইয়া উঠিবে। কেন্দ্রাতিগ বলের প্রভাবেও ঐ বিপরীত দিকের চারিপাশ হইতে জলরাশি ঐ স্থানের দিকে প্রবাহিত হয়। সুতরাং ঐ স্থানেও জোয়ারের সৃষ্টি হয়। ইহাকে **গৌণ** বা **পরোক্ষ** জোয়ার বলে।

যে-সময়ে পৃথিবীর কোন নির্দিষ্ট অংশে মুখ্য জোয়ার এবং উহার বিপরীত অংশে গৌণ জোয়ার হয়, তখন ঐ দুই অঞ্চলের মধ্যবর্তী অংশের জল উক্ত দুই

অংশের দিকে প্রবাহিত হয়। ফলে মধ্যবর্তী জল-তল (sea-level) কিছু নামিয়া যায়। অর্থাৎ, ঐ অংশে **ভাঁটার** সৃষ্টি হয়।

পৃথিবী 24 ঘণ্টায় আপন অক্ষের চতুর্দিকে একবার ঘুরিয়া আসে বলিয়া এবং চন্দ্র আপন কক্ষপথে প্রদক্ষিণ করে বলিয়া প্রায় 12 ঘণ্টা অন্তর কোন নির্দিষ্ট স্থানে একবার মুখ্য ও একবার গৌণ জোয়ার সৃষ্টি হয়।

অমাবস্যা বা পুর্ণিমায়, চন্দ্র ও পৃথিবী একই সরল রেখায় অবস্থিত হয়। তখন পৃথিবীর জলরাশি যুগপৎ সূর্য ও চন্দ্র কর্তৃক আকর্ষিত হইয়া বেশী ফুলিয়া ওঠে এবং প্রবল জোয়ারের সৃষ্টি হয়। ইহাকে **ভরা কটাল** বলে। অষ্টমী তিথিতে সূর্য ও পৃথিবীকে যুক্ত করিলে যে-সরলরেখা পাওয়া যায়, চন্দ্র সেই সরলারেখার সহিত সমকোণে অবস্থিত হয়। তখনকার জোয়ার ততটা প্রবল হয় না। ইহাকে **মরা কটাল** বলে।

9. কৃত্রিম উপগ্রহ

তোমরা জান যে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞানীরা সর্বপ্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ সৃষ্টি করিয়াছেন। এই কৃত্রিম উপগ্রহ আসল উপগ্রহ অর্থাৎ চন্দ্রের মত পৃথিবীর চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ করে। এই কৃত্রিম উপগ্রহ সৃষ্টি মানুষের বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির চরম উৎকর্ষের নিদর্শন।

1957 সালে 4th অক্টোবর সোভিয়েট বিজ্ঞানীরা প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ মহাকাশে উৎক্ষেপ করেন। উহা আকারে গোল এবং 58 cm ব্যাসযুক্ত ছিল। উহার ওজন ছিল দু'মণের কিছু বেশী। অতঃপর 2nd নভেম্বর তাঁহার দ্বিতীয় কৃত্রিম উপগ্রহ মহাকাশে ছাড়েন। এই উপগ্রহটির বিশেষত্ব ছিল এই যে, একটি কুকুরকে ('লাইকা' নামে পরিচিত) মহাকাশের যাত্রী হিসাবে ইহার মধ্যে রাখা হইয়াছিল। দ্বিতীয় উপগ্রহটি ওজনে ও আকারে প্রথমটি অপেক্ষা বৃহত্তর ছিল। ইহার পর সোভিয়েট ও আমেরিকার বিজ্ঞানীরা আরও উপগ্রহ মহাকাশে পাঠাইয়াছেন। শুধু তাই নয়। রাশিয়া এবং আমেরিকার মহাকাশচারী মানুষেরা মহাকাশ পরিভ্রমণ করিয়া আবার পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। কৃত্রিম উপগ্রহ কিভাবে ছোঁড়া হয় এবং কেনই বা উহা পৃথিবী পরিক্রমণ করে সে সম্বন্ধে কৌতুহল সকলেরই। ইহার মূলতত্ত্ব বুঝিতে হইলে মহাবিজ্ঞানী নিউটন কর্তৃক আবিষ্কৃত মহাকর্ষ সূত্র মনে রাখিবে।

একথা তোমরা সহজেই বুঝিতে পার যে, কৃত্রিম উপগ্রহকে মহাকাশে উৎক্ষেপ করিতে হইলে প্রচণ্ড বেগে উহাকে ছুঁড়িতে হইবে। এই বেগ সঞ্চার করা হয় রকেটের সাহায্যে। তোমরা হাউই বাজি ছোঁড়া দেখিয়াছ। হাউই বাজির বারুদে আগুন দিলে উহা তীব্র বেগে আকাশের দিকে ছুটিয়া যায়। রকেটের গতির পিছনে ঐ একই নীতি কাজ করে। রকেটে যে-জ্বালানী থাকে তাহাতে অগ্নিসংযোগ করিলে প্রচণ্ড চাপের গ্যাস তৈয়ারী হয় এবং রকেট যে-দিকে যাইবে তাহার বিপরীত দিকে একটি নালীপথে ঐ গ্যাস বাহির হইয়া আসে। ফলে যে বিপরীত প্রতিক্রিয়া-বলের সৃষ্টি হয় তাহা রকেটকে তীব্র বেগে আকাশের দিকে চালিত করে।

আমরা জানি যে, কোন জিনিসকে আকাশের দিকে নিক্ষেপ করিলে পৃথিবীর আকর্ষণে উহা কিছুক্ষণ পরে মাটিতে ফিরিয়া আসে, তবে কৃত্রিম উপগ্রহকে পৃথিবী হইতে ছুঁড়িয়া দিবার পর উহা মাটিতে ফিরিয়া না আসিয়া পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে কেন? সূর্যের চতুর্দিকে পৃথিবী বা অন্যান্য গ্রহগুলি গতি-বিজ্ঞার যে-নিয়মানুসারে প্রদক্ষিণ করে, আসল চন্দ্র পৃথিবীর চতুর্দিকে যে-নিয়মে অবিরত ঘুরিতেছে, কৃত্রিম চন্দ্রের পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিবার পিছনে ঐ একই নিয়ম বর্তমান। নিউটনের মহাকর্ষ এই নিয়মের মূলকথা। কৃত্রিম চন্দ্র প্রচণ্ড বেগে পৃথিবীর চতুর্দিকে ঘোরে। পৃথিবীর মহাকর্ষ বল উহার উপর ক্রিয়া না করিলে ঐ বেগের ফলে উহা সোজাপথে আকাশে উধাও হইয়া যাইত। পৃথিবীর আকর্ষণ উহাকে সোজাপথ হইতে বিচ্যুত করিয়া চক্রাকারে ঘুরায়।

কৃত্রিম উপগ্রহ
তৃতীয় স্তরের রকেট
দ্বিতীয় স্তরের রকেট
প্রথম স্তরের রকেট

কৃত্রিম উপগ্রহ ও তিন স্তরের রকেট

কৃত্রিম চন্দ্রের এই গতির সহিত সূতায় বাঁধা একটি ঢিলের চক্রাকার গতির তুলনা করা যাইতে পারে। তোমরা জান যে, একটি ঢিলকে সূতা দিয়া বাঁধিয়া আঙ্গুলে ধরিয়া ঘুরাইলে সর্বদা আঙ্গুল দিয়া ঢিলটির উপরে একটি বল প্রয়োগ করিতে হয়। এই বল বৃত্তাকার পথের কেন্দ্রের দিকে অভিমুখী (পর পৃষ্ঠার চিত্রে তীর চিহ্ন দিয়া দেখানো হইয়াছে)। যখনই সূতা ছিঁড়িয়া যায়

অর্থাৎ এই বল কার্য করে না তখন ঢিলটি আর বৃত্তাকার পথে না ঘুরিয়া সোজা ছুট দেয়। কারণ নিউটনের গতি সম্পর্কীয় সূত্র হইতে আমরা জানি যে কোন গতিশীল বস্তু সর্বদা সরল রেখায় গতি বজায় রাখিতে চেষ্টা করে। সুতরাং উহাকে চক্রাকারে ঘুরাইতে হইলে উহার উপরে বল প্রয়োগ করিয়া নির্দিষ্ট বৃত্তে ঘুরিতে বাধ্য করিতে হইবে। এই বলকে অভিকেন্দ্র বল (centripetal force) বলা হয়।
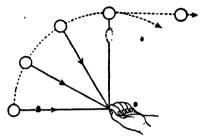
সুতা ছিঁড়িয়া গেলে বস্তুটি বৃত্তাকার পথে না ঘুরিয়া সরলরেখায় যাইবে

ঢিলটির চক্রাকার গতির জন্য যে অভিকেন্দ্র বল প্রয়োজন তাহা আঙ্গুল দিয়া সুতার সাহায্যে প্রয়োগ করা হয়। ঢিলটিকে বেশী বেগে ঘুরাইতে হইলে বেশী বল প্রয়োগ করা প্রয়োজন। কৃত্রিম চন্দ্রের বেলাতে এই অভিকেন্দ্র বল আসিতেছে পৃথিবীর আকর্ষণ হইতে। কিন্তু এখানে একটি কথা মনে রাখিতে হইবে। কৃত্রিম চন্দ্রের উপর পৃথিবীর একটি নির্দিষ্ট আকর্ষণ আছে। এই আকর্ষণের উপর নির্ভর করিয়া পৃথিবী পরিভ্রমণ করিতে কৃত্রিম চন্দ্রকে একটি নির্দিষ্ট বেগে চলিতে হইবে। পৃথিবী হইতে যত দূরে যাওয়া যায় পৃথিবীর আকর্ষণ তত কমিয়া যায়। এই কারণে কৃত্রিম চন্দ্রকে পৃথিবী হইতে যত উচ্চে উৎক্ষেপ করা যাইবে তত উহার প্রদক্ষিণ করিবার বেগও কমিয়া যাইবে। প্রথম কৃত্রিম চন্দ্র পৃথিবী হইতে 933 কিলোমিটার দূরে ছিল এবং উহা 24 ঘণ্টায় পৃথিবীকে প্রায় 15 বার প্রদক্ষিণ করিয়াছিল। আসল চন্দ্র পৃথিবী হইতে 380,000 কিলোমিটার দূরে এবং পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিতে উহার প্রায় একমাস সময় লাগে। সুতরাং বুঝিতে পার যে, পরিভ্রমণের কক্ষপথ পৃথিবী হইতে যত দূরে হইবে গতিবেগও তত কমিয়া যাইবে। একথা বলা বাহুল্য যে, কৃত্রিম উপগ্রহ সৃষ্টি করিতে হইলে উহাকে বহু উচ্চে উৎক্ষেপ করিতে হইবে এবং প্রয়োজনীয় বেগ সঞ্চার করিতে হইবে। এইভাবে নির্দিষ্ট কক্ষপথে কৃত্রিম উপগ্রহকে স্থাপন করা সহজ কথা নয়।

প্রথম কৃত্রিম চন্দ্র উৎক্ষেপের পূর্বে সোভিয়েট বিজ্ঞানীরা হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন যে, উহাকে পৃথিবী হইতে 560 মাইল উচ্চে তুলিয়া উহার গতির

অভিমুখ ভূ-পৃষ্ঠের সমান্তরাল করিতে পারিলে উহার বেগ ও পৃথিবীর আকর্ষণের ফলে উহা পৃথিবীর চতুর্দিক ঘণ্টায় 18000 মাইল বেগে পরিক্রমণ করিবে। এই দুরূহ কার্য তিন স্তরের রকেটের সাহায্যে সমাধা করা হইয়াছে। প্রথম স্তরের রকেটটি কৃত্রিম উপগ্রহ ও অন্য দুইটি রকেট লইয়া খাড়াভাবে 50 মাইল উপরে উঠিয়া যায়। ইহার ফলে উপগ্রহটি প্রথমে বায়ুমণ্ডলের সর্বাপেক্ষা ঘন অঞ্চল ও তাহার পরে অপেক্ষাকৃত পাতলা অঞ্চল ছাড়াইয়া যায়। এই সময় প্রথম রকেটটি খসিয়া পড়ে এবং কৃত্রিম উপগ্রহটি ভূ-স্তরের সহিত 45° কোনা-কুনি হইয়া পড়ে (চিত্র দেখ)। তখন দ্বিতীয় স্তরের রকেটটি উপগ্রহ ও তৃতীয় রকেটকে 100 মাইলের কিছু বেশী উচ্চে তুলিয়া দেয়। তখন উহার বেগ ঘণ্টায় 10,000 মাইল হয়। এই সময় দ্বিতীয় রকেটি খসিয়া পড়ে। তৃতীয়
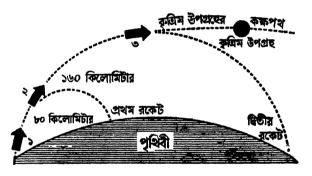
কৃত্রিম উপগ্রহ ও রকেটগুলির গতিপথ

স্তরের রকেটটি উপগ্রহকে পৃথিবী হইতে 560 মাইল উচ্চে লইয়া যায় এবং পৃথিবীর সমান্তরাল করিয়া ঘণ্টায় 18,000 মাইল বেগ সঞ্চার করিয়া উপগ্রহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। উপগ্রহটি তখন আপন কক্ষপথে উপস্থিত হইয়াছে এবং নির্দিষ্ট বেগ পাইয়াছে। তখন হইতে গতিবিদ্যার নিয়মানুযায়ী আসল চন্দ্রের ন্যায় কৃত্রিম চন্দ্রও পৃথিবী পরিক্রমণ শুরু করে।

তোমরা একথাও শুনিয়াছ যে, প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহটি পৃথিবী পরিক্রমণ শেষ করিয়া ভূ-পৃষ্ঠে আসিয়া পড়িয়াছে। এইরূপ কেন হইল ? ইহার কারণ এই যে পৃথিবী হইতে 560 মাইল উচ্চে উঠিলেও উহা তখনও বায়ুমণ্ডলের শেষ সীমা ছাড়াইয়া যাইতে সক্ষম হয় নাই। অত উঁচুতে বায়ুমণ্ডল খুব পাতলা হইলেও

প্রচণ্ডবেগে ঘুরিবার জন্য কৃত্রিম উপগ্রহটি ঘর্ষণজনিত বাধা পাইয়া থাকে। ইহাতে উহার গতিবেগ একটু একটু করিয়া কমিতে থাকে। তখন পৃথিবীর আকর্ষণের ফলে উহা ক্রমশ ভূ-পৃষ্ঠের দিকে আসিতে থাকে। ক্রমশ নীচে নামিতে নামিতে ঘন বায়ুস্তরে প্রবেশ করিলে প্রচণ্ড ঘর্ষণ সৃষ্টি হয়। তখন যে বিপুল তাপের সৃষ্টি হয় তাহা কৃত্রিম উপগ্রহকে নিমেষে ভস্মীভূত করিয়া দেয় এবং উত্তপ্ত জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ডের ন্যায় ভূ-পৃষ্ঠে আসিয়া পড়ে।

কৃত্রিম উপগ্রহ উৎক্ষেপ শুধু যে বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির পরাকাষ্ঠা দেখাইবার জন্য করা হইয়াছে একথা মনে করিও না। ইহার সাহায্যে বিজ্ঞানীরা মহাকাশ সম্বন্ধে নানা রকম প্রয়োজনীয় খবর সংগ্রহ করিতেছেন। এই উপগ্রহের ভিতর রক্ষিত নানা সূক্ষ্ম ও স্বয়ংক্রিয় বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে পৃথিবী হইতে বহু উচ্চে বায়ুস্তরের ঘনত্ব, তাপমাত্রা, সূর্য হইতে বিকীর্ণ অতিবেগুনী রশ্মি, মহাজাগতিক রশ্মি, ভূচৌম্বক ক্ষেত্র ও আরো অনেক রকম প্রয়োজনীয় বৈজ্ঞানিক তথ্য বিজ্ঞানীরা সংগ্রহ করিতেছে।

10. ভারশূন্য অবস্থা (Weightless state)

আমরা কোন বস্তুকে হাতের উপর রাখিলে উহার ওজন অনুভব করি, কারণ বস্তুটির উপর পৃথিবীর আকর্ষণজনিত বল আমাদের হাত কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হইতেছে। আমরা আমাদের দেহের ওজন অনুভব করি, কারণ মাটি আমাদের দেহের উপর পৃথিবীর আকর্ষণজনিত বলকে বাধা দিতেছে। সুতরাং কোন জিনিসের উপর পৃথিবীর আকর্ষণজনিত বলকে বাধা দিলে উহার ওজন অনুভূত হইবে এবং এই বাধা অপসারণ করিলে বস্তু ভারশূন্য হইবে। যেমন, কিছু উঁচু হইতে পাথরখণ্ড ফেলিয়া দিলে পড়ন্ত অবস্থায় পাথরখণ্ডকে ভারশূন্য বলা যাইতে পারে। অর্থাৎ, অবাধ অবতরণের (free fall) ফলে ভারশূন্য অবস্থার সৃষ্টি হইতে পারে। এই 'অবতরণ' কথাটির একটু বিশেষ তাৎপর্য আছে। ইহা শুধু উপর হইতে নীচে পড়া বুঝাইবে না। সাধারণ অর্থে 'অবতরণ' কথাটি পৃথিবীর আকর্ষণে গা ভাসাইয়া চলাও বুঝাইবে। যেমন, চন্দ্র পৃথিবীর চতুর্দিকে ঘুরিতেছে। এ-ক্ষেত্রে পৃথিবর আকর্ষণজনিত বল চন্দ্রকে চক্রাকার পথে ঘুরাইবার জন্য অভিকেন্দ্র বল যোগাইয়া নিঃশেষ হইতেছে। সুতরাং পৃথিবীর আকর্ষণে চন্দ্র গা

ভাসাইয়া চলিবার জন্য পৃথিবীর নিকট উহা ভারশূন্য। এইরূপ ভারশূন্য অবস্থা সূর্যের কাছে সৌরমণ্ডলের নয়টি গ্রহের। কৃত্রিম চন্দ্রও যতক্ষণ আপনা কক্ষপথে ঘুরিবে পৃথিবীর নিকট ততক্ষণ উহা ভারশূন্য। এই কারণে কৃত্রিম উপগ্রহে কোন মানুষ থাকিলে তাহার কোন ওজন থাকিবে না।

অনুশীলনী

1. **কার্য বলিতে কি বোঝ? কার্য কঠিন লাগে কেন?**

2. **'যন্ত্র' কাহাকে বলে? লিভার, কপিকল ও নততলকে যন্ত্র বলা হয় কেন? প্রত্যেকের কার্যপ্রণালী উদাহরণ সহ বুঝাইয়া দাও।**

3. **যন্ত্রের সুবিধা কি? তৃতীয় শ্রেণীর লিভারে যান্ত্রিক সুবিধা আছে কি? কি অবস্থায় ঐ লিভার ব্যবহার করা সুবিধাজনক?**

4. **লিভার কয় শ্রেণীর? প্রত্যেক শ্রেণীর বৈশিষ্ট্য ও ব্যবহারিক প্রয়োগের উদাহরণ দাও?**

5. **কৃত্রিম উপগ্রহ প্রথম সৃষ্টি করে কাহারা? প্রথম উপগ্রহ কবে উৎক্ষেপ করা হয়? কৃত্রিম উপগ্রহ পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে কেন?**

Objective Test প্রশ্ন

[ছাত্রছাত্রীদের অধীত বিবরগুলির উপর *objective test*-এর বিভিন্ন প্রকারের প্রশ্ন করা যাইতে পারে। নিম্নে কয়েকটি নমুনা দেওয়া হইল এবং প্রশ্নগুলি কিরূপে উত্তর করিতে হইবে তাহার নিয়মও বলা হইল। প্রত্যেক পরিচ্ছেদের শেষে এইরূপ *objective test*-এর প্রশ্ন আছে কিন্তু নিয়মগুলির পুনরুক্তি করা হয় নাই। একই নিয়ম প্রত্যেক পরিচ্ছেদেই মানিয়া চলিতে হইবে।]

(ক) Alternate response type :—

(*i*) *Yes or No type* :—

নিয়ম—নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির মধ্যে যেটির উত্তর 'হ্যাঁ' হইবে তাহার ডানদিকে — চিহ্নিত স্থানে Y এবং যেটির উত্তর 'না' হইবে সেখানে N লেখ।

(*i*) **কৃত কার্য কি প্রযুক্ত বল এবং বলের প্রয়োগবিন্দুর স্থানচ্যুতির গুণফলের সমান?** —

(*ii*) **সাধারণভাবে 'কার্যের' অর্থ এবং বৈজ্ঞানিক অর্থ কি এক?** —

(*iii*) **গতিশীল অবস্থায় কোন বস্তুর জাড্য থাকে কি?** —

(*iv*) **সকল প্রকার লিভারই কি সমান সুবিধাজনক?** —

(*v*) **নিউটনের মহাকর্ষ সূত্র কি বিশ্বের যে-কোন দুইটি বস্তুখণ্ডের ভিতর প্রযোজ্য?** —

(*vi*) **জোয়ার-ভাঁটা শুধু কি পৃথিবীর আবর্তনের দরুন যে-কেন্দ্রাতিগ বলের উদ্ভব হয় তাহার ফলে হয়?** —

(ii) *True or false type :—*

নিয়ম—নিম্নলিখিত উক্তিগুলির মধ্যে তোমার যেটি সত্য বলিয়া মনে হয় তাহার ডানদিকের শূন্যস্থানে T এবং যেটি ভুল মনে কর তাহার ডানদিকের শূন্যস্থানে F লেখ।

(i) বস্তু যেদিকে চলিতে চায় ঘর্ষণজনিত বাধা সেইদিকে ক্রিয়া করে। —

(ii) যন্ত্রের দ্বারা আমরা আমাদের কাজের কি সুবিধা করিয়া লই। —

(iii) বস্তুর ওজন যত বেশী হয় তত তাহাকে উর্ধ্বে তুলিতে কষ্ট হয়। —

(iv) এই বিশ্বের যে-কোন দুইটি বস্তুকণা পরস্পরকে আকর্ষণ করে এবং উহাদের আকর্ষণের মান বস্তুকণা দুইটির ভরের যোগফলের সমানুপাতিক এবং উহাদের দূরত্বের ব্যস্তানুপাতিক। —

(v) কোন বস্তু চক্রাকারে ঘুরিলে উহার উপর একটি অভিকেন্দ্র বল ক্রিয়া করে। —

(খ) Recall type :—

নিয়ম—নিম্নলিখিত বাক্যগুলির শূন্যস্থান পূরণ কর। বাক্যগুলির ডানদিকে যে স্থান রাখা আছে সেই স্থানে শব্দটি বসাও।

(i) যে-ব্যবস্থা দ্বারা সামান্য বলপ্রয়োগে বিপুল বাধাকে অতিক্রম করা যায় তাহাকে — বলে। —

(ii) দুইটি বস্তুর ভিতর আকর্ষণজনিত সূত্রকে—সূত্র বলে। —

(গ) Completion type :—

(i) দুইটি বস্তুকে সংস্পর্শে আনিলে উহাদের ভিতর—(*a*) জনিত বাধা কাজ করে। বস্তু দুইটি মসৃণ হইলে এই বাধা- -(*b*) হয় এবং অমসৃণ হইলে—(*c*) হয়। এই কারণে যখনই একটি বস্তুকে অন্য বস্তুর উপর দিয়া চালাইয়া লইবার চেষ্টা করা হয় তখন বস্তু যেদিকে যাইবে — (*d*) জনিত বাধা তাহার — (*e*) দিকে ক্রিয়া করিয়া বস্তুর গতিতে বাধা দিবার চেষ্টা করে।

(*a*)——(*b*)——(*c*)——(*d*)——(*e*)——

(ii) এই বিশ্বের যে-কোন দুইটি — (*a*) পরস্পরকে — (*b*) করে এবং এই — (*c*) এর — (*d*) বস্তুকণা দুইটি ভরের — (*e*) সমানুপাতিক এবং উহাদের দূরত্বের —(*f*) ব্যস্তানুপাতিক।

(*a*)— —(*b*)——(*c*)——(*d*)——(*e*)——(*f*)

(ঘ) Multiple choice type :—

নিয়ম—নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির পাশে কয়েকটি সম্ভাব্য উত্তর দেওয়া আছে। তুমি যে উত্তরটি নির্ভুল মনে কর তাহার মাথায় √ চিহ্ন দাও।

(i) প্রথম শ্রেণীর লিভারে আলম্ব বিন্দু কোথায় অবস্থিত?—দণ্ডের এক প্রান্তে, দণ্ডের মধ্যস্থলে।

(ii) দ্বিতীয় শ্রেণীর লিভারের উদাহরণ কি? শাবল, নৌকার দাঁড়, মানুষের হাত।

(iii) জোয়ার-ভাঁটা কাহার উপর নির্ভর করে? পৃথিবীর কেন্দ্রাতিগ বল, চন্দ্রের আকর্ষণ, সূর্যের আকর্ষণ।

(iv) কার্য করিতে কষ্ট বোধ করিবার কি কি কারণ? বস্তুর ওজন, ঘর্ষণ, জাড্য।

২

আলোক বিজ্ঞান
[Light]

1. আলোকের প্রকৃতি

পারিপার্শ্বিক জগতের সহিত আমাদের পরিচয় মূলত দৃষ্টি দ্বারা। চোখ মেলিলেই আমরা আমাদের চারিদিকে নানারকম জিনিস দেখিতে পাই। কিন্তু শুধু চোখ থাকিলেই কি দেখা যায়? একটি অন্ধকার ঘরে যদি চোখ মেলিয়া থাকা যায় তবে কি ঘরের কোন জিনিস দেখা যায়? আবার, পূর্ণ আলোকিত ঘরে চোখ বন্ধ করিয়া রাখিলেও কোন জিনিস দেখা যায় না। সুতরাং চোখ দ্বারা কিছু দেখিতে হইলে একটি বাহ্যিক কারণ প্রয়োজন। অর্থাৎ, বস্তু হইতে আলো যখন চোখে আসিয়া পড়ে তখনই আমাদের উক্ত বস্তু সম্বন্ধে দর্শন অনুভূতি হয়। অতএব আলো-কে আমরা এক বাহ্যিক প্রেরণা (stimulus) বলিতে পারি যাহা চোখে কোন দ্রব্য সম্বন্ধে দর্শন অনুভূতি জাগায়।

তাপ, বিদ্যুৎ প্রভৃতির ন্যায় **আলোকও এক প্রকার শক্তি**। একটি ধাতব বলকে উত্তপ্ত করিলে বলটি তাপশক্তি নির্গত করে। এস্থলে কয়লার রাসায়নিক শক্তি তাপশক্তিতে রূপান্তরিত হইতেছে। বলটিকে ক্রমাগত উত্তপ্ত করিলে এক সময় উহা আলোক বিচ্ছুরণ করিবে। তখন রাসায়নিক শক্তির খানিকটা অংশ আলোক-শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। তেমনি বৈদ্যুতিক বাতি জ্বালিলে বিদ্যুৎ-শক্তি অংশত আলোক-শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। এইসব উদাহরণ হইতে আমরা বলিতে পারি যে আলোকও এক প্রকার শক্তি।

আলো বস্তুকে দৃশ্যমান করে, কিন্তু নিজে অদৃশ্য। আমরা আলো দেখিতে পাই না কিন্তু আলোকিত বস্তুকে দেখি। কথাটা হয়তো তোমাদের কাছে একটু জটিল বোধ হইতে পারে। তোমরা বলিবে যে, সকাল বেলায় রৌদ্রের আলো যখন ঘরের বারান্দায় আসিয়া পড়ে তখন ত' আমরা আলোই

দেখি। কিন্তু একটু ভাবিলেই বুঝিতে পারিবে যে, যাহা দেখ তাহা আলো নয়—আলো দ্বারা উজ্জ্বল বারান্দার কিছু অংশ। রাত্রিবেলা মোটরের হেড-লাইট জ্বালিয়া দিলে বহুদূর পর্যন্ত আলোকিত হয়। প্রথমে মনে হইতে পারে যে, ঐ ত আলো দেখা গেল। কিন্তু তাহা ঠিক নয়। অসংখ্য ধূলিকণার উপর আলো পড়িয়া সহসা উহারা আমাদের দৃষ্টিগোচর হইল বলিয়া আমরা ঐ আলোকিত ধূলিকণাগুলিই দেখি, আলো দেখি না।

কাজেই, স্মরণ রাখিবে যে অন্যান্য শক্তির ন্যায় আলোক-শক্তিও অদৃশ্য।

2. আলোকের ঋজুগতির পরীক্ষা

আমাদের নানারকম সাধারণ অভিজ্ঞতা হইতে জানিতে পারি যে আলোক সরলরেখায় চলাচল করে। অন্ধকার রাস্তায় মোটর গাড়ির হেড-লাইট হইতে আলো বিচ্ছুরিত হইলে দেখা যায় যে, উহা সরল রেখায় যায়। একটি অন্ধকার ঘরের জানালার একটি ছোট ফুটা করিলে রৌদ্র যখন ঐ ফুটা দিয়া ঘরে প্রবেশ করে তখন ঘরের বায়ুতে ভাসমান ধূলিকণাগুলি রৌদ্র দ্বারা আলোকিত হয়. তখন স্পষ্ট বোঝা যায় যে আলো সরলরেখায় চলে।

পরীক্ষাগারে নিম্নলিখিত সহজ পরীক্ষাদ্বারা আলোকের ঋজুগতির সত্যতা প্রমাণিত করিতে পার।

পরীক্ষা :

A, B, C তিনটি শক্ত কাগজের বোর্ড। ইহাদের প্রত্যেকের গায়ে একটি করিয়া ছোট ছিদ্র আছে। এই তিনটি বোর্ড এমনভাবে সাজাও যেন ছিদ্র

আলোকের ঋজুগতির পরীক্ষা
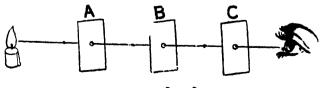
তিনটি এবং একটি মোমবাতির শিখা একই সরলরেখায় থাকে। এখন C বোর্ডের অপর পার্শ্বে চোখ রাখিয়া ছিদ্র তিনটির ভিতর দিয়া শিখা লক্ষ্য কর।

দেখিবে যে, শিখা দেখিতে গেলে চোখ-কে ছিদ্র তিনটির সহিত একই সরলরেখায় রাখিতে হইতেছে।,

এখন যে-কোন একটি বোর্ডকে উপর-নীচ অথবা পাশে একটু সরাইলে আর শিখা দেখা যাইবে না। ইহার কারণ এই যে, আলো স্থানচ্যুত বোর্ড কর্তৃক বাধা পাইবে। ইহা প্রমাণ করে যে, আলো সরলরেখায় চলাচল করে। যদি আলো বক্ররেখায় যাইতে পারিত তবে অনায়াসে স্থানচ্যুত বোর্ডের ছিদ্র দিয়া আসিয়া চোখে পেঁছাইতে পারিত।

3. সূচী-ছিদ্র ক্যামেরা [Pin-hole camera]

এই ক্যামেরার কার্যপদ্ধতি প্রমাণ করে যে, আলো সরলরেখা অবলম্বন করিয়া চলাচল করে।

সংলগ্ন চিত্রে একটি সূচীছিদ্র ক্যামেরার ছবি দেখানো হইল। এই ক্যামেরা একটি আয়তাকার (rectangular) বাক্সের তৈয়ারী। বাক্সের সম্মুখতল কার্ডবোর্ডের তৈয়ারী এবং ইহাতে একটি সরু ছিদ্র H আছে। ইহাকে সূচীছিদ্র বলে। বিপরীত তল X একটি ঘষা কাচের প্লেটে তৈয়ারী। বাক্সের অভ্যন্তর কালো রং করা থাকে। ইহাতে আলোর প্রতিফলন বন্ধ হয়। সূচী-ছিদ্রের সম্মুখে কোন জিনিস রাখিলে ঘষা-কাচের উপর উহার উল্টা ছবি পড়িবে।
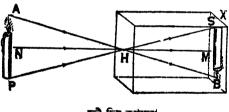
সূচী-ছিদ্র ক্যামেরা

ধরা যাউক, ছিদ্রের সম্মুখে একটি মোমবাতি দাঁড় করানো আছে। মোমবাতির শিখার যে-কোন জায়গা হইতে, ধর A বিন্দু হইতে আলোক রশ্মি চতুর্দিকে গমন করিবে, কিন্তু যে-রশ্মি সোজাসুজি ছিদ্রের ভিতর দিয়া যাইতে পারিবে, যেমন—AH রশ্মি—তাহাই B বিন্দুতে A বিন্দুর প্রতিবিম্ব তৈয়ারী করিবে। তেমনি N এবং P বিন্দু হইতে রশ্মি নির্গত হইয়া সোজাসুজি ছিদ্র দিয়া যথাক্রমে M এবং S বিন্দুতে প্রতিবিম্ব তৈয়ারী করিবে। এইরূপে সমগ্র শিখার উল্টা প্রতিবিম্ব ঘষা-কাচের উপর পড়িবে। যদি ঘষা-কাচের পরিবর্তে

ফটোগ্রাফী-প্লেট রাখা যায় তবে প্লেটে মোমবাতির শিখার ছবি উঠিবে। সুতরাং ইহা প্রমাণ করে যে আলো সরলরেখায় চলে।

সূচী-ছিদ্র ক্যামেরা সম্বন্ধে কয়েকটি জ্ঞাতব্য বিষয় :

(1) যদি ক্যামেরার ছিদ্র বড় করা যায় তবে প্রতিবিম্ব অস্পষ্ট হইবে। কারণ, বড় ছিদ্র অনেকগুলি ছোট ছোট ছিদ্রের সমষ্টি বলিয়া ধরা যাইতে পারে। প্রত্যেকটি ছিদ্রই এক একটি প্রতিবিম্ব সৃষ্টি করিবে এবং এই প্রতিবিম্বগুলি একে অন্যের উপর পড়িয়া আসল প্রতিবিম্বকে অস্পষ্ট করিয়া দিবে। সুতরাং যদি ছিদ্র খুব ছোট হয় তবে প্রতিবিম্বের সীমারেখা (outline) খুব স্পষ্ট হইবে।

(2) যে বস্তুর প্রতিবিম্ব সৃষ্টি হইবে তাহা যদি ছিদ্র হইতে দূরে সরাইয়া লওয়া হয় তবে প্রতিবিম্বের সাইজ ছোট হইয়া যাইবে।

(3) যদি বস্তুর দূরত্ব ঠিক রাখিয়া ঘষা-কাচ অর্থাৎ পর্দা ছিদ্র হইতে দূরে সরানো যায় তবে প্রতিবিম্বের সাইজ বৃদ্ধি পাইবে।

4. ছায়ার উৎপত্তি

অস্বচ্ছ বস্তুর ছায়া হয়, তাহা তোমরা জান। আলোর সম্মুখে কোন অস্বচ্ছ বস্তু ধরিলে দেওয়ালে তাহার ছায়া পড়ে তাহা সকলেই দেখিয়াছ। ইহার কারণ এই যে, অস্বচ্ছ বস্তু কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হওয়ায় আলো ঐ বস্তুর পশ্চাতে যাইতে পারে না। সুতরাং ঐ বস্তুর পশ্চাতে দেওয়ালের খানিকটা অংশ অন্ধকার থাকিবে। উহাকে আমরা ছায়া বলি। **আলো যে সরলরেখায় চলে ছায়া তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ**। যদি আলো আঁকা-বাঁকা পথে চলিতে পারিত তবে কখনও ছায়ার সৃষ্টি হইত না। আলোকের উৎস ও অস্বচ্ছ বস্তুর আপেক্ষিক আকৃতির উপর নির্ভর করিয়া ছায়ার আকৃতি ভিন্ন ভিন্ন হইতে পারে। নিম্নে ইহার আলোচনা করা হইল।

(1) **বিন্দু আলোক প্রভব** (point source) ও **বিস্তৃত** (extended) **অস্বচ্ছ বস্তু :**

S একটি বিন্দু আলোক প্রভব, AB একটি গোলাকার অস্বচ্ছ পদার্থ এবং M একটি পর্দা। বিন্দু প্রভব S হইতে আলোকরশ্মি চতুর্দিকে ছড়াইয়া

পড়িবে কিন্তু যে রশ্মিগুলি AB বস্তুর ধার ঘেঁষিয়া যাইবে, যেমন—SA, SB প্রভৃতি—তাহারা পর্দায় গিয়া পড়িবে। SAB শংকুর (cone) অভ্যন্তরস্থ কোন রশ্মি পর্দায় পৌঁছাইতে পারিবে না—কারণ তাহারা AB বস্তু কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হইবে। অন্যান্য রশ্মি পর্দায় পৌঁছিয়া পর্দাকে আলোকিত করিবে। সুতরাং পর্দার A′B′ অংশ সম্পূর্ণ অন্ধকার থাকিবে
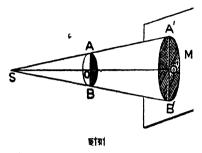
ছায়া

এবং ইহার আকার গোল হইবে। ইহাই হইল AB বস্তুর ছায়া। পর্দা দূরে সরাইয়া লইলে ছায়ার আকার বৃদ্ধি পাইবে।

2. **বিস্তৃত আলোক প্রভব** (extended source) **ও ক্ষুদ্রতর অস্বচ্ছ বস্তু** (smaller object):

S_1 S_2 একটি বিস্তৃত আলোক প্রভব এবং AB একটি বিস্তৃত অস্বচ্ছ বস্তু। আলোক প্রভবের সাইজ AB-বস্তুর চাইতে বড়। M একটি

প্রচ্ছায়া ও উপচ্ছায়া
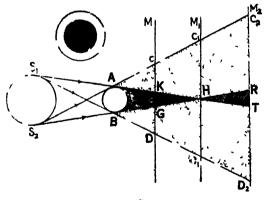
পর্দা। বিস্তৃত আলোক প্রভবকে আমরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু বিন্দু আলোক প্রভবের সমষ্টি বলিয়া ধরিতে পারি। মনে কর, S_1 এবং S_2 ঐরূপ দুইটি প্রান্ত (**extreme**) বিন্দু প্রভব।

এখন S_1 বিন্দু প্রভব হইতে নির্গত এবং S_1A ও S_1B সরলরেখা কর্তৃক সীমাবদ্ধ আলোকরশ্মিগুলি যে আলোক-শংকু (cone) সৃষ্টি করিবে তাহা AB বস্তু কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হইবে এবং পর্দায় পৌছাইবে না। ফলে পর্দায় KD ছায়ার সৃষ্টি হইবে।

তেমনি, সর্বনিম্ন বিন্দু S_2 হইতে নির্গত ও S_2A এবং S_2B রেখাদ্বারা সীমাবদ্ধ আলোকরশ্মি যে-শংকু সৃষ্টি করিবে তাহাও AB বস্তু কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হইবে। সুতরাং তাহারা পর্দায় পৌছাইবে না এবং GC ছায়ার সৃষ্টি করিবে।

S_1 এবং S_2 বিন্দুর মধ্যবর্তী অন্যান্য আলোকবিন্দু যে-ছায়াগুলির সৃষ্টি করিবে তাহা C এবং D-এর ভিতর অবস্থান করিবে। অর্থাৎ C হইতে D পর্যন্ত AB বস্তুর সাধারণভাবে ছায়া সৃষ্টি হইবে।

এই সাধারণ ছায়ার সর্বত্র অন্ধকারের গাঢ়তা এক নয়। লক্ষ্য করিলে বোঝা যাইবে KG অংশে S_1 বা S_2 অথবা ইহাদের মধ্যবর্তী কোন বিন্দু হইতে আলো পৌছায় না। সুতরাং এই অংশের অন্ধকার সর্বাপেক্ষা গাঢ় হইবে। এই অংশকে **প্রচ্ছায়া** (umbra) বলে। কিন্তু KC অথবা GD অংশ তত অন্ধকার নয়—কারণ KC অংশে প্রভবের তলার দিক হইতে কোন আলো পৌছায় না কিন্তু প্রভবের উপরের দিক হইতে আলো পৌছাইবে। তেমনি GD অংশে প্রভবের উপর হইতে কোন আলো পৌছায় না কিন্তু তলার দিক হইতে আলো পৌছায়। সুতরাং KC এবং GD অংশ আংশিক অন্ধকারে থাকিবে। এই আংশিক অন্ধকারযুক্ত অংশগুলিকে **উপচ্ছায়া** (penumbra) বলে।

আরও লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, প্রচ্ছায়া অংশ ক্রমশ সরু হইয়া যাইতেছে কিন্তু উপচ্ছায়া অংশ ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতেছে।

যদি পর্দাকে M_1 অবস্থানে লইয়া যাওয়া যায় তবে প্রচ্ছায়া একটি বিন্দুতে (H) পরিণত হইবে। যদি আরও সরাইয়া M_2 অবস্থানে লইয়া যাওয়া হয় তবে আর প্রচ্ছায়া থাকিবে না। ইহার পরিবর্তে একটি বিপরীত শংকু HRT সৃষ্টি হইবে। এইরূপ অবস্থায় RT অংশে প্রভবের পরিধির নিকটস্থ (peripheral) অংশ হইতে কিছু কিছু আলো আসিয়া উপচ্ছায়ার সৃষ্টি করিবে। সুতরাং R এবং T মধ্যবর্তী যে-কোন অংশ হইতে প্রভবের দিকে

তাকাইলে AB বস্তুকে সম্পূর্ণ অন্ধকারাবৃত দেখাইবে কিন্তু তাহার চতুর্দিকে আলোকিত অংশ দেখা যাইবে (চিত্রের উপরে যেমন দেখানো হইয়াছে)। পর্দা আরো দূরে সরাইয়া লইলে উপচ্ছায়ার অন্ধকারের গাঢতা হ্রাস পাইতে থাকিবে। অবশেষে পর্দায় আলো ও ছায়ার পার্থক্য আর বোঝা যাইবে না।

এই প্রসঙ্গে বলা যাইতে পারে যে, গাছের পাতার ছায়া যখন মাটিতে পড়ে তখন প্রচ্ছায়া ও পাতলা উপচ্ছায়া লক্ষিত হয়। এখানে সূর্য আলোক প্রভব, পাতা অস্বচ্ছ পদার্থ ও মাটি পর্দা। তেমনি যখন এরোপ্লেন নীচু দিয়া উড়িয়া যায় তখন মাটিতে তাহার ছায়া পড়ে কিন্তু ক্রমশ উচ্চে উঠিলে (অর্থাৎ পর্দা হইতে বস্তুব দূরত্ব বাড়িতে থাকিলে) ছায়া পাতলা হইয়া অবশেষে অদৃশ্য হইয়া যায়।

5. গ্রহণ [Eclipses]

অস্বচ্ছ বস্তু কর্তৃক ছায়া সৃষ্টি দ্বারা সূযগ্রহণ বা চন্দ্রগ্রহণ ব্যাখ্যা করা যায়। সূর্য ভাস্বর। সূযের আলো পৃথিবীতে বা চাঁদে পড়িলে উহারা আলোকিত হয়। পৃথিবী বা চাঁদ অস্বচ্ছ, অপ্রভ বস্তু। তাছাড়া, পৃথিবী সূযের চতুর্দিকে এবং চন্দ্র পৃথিবীব চতুর্দিক পবিভ্রমণ করে। এইরূপে, ঘুরিতে ঘুবিতে মাসে দুইবার সূর্য, পৃথিবী ও চন্দ্র এক সরল বেথায় আসে। যেদিন পৃথিবী ও সূর্যের মাঝখানে চন্দ্র থাকে সেদিন চন্দ্রেব উজ্জ্বল অংশ পৃথিবীর বিপরীত দিকে পড়ে। তখন আমরা বলি অমাবস্যা তিথি। আব যেদিন চন্দ্র ও সূর্যের মাঝখানে পৃথিবী আসে সেদিন চন্দ্রের উজ্জ্বল অংশ পৃথিবীব দিকে পড়ে। তখন পুর্ণিমা তিথি। অমাবস্যায় চাঁদের ছায়া পৃথিবীতে পড়িয়া সূর্যগ্রহণেব সৃষ্টি করে, আবার পুর্ণিমায় পৃথিবীর ছায়ার ভিতর চাঁদ প্রবেশ করিলে চন্দ্রগ্রহণ হয়। কাজেই সূর্যগ্রহণের বেলাতে চাঁদ অস্বচ্ছ বস্তুর এবং চন্দ্রগ্রহণের বেলাতে পৃথিবী অস্বচ্ছ বস্তুর কার্য করে। দুই গ্রহণ কি করিয়া সংঘটিত হয় নিম্নে তাহার আলোচনা করা হইল।

সূর্যগ্রহণ :

সূর্যগ্রহণ তিন রকমের হইতে পারে। যথা :—(1) পুর্ণ গ্রহণ, (2) খণ্ড গ্রহণ ও (3) বলয় গ্রহণ।

নিজেদের কক্ষপথে পরিভ্রমণ করিতে করিতে অমাবস্যায় যখন পৃথিবী (E) ও সূর্যের (S) মাঝখানে চাঁদ (M) আসে তখন সূর্য হইতে আলোকরশ্মি অস্বচ্ছ চাঁদ কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হইয়া ছায়ার সৃষ্টি করে। এই ছায়ার CD অংশ প্রচ্ছায়া এবং CG, DF অংশ উপচ্ছায়া। চাঁদের ছায়ার প্রচ্ছায়া অংশ পৃথিবীর যে জায়গায় পড়ে সেখানকার লোক সূর্যের কোন অংশই দেখিতে পায় না এবং CG বা DF অংশ পৃথিবীর যে-সব জায়গায় পড়ে সেখানকার লোক সূর্যের কিছু অংশ দেখিতে পায়। CG অংশের লোক সূর্যের উপরিভাগ দেখিবে এবং DF অংশের লোক সূর্যের নিম্নভাগ দেখিবে। সুতরাং CD অংশের লোকের নিকট সূর্যের **পূর্ণ গ্রহণ** এবং CG ও DF অংশের লোকের নিকট সূর্যের **খণ্ড গ্রহণ** হইবে। চাঁদ পৃথিবী অপেক্ষা অনেক ছোট বলিয়া চাঁদের ছায়াও খুব ছোট। এই কারণে পৃথিবীর খুব কম অংশ চাঁদের প্রচ্ছায়ার মধ্যে পড়ে। সুতরাং পৃথিবীর খুব অল্প জায়গা হইতে সূর্যের পূর্ণ গ্রহণ দেখা যায়।
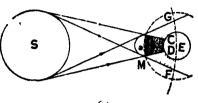
সূর্যগ্রহণ

বৎসরের সব সময় চন্দ্র ও পৃথিবীর ভিতরকার দূরত্ব ঠিক থাকে না বলিয়া অনেক সময় এমন হয় যে, চাঁদের প্রচ্ছায়া পৃথিবীকে স্পর্শ করিবার পূর্বেই শেষ হইয়া যায়। তৎপরিবর্তে উহাকে বাড়াইয়া যে বিপরীত শংকু হয় তাহা

সূর্যের বলয় গ্রহণ
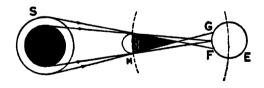
পৃথিবীকে স্পর্শ করে। চিত্রে পৃথিবীর GF অংশে ঐ শংকু স্পর্শ করিয়াছে। সুতরাং পৃথিবীর ঐ স্থানে অবস্থিত লোকেরা সূর্যের দিকে তাকাইলে সূর্যের মাঝখানে একটি অন্ধকারাবৃত বৃত্তাকার অংশ ও উহার চতুর্দিকে আলোকিত অংশ দেখিতে পাইবে। এই ধরনের গ্রহণকে **বলয় গ্রহণ** বলে।

চন্দ্র গ্রহণ :

পুর্বেই বলা হইয়াছে যে, চন্দ্রের নিজস্ব কোন আলো নাই। সূর্য হইতে আলো চন্দ্র কর্তৃক প্রতিফলিত হয় বলিয়া চন্দ্রকে উজ্জ্বল দেখায়। পুর্ণিমায় চন্দ্র ও সূর্যের মাঝখানে পৃথিবী অবস্থিত হয়।

নিজ নিজ কক্ষপথে পরিভ্রমণ করিতে করিতে পুর্ণিমায় যখন চাঁদ (M) ও সূর্যের (S) মাঝখানে পৃথিবী (E) আসিয়া পড়ে তখন পৃথিবীর ছায়া চন্দ্রের উপর গিয়া পড়ে। যখন চাঁদ পৃথিবীর প্রচ্ছায়া কর্তৃক সম্পূর্ণ আবৃত হয় তখন উহা আর দৃষ্টির গোচরে থাকে না, কারণ উহার উপর আর সূর্যের আলো পড়িতে পারে না। তখন চন্দ্রের **পূর্ণ গ্রহণ** হয়। আর যদি চন্দ্রের কিছু অংশ প্রচ্ছায়া কর্তৃক এবং কিছু অংশ উপচ্ছায়া কর্তৃক আবৃত হয় তবে চন্দ্রের **খণ্ড গ্রাস** হয়।
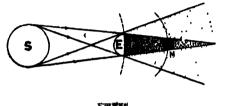
চন্দ্রগ্রহণ

পৃথিবীর আকার চন্দ্র অপেক্ষা বহুগুণ বৃহৎ হওয়ায় পৃথিবীর প্রচ্ছায়া-শংকুর শীর্ষবিন্দু সর্বদা চন্দ্রের কক্ষপথ ছাড়াইয়া যায়। সুতরাং চন্দ্রের বলয় গ্রাস কখনও সম্ভব নয়।

6. আলোকের গতিবেগ

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে আলো প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় 186,000 মাইল গতিবেগ লইয়া চলে। সুতরাং আলোর গতিবেগ প্রচণ্ড। প্রকৃতপক্ষে কোন বস্তুর গতিবেগ আলোর গতিবেগকে ছাড়াইয়া যাইতে পারে না।

সূর্য হইতে পৃথিবীর দূরত্ব প্রায় 93,000,000 মাইল এবং উপরোক্ত গতিবেগ লইয়া চলিবার ফলে সূর্য হইতে পৃথিবীতে পৌছাইতে আলোর প্রায় 8 মিনিট সময় লাগে। কিন্তু নভোমণ্ডলে এমন এমন নক্ষত্র বা গ্রহ আছে যাহাদের দূরত্ব সূর্যের দূরত্ব হইতে বহুগুণ বেশী। সুতরাং সেই সমস্ত গ্রহ বা নক্ষত্র হইতে আলো পৃথিবীতে আসিতে যথেষ্ট সময় লয়।

শব্দের গতিবেগ আলোর গতিবেগ অপেক্ষা অনেক কম। শব্দ প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় 1120 ft. গতিবেগে চলে। এই কারণে বজ্রপাতের সময়

আলোর ঝল্‌কানি দেখিবার অনেক পরে বজ্রের শব্দ শোনা যায়; যদিও উভয়েরই এক সঙ্গে উৎপত্তি হয়। তাই একটি চল্‌তি কথা আছে, বজ্রের শব্দ শুনিলে বজ্রাহত হইবার ভয় থাকে না।

আলোর গতিবেগ নির্ণয়ের প্রথম পরীক্ষা করেন ডেনমার্কের জ্যোতির্বিদ রোমার। পরে অবশ্য আরো অনেক বিজ্ঞানী এই গতিবেগের নিখুঁত পরিমাপ করিয়াছেন।

7. সমতলে আলোকের প্রতিফলন

[Reflection of light at plane surface]

আমরা দেখিয়াছি যে কোন সমসত্ত্ব মাধ্যমে (homogeneous medium) আলো সরলরেখায় গমন করে। কিন্তু আলো যখন এক মাধ্যম হইতে অন্য মাধ্যমে আপতিত হয় তখন ঐ আলোর কিছু অংশ দ্বিতীয় মাধ্যমের তল (surface) হইতে পুনরায় সরলরেখায় প্রথম মাধ্যমে ফিরিয়া আসে। এই ঘটনাকে আলোর **প্রতিফলন** বলে। দর্পণ দ্বারা আলোর প্রতিফলন তোমরা সকলেই দেখিয়াছ। কাচের জানালার উপর সূর্যের আলো আসিয়া পড়িলে ঐ আলো প্রতিফলিত হয় তাহাও তোমরা জান। সুতরাং আমাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতায় আলোর প্রতিফলন আমরা সর্বদাই দেখিতে পাই।

যদি প্রতিফলকের তল মসৃণ হয় তবে প্রতিফলিত রশ্মিগুলি একটি নির্দিষ্ট দিকে যাইবে এবং আপতিত রশ্মিগুচ্ছের সহিত প্রতিফলিত রশ্মিগুচ্ছের মিল থাকিবে। সংলগ্ন চিত্রে একটি মসৃণ তলে এক গুচ্ছ সমান্তরাল রশ্মি আপতিত হইয়াছে। উহাদের প্রতিফলিত রশ্মিগুচ্ছও সমান্তরাল। এই ধরনের প্রতিফলনকে **নিয়মিত** (regular) **প্রতিফলন** বলে। ইহার ফলে প্রতিফলকের যে-অংশ হইতে আলোকরশ্মি প্রতিফলিত হয়, সেই অংশ চকচকে দেখায়।

আলোকের নিয়মিত প্রতিফলন

পরপৃষ্ঠার চিত্রে একটি রশ্মি লইয়া নিয়মিত প্রতিফলন দেখানো হইয়াছে। AO রশ্মি M_1M_2 সমতল প্রতিফলক দ্বারা OB রশ্মিতে প্রতিফলিত
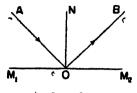
হইয়াছে। এখানে AO রশ্মিকে **আপতিত রশ্মি** বলা হয় এবং OB-কে বলা হয় **প্রতিফলিত** (reflected) **রশ্মি**। যে-বিন্দুতে আপতিত রশ্মি প্রতিফলকের উপর পড়ে (অর্থাৎ O বিন্দু) তাহাকে বলা হয় **আপতন বিন্দু** (point of incidence)। আপতন বিন্দু দিয়া প্রতিফলকের উপর যদি লম্ব টানা যায় (ছবিতে ON), তবে উহাকে **অভিলম্ব** (normal) বলা হয়।

একটি রশ্মির প্রতিফলন

আপতিত রশ্মি অভিলম্বের সহিত যে-কোণ উৎপন্ন করে (অর্থাৎ ∠AON) উহাকে **আপতন কোণ** (angle of incidence) এবং প্রতিফলিত রশ্মি অভিলম্বের সহিত যে-কোণ উৎপন্ন করে (অর্থাৎ ∠BON) উহাকে **প্রতিফলন কোণ** (angle of reflection) বলে।

নিয়মিত প্রতিফলনের সূত্র (Laws of regular reflection) :

(1) **আপতিত রশ্মি, প্রতিফলিত রশ্মি ও আপতন বিন্দু দিয়া প্রতিফলকের উপর অঙ্কিত অভিলম্ব একই সমতলে অবস্থান করে।**

(2) **আপতন কোণ সর্বদা প্রতিফলন কোণের সমান হইবে অর্থাৎ** ∠AON = ∠BON.

8. প্রতিবিম্ব ও উহার সংজ্ঞা

[Image and its definition]

প্রতিবিম্ব তোমরা সকলেই দেখিয়াছ। দর্পণের সম্মুখে দাঁড়াইলে আমরা আমাদের আকৃতির প্রতিবিম্ব দেখি। পুকুরের পাড়ে গাছ থাকিলে জলে উহার প্রতিবিম্ব দেখা যায়। এই প্রতিবিম্বের উৎপত্তি কিরূপে হয়?

সাধারণত বস্তু হইতে আলোকরশ্মি যখন সোজাসুজি আমাদের চোখে আসে তখন আমরা বস্তুটিকে যথাস্থানে দেখি। তোমার সামনে যে-বইখানি

দেখিতেছ তাহা হইতে আলোকরশ্মি সোজাসুজি তোমার চোখে পৌছাইতেছে বলিয়া তুমি বইটিকে যথাস্থানে দেখিতেছ। কিন্তু যখন আলোকরশ্মি প্রতিফলিত বা প্রতিসৃত (refracted) হইয়া বাঁকিয়া আমাদের চোখে আসে তখন মনে হয় বস্তুটি অন্য জায়গায় আছে, কারণ চোখ আলোকরশ্মির দিক্-পরিবর্তন অনুসরণ করিতে পারে না। চোখে যে-রশ্মিগুলি পৌছায় তাহাদের পশ্চাতে বর্ধিত করিলে উহারা যে-বিন্দুতে ছেদ করে, বস্তুটি সেখানে আছে বলিয়া মনে হয়। প্রকৃতপক্ষে বস্তুটির কোন স্থান পরিবর্তন হয় না। এই যে নতুন জায়গায় বস্তুটি আছে বলিয়া মনে হয়, তাহাকে বস্তুর **প্রতিবিম্ব** বলে।

সুতরাং যখন কোন বিন্দু প্রভব (point source) **হইতে আগত রশ্মিগুচ্ছ প্রতিফলিত বা প্রতিসৃত হইয়া অন্য কোন বিন্দুতে মিলিত হয় বা অন্য কোন বিন্দু হইতে অপসৃত হইতেছে বলিয়া মনে হয়, তখন ঐ দ্বিতীয় বিন্দুকে প্রথম বিন্দুপ্রভবের প্রতিবিম্ব বলা হয়।**

প্রতিবিম্ব দুই প্রকার হইতে পারে—সদ্-বিম্ব বা অসদ্-বিম্ব।

সদ্-বিম্ব : বিন্দুপ্রভব হইতে আগত রশ্মিগুচ্ছ প্রতিফলিত বা প্রতিসৃত হইয়া যদি অন্য কোন বিন্দুতে মিলিত হয় তবে ঐ বিন্দুকে প্রভবের সদ্-বিম্ব (real image) বলা হয়। চিত্রে P বিন্দু হইতে রশ্মিগুচ্ছ L উত্তল লেন্স দ্বারা অপসৃত হইয়া P′ বিন্দুতে মিলিত হইতেছে এবং পরে চোখে যাইয়া পড়িতেছে।

সদ্-বিম্ব
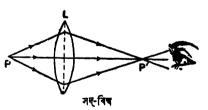
এস্থলে লেন্সের ভিতর দিয়া P বিন্দুর দিকে তাকাইলে চোখ P′ বিন্দুতে উহার প্রতিবিম্ব দেখিতে পাইবে। এই প্রতিবিম্বকে সদ্-বিম্ব বলা হয়। P′ বিন্দুতে কোন সাদা পর্দা রাখিলে পর্দায় P বিন্দুর প্রতিবিম্ব পড়িবে।

অসদ্-বিম্ব : যখন বিন্দুপ্রভব হইতে আগত রশ্মিগুচ্ছ প্রতিফলিত বা প্রতিসৃত হইয়া অন্য কোন বিন্দু হইতে অপসৃত হইতেছে বলিয়া মনে

হয়, তখন ঐ দ্বিতীয় বিন্দুকে প্রভবের অসদ্ বিম্ব (virtual image) বলা হয়। অসদ্‌বিম্ব যে-স্থানে গঠিত হয় সেখানে কোন সাদা পর্দা রাখিলে পর্দায় কোন প্রতিবিম্ব পড়ে না। আয়নায় আমরা যে-প্রতিবিম্ব দেখি তাহা অসদ্, আয়নার পিছনে—যেখানে প্রতিবিম্ব গঠিত হইতেছে—সেখানে কোন পর্দা রাখিলে আমরা কোন প্রতিবিম্ব দেখি না।

চিত্রে M_1M_2 দর্পণের সম্মুখে P একটি বিন্দুপ্রভব। P হইতে রশ্মিগুচ্ছ বহির্গত হইয়া দর্পণ কর্তৃক প্রতিফলিত হইতেছে এবং চোখে গিয়া পড়িতেছে।

অসদ্-বিম্ব
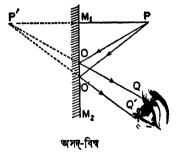
চোখ আলোকরশ্মির এই বাঁকা গতিপথ অনুসরণ করিতে পারিবে না। দর্পণের ভিতর দিয়া তাকাইলে মনে হইবে প্রতিফলিত রশ্মিগুলি P' বিন্দু হইতে আসিতেছে অর্থাৎ মনে হইবে P বিন্দু P' বিন্দুতে অবস্থিত। সুতরাং P' বিন্দু P বিন্দুর অসদ-বিম্ব। এস্থলে P' বিন্দুর স্থানে পর্দা রাখিলে পর্দায় কোন প্রতিবিম্ব পড়িবে না। সুতরাং অসদ্-বিম্ব কেবলমাত্র চোখে দেখা যায়।

অসদ্-বিম্বের আরো অনেক সাধারণ উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। যেমন, পুকুরের পাড়ে গাছ থাকিলে জলের ভিতর গাছের প্রতিবিম্ব দেখা যায়। এই বিম্বও অসদ্। এক্ষেত্রে, জলের তল দর্পণের ন্যায় কাজ করে। গাছ হইতে আলোকরশ্মি জল-তল কর্তৃক প্রতিফলিত হইয়া যখন চোখে পৌঁছায় তখন গাছের অসদ্-বিম্ব সৃষ্টি হয়। বিম্ব যেখানে সৃষ্টি হয় সেখানে কোন পর্দা রাখিলে প্রতিবিম্ব পর্দায় পড়িবে না।

সদ্ ও অসদ্-বিম্বের পার্থক্য ঃ

(1) কোন বিন্দু হইতে আগত রশ্মিগুচ্ছ প্রতিফলিত বা প্রতিসৃত হইয়া যদি কোন বিন্দুতে মিলিত হয় তবেই সদ্-বিম্ব সৃষ্টি হয়। কিন্তু যদি তাহারা এক বিন্দুতে মিলিত না হইয়া কোন এক বিন্দু হইতে অপসৃত হইতেছে বলিয়া মনে হয়, তবে অসদ্-বিম্বের সৃষ্টি হয়।

(2) সদ্-বিম্ব চোখে দেখা যায় এবং পর্দাতে ফেলা যায়। কিন্তু অসদ্-বিম্ব শুধু চোখে দেখা যায় ; পর্দায় ফেলা যায় না।

সরল পেরিস্কোপ (Simple periscope) :

সমতল দর্পণে আলোকরশ্মির প্রতিফলনকে কাজে লাগাইয়া সরল পেরিস্কোপ গঠন করা হয়। সংলগ্ন চিত্রে ইহার একটি নক্‌শা দেখানো হইয়াছে।

পেরিস্কোপ

M_1 এবং M_2 দুইটি সমতল দর্পণ সমান্তরালভাবে একটি কাঠের ফ্রেমে বা ধাতব নলে আটকানো। দর্পণদ্বয়কে সমান্তরাল রাখিয়া এদিক-ওদিকে ঘুরাইবার ব্যবস্থা আছে। ফ্রেমটিকে খাড়া অবস্থায় রাখিয়া নীচের দর্পণের দিকে তাকাইলে বহু দূরের জিনিস দেখা যাইবে। সাধারণত কোন দূরের জিনিস সোজাসুজি দেখিতে বাধা থাকিলে এই যন্ত্রের সাহায্যে তাহা দেখা যায়। কোন বস্তু হইতে দূরাগত আলোকরশ্মি M_1 দর্পণ কর্তৃক প্রতিফলিত হইয়া নলের অক্ষ (axis) বরাবর আসিয়া M_2 দর্পণে পড়িবে এবং পুনরায় প্রতিফলিত হইয়া অনুভূমিকভাবে মানুষের চোখে পৌঁছাইবে। সুতরাং দূরের জিনিস সোজাসুজি না দেখতে পাইলে এইভাবে দেখা যাইবে।
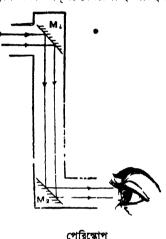
গড়ের মাঠে বহুলোক এই ধরনের পেরিস্কোপ লইয়া ভীড়ের উপর দিয়া খেলা দেখে। যুদ্ধের সময় পরিখার ভিতর লুকাইয়া বিপক্ষ সৈন্যদের কার্যকলাপ এই পেরিস্কোপের সাহায্যে দেখা যায়। ডুবোজাহাজে ইহা অপেক্ষা উন্নত ধরনের পেরিস্কোপ ব্যবহৃত হয়।

১৮৬. গোলীয় দর্পণে [Spherical mirror] প্রতিফলন

তোমরা হয়ত লক্ষ্য করিয়া থাকিবে যে মোটরগাড়ীতে চালকের সামনে বা সার্চলাইটের প্রতিফলক হিসাবে গোলীয় দর্পণ ব্যবহার করা হয়। আলোর প্রতিফলক হিসাবে গোলীয় দর্পণের অনেক ব্যবহার দেখা যায়।

উত্তল ও অবতল দর্পণ [Convex and Concave mirror] :

যদি কোন ফাঁপা গোলক MOM-এর বাহিরের কিছু অংশ [(1) নং চিত্র] চকচকে হয় এবং আলোকরশ্মিকে প্রতিফলিত করিতে পারে তবে উহাকে উত্তল দর্পণ বলা হয়।
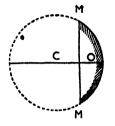
(1) উত্তল দর্পণের বাহিরের অংশ চকচকে

(ii) উত্তল দর্পণ

(ii) নং চিত্রে একটি উত্তল দর্পণের আসল চেহারা দেখানো হইল।

যদি কোন ফাঁপা গোলক MOM-এর ভিতরের কিছু অংশ [নীচেব (i) নং চিত্র] চক্‌চকে হয় এবং আলোক-রশ্মিকে প্রতিফলিত করিতে পারে তবে তাহাকে অবতল দর্পণ বলা হয়। (ii) নং চিত্রে একখানি অবতল দর্পণের আসল চেহারা দেখানো হইয়াছে।
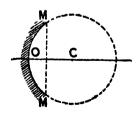
(i) অবতল দর্পণের ভিতরের অংশ চকচকে

(ii) অবতল দর্পণ

দর্পণ যে গোলকের অংশ সেই গোলকের কেন্দ্রবিন্দুকে দর্পণের বক্রতা-কেন্দ্র বলে। উপরের চিত্রগুলিতে C হইল MM দর্পণের বক্রতা-কেন্দ্র।

দর্পণের মধ্যবিন্দু অর্থাৎ O বিন্দুকে দর্পণের **মধ্যবিন্দু** (pole) বলা হয়। মধ্যবিন্দু ও বক্রতা-কেন্দ্র যোগ করিলে যে সরল-রেখা পাওয়া যায় (OC) তাহাকে দর্পণের **প্রধান অক্ষ** (principal axis) বলে।

দর্পণের ফোকাস্ ও ফোকাস্-দূরত্ব ঃ

ধরা যাউক, MM একটি অবতল বা উত্তল দর্পণ। দর্পণের উপর একগুচ্ছ সমান্তরাল রশ্মি দর্পণের প্রধান অক্ষের সমান্তরাল ভাবে আসিয়া আপতিত হইল [(i) এবং (ii) নং চিত্র]। দর্পণ কর্তৃক প্রতিফলিত হইবার পর দেখা যাইবে যে প্রতিফলিত রশ্মিগুলি এমনভাবে যাইতেছে যে উহারা F বিন্দুতে মিলিত হইতেছে [(i) চিত্র] অথবা উহাদের পশ্চাৎদিকে বর্ধিত করিলে

(i) অবতল দর্পণের ফোকাস (ii) উত্তল দর্পণের ফোকাস
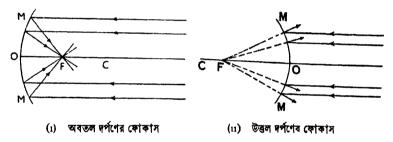
প্রধান অক্ষের কোন বিন্দু F হইতে আসিতেছে [(ii) নং চিত্র]। উক্ত বিন্দু F-কে অবতল অথবা উত্তল দর্পণের ফোকাস্ বলে। দর্পণের মধ্যবিন্দু O হইতে ফোকাস্ পর্যন্ত দূরত্বকে দর্পণের ফোকাস্-দূরত্ব বলা হয়।

অবতল দর্পণ কর্তৃক প্রতিবিম্ব গঠন ঃ

বস্তুর অবস্থানের উপর নির্ভর করিয়া অবতল দর্পণ সদ্ ও অসদ্ এবং বৃহত্তর, ক্ষুদ্রতর অথবা সমান সাইজের—সকল প্রকার প্রতিবিম্ব তৈয়ারী করিতে পারে। পরপৃষ্ঠায় প্রদর্শিত রেখাঙ্কন হইতে ইহা সহজেই বুঝিতে পারিবে।

OLN একটি অবতল দর্পণ। উহার প্রধান অক্ষ OC-র উপর একটি বস্তু PQ খাড়াভাবে অবস্থিত। বস্তুটি দর্পণের বক্রতা-কেন্দ্র C হইতে কিছু দূরে আছে [চিত্র (i)]। বস্তুর P বিন্দু হইতে আলোকরশ্মি চতুর্দিকে গমন করিবে। একটি আলোকরশ্মি PL অক্ষের সমান্তরাল ভাবে গিয়া দর্পণে পড়িতেছে। প্রতিফলনের পর উহা F বিন্দু দিয়া চলিয়া যাইবে (ফোকাসের সংজ্ঞা দেখ)

অপর একটি রশ্মি PC বক্রতা-কেন্দ্র C-র মধ্য দিয়া দর্পণে পড়িতেছে। এই রশ্মিটি দর্পণে অভিলম্বভাবে আপতিত হইতেছে ; কারণ CN দর্পণের বক্রতা-ব্যাসার্ধ। সুতরাং রশ্মিটি প্রতিফলনের পর পুনরায় NCP পথে প্রত্যাবর্তন
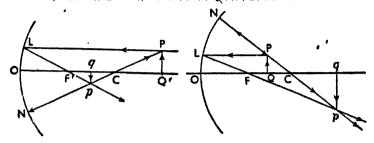
(i) বস্তু বক্রতা-কেন্দ্র হইতে কিছু দূরে ; প্রতিবিম্ব সদ্, উল্টা এবং ছোট

(ii) বস্তু বক্রতা-কেন্দ্র ও ফোকাসের মধ্যবর্তী ; প্রতিবিম্ব সদ্, উল্টা এবং বৃহত্তর

করিবে। লক্ষ্য করিয়া দেখ, এই দুইটি প্রতিফলিত রশ্মি সত্য সত্য *p* বিন্দুতে মিলিত হইতেছে। সুতরাং ঐ বিন্দু P-বিন্দুর সদ্-বিম্ব। OQ অক্ষের উপর *pq* লম্ব টানিলে উহা PQ বস্তুর সদ্-বিম্ব হইবে। এই প্রতিবিম্ব আকারে ক্ষুদ্র এবং উল্টা।

PQ বস্তুকে এখন দর্পণের ফোকাস্ এবং বক্রতা-কেন্দ্রের মধ্যে বসানো হইল [(ii) নং চিত্র]। উপরোক্ত পদ্ধতিতে প্রতিবিম্ব অঙ্কন করিলে দেখা যাইবে যে *pq* প্রতিবিম্ব আকারে বৃহত্তর হইয়াছে ; উহা সদ্ এবং উল্টা। বস্তুকে ঠিক বক্রতা-কেন্দ্রে রাখিলে বস্তুর সমান সাইজের সদ্ প্রতিবিম্ব পাওয়া যাইবে [ছবি আঁকিয়া দেখ]।

এবার, PQ বস্তুকে দর্পণের দিকে আরো সরাইয়া মধ্যবিন্দু O এবং ফোকাস্ F-এর মাঝে বসানো হইল। প্রতিফলিত রশ্মি অঙ্কিত করিলে দেখিবে উহারা কোথাও সত্য সত্য মিলিত হয় না [ছবি দেখ]। কিন্তু পিছনে বর্ধিত করিলে মনে হয় যেন *p* বিন্দু হইতে আসিতেছে। এক্ষেত্রে *pq* হইবে বস্তুর অসদ্-বিম্ব। এই বিম্ব বস্তু হইতে আকারে বৃহত্তর এবং সোজা।
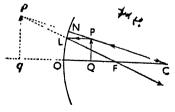
বস্তু O বিন্দু ও F বিন্দুর মধ্যে ; প্রতিবিম্ব অসদ্, সোজা এবং বৃহত্তর

উত্তল দর্পণ কর্তৃক প্রতিবিম্ব গঠন :

সংলগ্ন চিত্রে LO একটি উত্তল দর্পণ এবং উহার প্রধান অক্ষের উপর লম্বভাবে PQ একটি বস্তু। বস্তুর P বিন্দু হইতে আলোকরশ্মি চতুর্দিকে গমন করিবে। মনে কর, PL একটি আলোকরশ্মি যাহা প্রধান অক্ষের সমান্তরাল-ভাবে গিয়া L বিন্দুতে দর্পণের উপর আপতিত হইল। প্রতিফলিত রশ্মি LM এমনভাবে যাইবে যে উহাকে পশ্চাৎদিকে বর্ধিত করিলে ফোকাস F বিন্দু অতিক্রম করিবে (ফোকাসের সংজ্ঞা দ্রষ্টব্য)। অপর একটি রশ্মি PN এমভাবে দর্পণে আপতিত হইল যে দর্পণের বক্রতা-কেন্দ্র C অভিমুখে যাইতে চায়। এ অবস্থায় রশ্মিটি দর্পণে অভিলম্বভাবে আপতিত হইবে, কারণ CN হইল দর্পণেব বক্রতা-ব্যাসার্ধ। সুতরাং রশ্মিটি প্রতিফলিত হইয়া পুনরায় NP পথে ফিরিয়া যাইবে। এই দুইটি প্রতিফলিত রশ্মি সত্য সত্য কোথাও মিলিত হয় না, কিন্তু পশ্চাতে বর্ধিত করিলে মনে হয় p বিন্দু হইতে আসিতেছে। অর্থাৎ p বিন্দু হইল P বিন্দুর অসদ্-বিম্ব। p বিন্দু হইতে অক্ষের উপর pq লম্ব টানিলে বস্তুর সমগ্র প্রতিবিম্ব পাওয়া যাইবে।
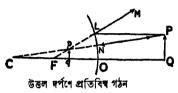
উত্তল দর্পণে প্রতিবিম্ব গঠন

ছবি হইতে সহজে বোঝা যায় যে এই প্রতিবিম্ব অসদ্, সোজা ও বস্তুর আকার হইতে ক্ষুদ্রতর। বস্তু যেখানেই থাকুক না কেন উত্তল দর্পণে প্রতি-বিম্বের আকৃতি ও প্রকৃতি অপরিবর্তিত থাকে অর্থাৎ প্রতিবিম্ব সর্বদা অসদ্, সোজা ও ক্ষুদ্রতর হইবে।

10. আলোকের সমতলে প্রতিসরণ
[Refraction of light at plane surface]

একটি জলপুর্ণ পাত্রের তলদেশে দৃষ্টিপাত কর। মনে হইবে যেন তলদেশ খানিকটা উপরে উঠিয়া আসিয়াছে। তেমনি, একটি লাঠি বাঁকাভাবে জলে খানিকটা ডুবাইয়া ধর। মনে হইবে যেন লাঠিটি যেখানে জল স্পর্শ করিয়াছে সেখান হইতে লাঠিটি বাঁকা। ইহা হইতে বোঝা যায়, আলোকরশ্মি জলে যে সরল রেখায় চলে জল হইতে বায়ুতে প্রবেশ করিলে অন্য সরল রেখায় চলে। অর্থাৎ, **এক মাধ্যম হইতে অন্য মাধ্যমে প্রবেশ করিলে আলো**

গতির অভিমুখ পরিবর্তন করে। আলোকরশ্মির গতির অভিমুখের এই পরিবর্তনকে আলোর **প্রতিসরণ** বলে।

ধরা যাউক, একটি আলোকরশ্মি বায়ু-মাধ্যমে AB সরলরেখায় আসিয়া একটি কাচের ব্লকের উপর তির্যকভাবে আপতিত হইল [চিত্রে দেখ]। আলোক-রশ্মি এইবার কাচের ভিতরে প্রবেশ করিবে। কিন্তু কাচের ভিতরে রশ্মি যে সরলরেখায় যাইবে তাহা AB হইতে ভিন্ন—কারণ B বিন্দুতে আলোকের প্রতিসরণ হইবে। ধরা যাউক, কাচের ভিতর আলোকরশ্মি BC সরলরেখায় গমন করিল। এস্থলে AB আপতিত রশ্মি, BC প্রতিসৃত (refracted) রশ্মি, B আপতন বিন্দু (point of incidence) এবং PQ হইল দুই মাধ্যমের বিভাগ-তলের ছেদ-রেখা (line of section)। যদি B বিন্দু দিয়া PQ রেখার উপর লম্ব টানা যায় (চিত্রে NBN′) তবে উহাকে আপতন বিন্দুতে বিভাগ তলের উপর অভিলম্ব বলা হয়। আপতিত রশ্মি AB অভিলম্ব BN-এর সহিত যে-কোণ উৎপন্ন করে (অর্থাৎ $\angle ABN$) তাহাকে আপতন কোণ বলে এবং প্রতিসৃত রশ্মি BC উক্ত অভিলম্বের সহিত যে-কোণ উৎপন্ন করে (অর্থাৎ $\angle CBN'$) তাহাকে প্রতিসৃত কোণ বলে।
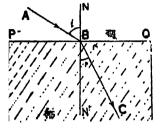
আলোকের প্রতিসরণ

দেখা গিয়াছে যে আলোকরশ্মি যখন লঘু মাধ্যম হইতে ঘন মাধ্যমে প্রতিসৃত হয় (যেমন বায়ু হইতে কাচে) তখন প্রতিসৃত রশ্মি অভিলম্বের দিকে বাঁকিয়া যায় অর্থাৎ প্রতিসৃত কোণ আপতন কোণ অপেক্ষা ছোট হয় [উপরের চিত্র]।

কিন্তু যদি আলোকরশ্মি ঘন মাধ্যম হইতে লঘু মাধ্যমে প্রতিসৃত হয় (যেমন কাচ হইতে বায়ুতে) তবে প্রতিসৃত রশ্মি অভিলম্ব হইতে দূরে সরিয়া যায়—অর্থাৎ প্রতিসৃত কোণ আপতন কোণ অপেক্ষা বড় হয় [পার্শ্বের চিত্র]।
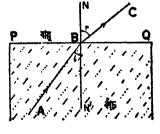
ঘন মাধ্যম হইতে লঘু মাধ্যমে আলোকের প্রতিসরণ

আলোকের প্রতিসরণের কয়েকটি দৃষ্টান্ত :

(1) একটি কাগজের উপর কালির ফোঁটা ফেলিয়া উহার উপর একটি কাচের ব্লক রাখ। এইবার কাচের ভিতর দিয়া সোজাসুজি ফোঁটাটি লক্ষ্য করিলে মনে হইবে যেন উহা খানিকটা উপরে উঠিয়া আছে। আলোকের প্রতিসরণের জন্য এইরূপ মনে হয়।

মনে কর, O বিন্দু হইল ফোঁটাটি (চিত্র দেখ]। এখন O বিন্দু হইতে রশ্মি গুচ্ছকে চোখে পৌঁছাইতে হইলে বায়ুতে প্রবেশ করিতে হইবে। সুতরাং দুই মাধ্যমের বিভাগ-তলে রশ্মির প্রতিসরণ হইবে। যেহেতু রশ্মি ঘন মাধ্যম হইতে লঘু মাধ্যমে যাইতেছে, সুতরাং প্রতিসৃত রশ্মি অভিলম্ব হইতে দূরে সরিয়া যাইবে এবং চোখ দেখিবে যেন রশ্মিগুলি O′ বিন্দু হইতে আসিতেছে।

প্রতিসরণের দরুন O বিন্দু O′ বিন্দুতে দেখাইবে

একই কারণে জলভর্তি পাত্রের তলদেশে সোজাসুজি তাকাইলে মনে হয় পাত্রের জল তত গভীর নয়।
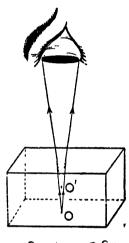
(2) **জলে নিমজ্জিত দণ্ডের বক্রতা :**

একটি দণ্ড জলে তির্যকভাবে আংশিক ডুবাইয়া রাখিলে মনে হয় যেন দণ্ডটি যেখানে জল স্পর্শ করিয়াছে সেখান হইতে বাঁকিয়া গিয়াছে [চিত্রে দ্রষ্টব্য]। আলোকের প্রতিসরণের জন্য এই-রূপ হয়।

প্রতিসরণের দরুন দণ্ডটি ভাঙ্গা দেখাইতেছে
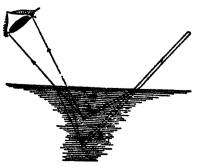
দণ্ডের যে অংশ জলের বাহিরে আছে তাহা হইতে আলোকরশ্মি সোজাসুজি চোখে আসিবে। সুতরাং ঐ অংশকে চোখ যথা-স্থানেই দেখিবে। কিন্তু জলের ভিতরের অংশ হইতে আলোক-রশ্মি যখন চোখে আসিবে তখন

জল ও বায়ুর বিভাগ-তলে প্রতিসৃত হইয়া চোখে পৌঁছাইবে। এস্থলে রশ্মি ঘনতর মাধ্যম হইতে লঘুতর মাধ্যমে প্রবেশ করায় প্রতিসৃত রশ্মি অভিলম্ব হইতে সরিয়া যাইবে এবং মনে হইবে যেন B বিন্দুটি A বিন্দুতে রহিয়াছে। তেমনি নিমজ্জিত অংশের অন্যান্য বিন্দুগুলিও ঐ ভাবে মনে হইবে খানিকটা উঠিয়া আছে। সুতরাং নিমজ্জিত অংশ ও বাহিরের অংশ একই সরল রেখায় না দেখায় মনে হয় লাঠিটি বাঁকিয়া আছে।

(3) **জলে নিমজ্জিত মুদ্রার প্রতিবিম্ব :**

একটি কাঁসার বড় বাটিতে একটি চকচকে টাকা রাখ এবং চোখকে আস্তে আস্তে সরাইয়া এমন স্থানে আন যাহাতে টাকাটি সভ্য দৃষ্টির অগোচর হয়। এই অবস্থায় টাকা হইতে আলোকরশ্মি বাটির গাত্র দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হওয়ায় চোখে পৌঁছাইবে না।

চোখকে ঐ অবস্থায় রাখিয়া এইবার বাটি জলপূর্ণ কর। দেখিবে যে টাকাটি এবার দৃষ্টিগোচর হইয়াছে। এইরূপ হইবার কারণ আলোকের প্রতিসরণ।

বাটিতে জল থাকায় টাকা হইতে আলোকরশ্মি প্রতিসৃত হইয়া চোখে আসিবে এবং চোখ দেখিবে যেন P বিন্দুটি P´ বিন্দুতে অবস্থিত আছে। অর্থাৎ টাকাটি মনে হইবে খানিকটা উপরে উঠিয়া আসিয়াছে। সুতরাং উহা দৃষ্টির গোচরে আসিবে।
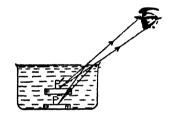
জলে নিমজ্জিত মুদ্রার প্রতিবিম্ব

11. লেন্স (Lens) ও আলোর প্রতিসরণ

বহু পূর্বকাল হইতে লেন্স ব্যবহারের প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। সমান্তরাল রশ্মিগুচ্ছকে এক বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত করিবার যে-ক্ষমতা লেন্সের আছে তাহা বহু পূর্ব হইতেই জানা ছিল এবং লেন্সের এই ধর্মকে অবলম্বন করিয়া বহুশত বৎসর পূর্বে 'Burning glass' বা আতসী কাচের উদ্ভাবন হইয়াছিল। 1857 খ্রীষ্টাব্দে লেন্সের এই ধর্মকে অবলম্বন করিয়া একটি কাচের গোলক নির্মিত হইয়াছিল। এই গোলকদ্বারা সূর্যরশ্মিকে কেন্দ্রীভূত করিয়া ঘণ্টা ও মিনিট চিহ্নিত একখানি কাগজ দগ্ধ করিয়া সময় নির্দেশ করিবার ব্যবস্থা করা

হইয়াছিল। আধুনিককালে ক্যামেরা, অণুবীক্ষণ, দূরবীক্ষণ প্রভৃতি নানারকম প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতিতে লেন্সের বহুল প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়।

কোন স্বচ্ছ প্রতিসারক (refracting) মাধ্যমকে যদি দুইটি গোলীয় অথবা একটি গোলীয় ও একটি সমতল তল দ্বারা সীমাবদ্ধ করা যায় তবে সেই মাধ্যমকে **লেন্স** বলে।

(i) উত্তল, (ii) অবতল

যে-লেন্সের মধ্যস্থলে মোটা এবং প্রান্তের দিকটা সরু তাহাকে **উত্তল** বা **অভিসারী** (converging) লেন্স বলে [(i) নং চিত্র]। আর যে-লেন্সের মধ্যস্থল সরু এবং প্রান্তের দিকটা মোটা তাহাকে অবতল বা অপসারী লেন্স বলে [(ii) নং চিত্র]।

ফোকাস্ ও ফোকাস্-দূরত্ব :

কোন উত্তল লেন্সের প্রধান অক্ষেব সমান্তরাল কোন রশ্মিগুচ্ছ লেন্সের উপর আপতিত হইয়া লেন্স কর্তৃক প্রতিসরণের ফলে রশ্মিগুচ্ছ অভিসারী রশ্মিগুচ্ছে পরিণত হয় এবং অক্ষের উপরে অবস্থিত কোন এক বিন্দুতে সত্য সত্য মিলিত হয় [চিত্র দ্রষ্টব্য]। উক্ত বিন্দুকে উতল লেন্সের **ফোকাস্** বলা হয়। চিত্রে F বিন্দু লেন্সের **ফোকাস্**।
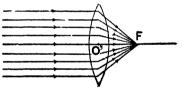
উত্তল লেন্সের ফোকাস্

সাধারণত আমরা যে-সমস্ত লেন্স ব্যবহার করি তাহার দুইটি তলই সমান-ভাবে বাঁকানো। ঐ ধরনের লেন্সের প্রধান অক্ষের উপর অবস্থিত এবং লেন্সের উভয় তল হইতে সমদূরবর্তী বিন্দুকে [O] লেন্সের **আলোক-কেন্দ্র** (optical centre) বলে। লেন্স সরু হইলে কোন আলোক-রশ্মি আলোক-কেন্দ্রের ভিতর দিয়া গেলে সোজা বাহির হইয়া আসে; উহার কোন প্রতিসরণ হয় না। লেন্সের আলোক-কেন্দ্র O হইতে ফোকাস্ F-এর দূরত্বকে **ফোকাস্-দূরত্ব** বলে।

লেন্স কর্তৃক বস্তুর প্রতিবিম্ব গঠন :

আমরা জানি যে, কোন বস্তু হইতে নির্গত আলোকরশ্মি যদি প্রতিসৃত হয় তবে ঐ প্রতিসৃত রশ্মি বস্তুর প্রতিবিম্ব সৃষ্টি করে। প্রতিসৃত রশ্মিগুলি যদি কেন বিন্দুতে সত্য সত্য মিলিত হয় তবে ঐ বিন্দু হইবে বস্তুবিন্দুর সদ্‌বিম্ব (real image) এবং যদি কোন বিন্দু হইতে অপসৃত হইতেছে বলিয়া মনে হয় তবে ঐ বিন্দু হইবে বস্তুবিন্দুর অসদ্‌বিম্ব (virtual image)। যেহেতু লেন্স একটি প্রতিসারক মাধ্যম অতএব লেন্স উপরোক্ত পদ্ধতিতে বস্তুর প্রতিবিম্ব গঠন করিতে সক্ষম। প্রকৃতপক্ষে লেন্স দ্বারা আমরা বস্তুর সদ্‌ ও অসদ্‌-বিম্ব গঠন করিতে পারি।

পরীক্ষা : একটি মোমবাতির শিখা ও একটি দণ্ডে আবদ্ধ কাগজের পর্দা পরস্পর হইতে খানিকটা দূরে রাখ। এইবার আর একটি দণ্ডে একটি উত্তল লেন্স আটকাও এবং পর্দা ও শিখার মাঝখানে বসাও। এখন লেন্সটিকে একটু অগ্র-পশ্চাৎ সরাও। দেখিবে লেন্সের কোন এক অবস্থানে কাগজের
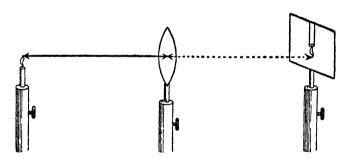
লেন্স কর্তৃক সদ্‌-বিম্ব গঠন

উপর শিখার একটি স্পষ্ট প্রতিবিম্ব পড়িবে (চিত্রে দেখ)। এস্থলে উত্তল লেন্স সদ্‌-বিম্ব গঠন করিল।

প্রতিবিম্ব অঙ্কনের নিয়ম : উত্তল বা অবতল দর্পণের বেলাতে যে-নিয়ম অবলম্বন করিয়া প্রতিবিম্ব অঙ্কিত করা হইয়াছে লেন্সের বেলাতেও ঐরূপ নিয়ম অবলম্বন করিতে হইবে।

LO একটি উত্তল লেন্স এবং PQ একটি বস্তু প্রধান অক্ষের উপর লম্বভাবে দণ্ডায়মান এবং লেন্স হইতে যথেষ্ট দূরে অবস্থিত। একটি রশ্মি PL [চিত্র (i)]

প্রধান অক্ষের সমান্তরাল আসিয়া প্রতিসৃত হইবার পর ফোকাস বিন্দু F-এর মধ্য দিয়া Fp পথে যাইবে। আর একটি রশ্মি PO আলোক-কেন্দ্রের মধ্য দিয়া
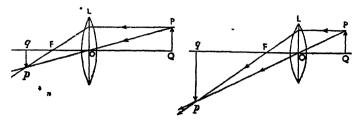
(i) বস্তু-লেন্স হইতে বহুদূর থাকিলে প্রতিবিম্ব আকারে বস্তু অপেক্ষা ছোট হয়

(ii) যদি বস্তু ফোকাস-বিন্দুর ঠিক ডানদিকে থাকে তবে প্রতিবিম্ব আকারে বস্তু অপেক্ষা বড় হয়

সোজাসুজি চলিয়া আসিল। দুইটি প্রতিসৃত রশ্মি p বিন্দুতে মিলিত হওয়ায় pq হইবে সদ্-বিম্ব। বস্তু PQ বহু দূরে থাকিলে প্রতিবিম্ব pq আকারে ছোট হইবে এবং উল্টা হইবে।

যদি বস্তু PQ ফোকাস-বিন্দুর ঠিক ডানদিকে থাকে তবে প্রতিবিম্ব আকারে বড় হয়। উহা কিরূপে অঙ্কিত করিতে হয় তাহা (ii) নং চিত্রে দেখানো হইল।

অবতল লেন্স সর্বদা অসদ্‌বিম্ব তৈয়ারী করে এবং উহা আকারে সর্বদা বস্তু অপেক্ষা ছোট হয় (চিত্র দেখ)। P বিন্দু হইতে একটি রশ্মি PL লেন্সের অক্ষের

অবতল লেন্স কর্তৃক প্রতিবিম্ব গঠন
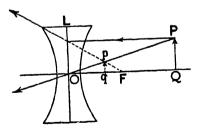
সমান্তরালে আসিয়া এমনভাবে প্রতিসৃত হইবে যেন পশ্চাতে বর্ধিত করিলে উহা ফোকাস-F বিন্দু দিয়া যায়। অপর একটি রশ্মি PO আলোক-কেন্দ্রের মধ্য দিয়া সোজা-সুজি বাহির হইয়া যাইবে। এই দুইটি প্রতিসৃত রশ্মি কোথাও মিলিত হয় না, কিন্তু মনে হয় যেন p বিন্দু হইতে নির্গত হইতেছে। সুতরাং pq হইবে অসদ্-বিম্ব। ইহা সোজা এবং আকারে বস্তু অপেক্ষা ছোট।

12. মানুষের চোখ

মানুষের চোখ : চোখ মানুষের এক অপুর্ব সম্পদ। ইহাকে মানুষের তৈরী ক্যামেরার সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। ক্যামেরার সম্মুখে কোন বস্তু রাখিলে যেমন ফটোগ্রাফী প্লেটে উহার ছবি ওঠে, তেমনি চোখের সম্মুখে কোন বস্তু রাখিলে চোখের অক্ষিপটে (retina) উহার ছবি ওঠে এবং বস্তুটি সম্বন্ধে আমাদের দর্শনানুভূতি হয়।

সংলগ্ন চিত্রে চোখের প্রধান কয়েকটি অংশ দেখান হইল। চোখের আকার প্রায় গোল এবং ইহা একটি কোটরের (socket) মধ্যে ঘুরিতে পারে। অক্ষিগোলক একটি মজবুত সাদা আবরণের মধ্যে আবৃত। ইহাকে **শ্বেতমণ্ডল**
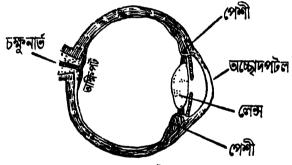
মানুষের চোখের কয়েকটি প্রধান অংশ

(sclerotica) বলে। ইহার মধ্যস্থান স্বচ্ছ। ঐ স্বচ্ছ অংশকে **অচ্ছোদ-পটল** (cornea) বলে। ইহার পিছনে একটি **উত্তল লেন্স** আছে। ইহা স্বচ্ছ জৈব পদার্থ দ্বারা গঠিত। লেন্সটি অক্ষিগোলকের সহিত কতকগুলি পেশীদ্বারা যুক্ত। এই পেশীগুলির সংকোচন ও প্রসারণের ফলে চোখের লেন্সের ফোকাস-দূরত্ব পরিবর্তিত হয়। লেন্সের পিছনে একটি পর্দা আছে যাহা **চক্ষু-নার্ভের** (optic-nerves) সহিত যুক্ত। এর পর্দাকে বলা হয় **অক্ষিপট** (retina)। অক্ষিপট এবং লেন্সের মধ্যবর্তী স্থান কিছু জলীয় পদার্থ দ্বারা পুর্ণ।

যখনই কোন বস্তু চোখের সম্মুখে আসে তখন বস্তু হইতে আলোকরশ্মি নির্গত হইয়া চোখের লেন্স কর্তৃক প্রতিসৃত হয় এবং অক্ষিপটে বস্তুর প্রতিবিম্ব গঠন করে। চক্ষু-নার্ভ এই প্রতিবিম্বের সংবাদ মস্তিষ্কে পৌছাইয়া দিলে বস্তু-সম্বন্ধে আমাদের দর্শনানুভূতি হয়।

সাধারণ সুস্থ চোখের লেন্সের ফোকাস-দূরত্ব লেন্স হইতে অক্ষিপটের দূরত্বের সমান। এই কারণে বহু দূরের জিনিস হইতে সমান্তরাল রশ্মিগুচ্ছ লেন্স কর্তৃক প্রতিসৃত হইবার পর অক্ষিপটে প্রতিবিম্ব গঠন করে এবং জিনিসটি দৃষ্টিগোচর হয়। কিন্তু বস্তুটি যত নিকটে আসে তত প্রতিবিম্ব অক্ষিপটের পশ্চাতে হইতে চায়। কিন্তু মাংস-পেশী সংকোচনের দ্বারা আমরা আপনা হইতে লেন্সের ফোকাস-দূরত্ব এমনভাবে পরিবর্তিত করি যে, বস্তুটি কাছে আসিলেও প্রতিবিম্ব সর্বদা অক্ষিপটে গঠিত হয় এবং জিনিসটি দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাকে **উপযোজন** (accomodation) বলে।

কিন্তু মানুষের চোখের উপযোজন ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। দেখা গিয়াছে যে, চোখকে শ্রান্ত না করিয়া আপনা হইতে উপযোজন-ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া মানুষ প্রায় 25 cm বা 10 ইঞ্চি পর্যন্ত দূরের জিনিস স্পষ্ট দেখিতে পায়। কিন্তু বস্তুকে 25 cm হইতে সরাইয়া চোখের আরো কাছে আনিলে তখন উহাকে দেখিতে চোখের পক্ষে কষ্ট হয়। সেইজন্য খুব কাছের কোন জিনিসকে বেশীক্ষণ দেখিতে চেষ্টা করিলে চোখে ব্যথা বোধ হয়।

13. অনুবীক্ষণ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্র

সরল অনুবীক্ষণ যন্ত্র (Simple microscope):

ছোট জিনিস—যেমন ছোট ছোট অক্ষর ইত্যাদি—যাহা খালি চোখে ভাল দেখা যায় না তাহা স্পষ্ট করিয়া দেখিবার জন্য 'ম্যাগনিফাইং গ্লাস' ব্যবহৃত
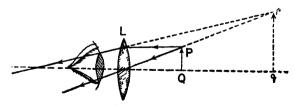
বিবর্ধক লেন্সের কার্যপ্রণালী

হয় তাহা বোধ হয় তোমরা জান। ম্যাগনিফাইং গ্লাসই হইল সরল অনুবীক্ষণ যন্ত্র। ইহা আর কিছুই না—একটি উত্তল লেন্স।

ধর, PQ একটি ক্ষুদ্র বস্তু। ইহাকে সরল অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে বড় করিয়া দেখিতে হইবে। একটি উত্তল লেন্স L এমনভাবে বসানো হইল যে

PQ বস্তু লেন্সের ফোকাস্-দূরত্বের ভিতরে অবস্থিত। চিত্রে যেমন দেখানো হইয়াছে তেমনি লেন্স বস্তুর সোজা, অসদ্‌ ও বৃহত্তর প্রতিবিম্ব *pq* গঠন করিবে। লেন্সের অপর পার্শ্বে চোখ রাখিলে PQ বস্তুর পরিবর্তে বর্ধিত *pq* প্রতিবিম্ব দেখা যাইবে। ম্যাগনিফাইং গ্লাস দেখিতে কিরূপ তাহা সংলগ্ন চিত্র হইতে বুঝিতে পারিবে।

বিবর্ধক কাচ

যৌগিক অণুবীক্ষণ যন্ত্র (Compound microscope) :

বস্তু অত্যন্ত ছোট হইলে ম্যাগনিফাইং গ্লাসের সাহায্যেও ভাল করিয়া দেখা যায় না। সেক্ষেত্রে আরও শক্তিশালী যন্ত্র ব্যবহার করা প্রয়োজন। যৌগিক অণুবীক্ষণ যন্ত্র—যাহাকে সাধারণভাবে অণুবীক্ষণ বলা হয়—সেই ধরনের শক্তিশালী যন্ত্র। এই যন্ত্র কিরূপে ছোট বস্তুর বিবর্ধিত প্রতিবিম্ব গঠন করে তাহা লক্ষ্য কর।

মনে কর, PQ একটি অতি ক্ষুদ্র বস্তু উহাকে L_1 উত্তল লেন্সের ফোকাস-বিন্দু F-এর ঠিক বামদিকে রাখা আছে। এই অবস্থায় L_1 লেন্স বস্তুর সদ্‌, উল্‌টা ও বিবর্ধিত প্রতিবিম্ব গঠন করিবে। P_1Q_1 হইল ঐ প্রতিবিম্ব। এখন আর একটি উত্তল লেন্স L_2 যদি এমন ভাবে বসানো যায় যে P_1Q_1 ঐ লেন্সের ফোকাস দূরত্বের মধ্যে থাকে তবে ঐ লেন্স ম্যাগনিফাইং গ্লাসের
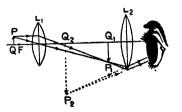
যৌগিক অণুবীক্ষণ যন্ত্রের কার্য প্রণালী

মত কাজ করিয়া অসদ্‌, সোজা ও বিবর্ধিত প্রতিবিম্ব P_2Q_2 গঠন করিবে। কাজেই L_2 লেন্সের পশ্চাতে চোখ রাখিলে চোখ বস্তুর পরিবর্তে ঐ বিবর্ধিত

প্রতিবিম্ব P_2Q_2 দেখিতে পাইবে। এক্ষেত্রে দুইবার বিবর্ধিত হওয়ায় প্রতিবিম্ব বেশ বড় দেখাইবে।

অণুবীক্ষণ যন্ত্র

L_1 লেন্সকে বলা হয় অণুবীক্ষণের অভিলক্ষ্য (objective) এবং L_2 লেন্সকে বলা হয় অভিনেত্র (eye-piece)। উভয়কে একটি সমঅক্ষ নলে আবদ্ধ করা হয় এবং L_2-কে আর একটি ছোট নলে রাখিয়া উহাকে সামনে পিছনে চলাচলের ব্যবস্থা করা হয়। চিত্রে একটি পূর্ণাঙ্গ অণুবীক্ষণ যন্ত্রের চিত্র দেখানো হইল।

দূরবীক্ষণ যন্ত্র (Telescope):

যে সকল বস্তু বহু দূরে অবস্থিত তাহাদের খালি চোখে ভালভাবে দেখা সম্ভব নয়। মনে কর, তুমি একটি নক্ষত্র পর্যবেক্ষণ করিতে চাও। খালি চোখে তাহা পারিবে কি? এই সকল ক্ষেত্রে আমরা যে যন্ত্রের সহায়তা লই তাহার নাম দূরবীক্ষণ যন্ত্র। সাধারণভাবে ইহাকে আমরা বলি দূরবীন। দূরের জিনিসের বর্ধিত প্রতিবিম্ব দূরবীক্ষণ যন্ত্র কর্তৃক কিরূপে তৈয়ারী তাহা সংলগ্ন চিত্র হইতে বুঝিতে পারিবে।

বস্তু হইতে দূরাগত রশ্মিকে আমরা সাধারণত সমান্তরাল বলিয়া গণ্য করি। মনে কর, ঐরূপ একগুচ্ছ সমান্তরাল রশ্মি দূরের বস্তু হইতে আসিয়া L_1 উত্তল লেন্সের উপর পড়িল। এক্ষেত্রে আমরা জানি যে লেন্সের ফোকাস্ তলে একটি ক্ষুদ্র, সদ্ ও উল্টা প্রতিবিম্ব গঠিত হইবে। PQ হইল ঐ প্রতিবিম্ব। এখন আর একটি উত্তল লেন্স L_2 যদি এমনভাবে
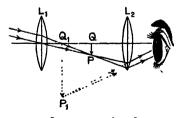
দূরবীক্ষণ যন্ত্রের কার্যপ্রণালী

বসানো যায় যে PQ ঐ লেন্সের ফোকাস্-দূরত্বের মধ্যে অবস্থিত থাকে তবে ঐ লেন্স ম্যাগনিফাইং গ্লাসের মত কাজ করিয়া PQ-এর একটি

বিবর্ধিত প্রতিবিম্ব P_1Q_1 গঠন করিবে। চোখ ঐ প্রতিবিম্ব দেখিতে পাইবে।

অণুবীক্ষণ যন্ত্রের মত L_1 লেন্সকে বলা হইবে দূরবীক্ষণের অভিলক্ষ্য এবং L_2 লেন্সকে বলা হইবে অভিনেত্র। তবে ণ যন্ত্রের অভিলক্ষ্য অণুবীক্ষণ যন্ত্রের অভিলক্ষ্য অপেক্ষা আকারে বড় এবং বৃহত্তর ফোকাস্-দৈর্ঘ্য সম্পন্ন। চিত্রে একটি পূর্ণাঙ্গ দূরবীক্ষণ যন্ত্র দেখানো হইল।

দূরবীক্ষণ যন্ত্র
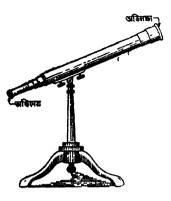
14. প্রিজম্ [Prism] দ্বারা আলোকের প্রতিসরণ

প্রিজম্ একটি কাচের ত্রিভুজাকৃতি ফলক। ইহার সবসমেত পাঁচটি তল আছে। তলগুলি পরস্পরের সহিত আনত (inclined) এবং ইহাদের প্রান্তরেখাগুলি (edges) সব পরস্পর সমান্তরাল। সংলগ্ন চিত্রে একটি প্রিজমের ছবি দেখানো হইয়াছে। EH প্রিজমের একটি প্রান্তরেখা। ABC প্রিজমের একটি ছেদ (section)। ইহা একটি ত্রিভুজ। ইহাকে প্রিজমের প্রধান ছেদ (principal section) বলা হয়। ইহা প্রিজমের তিনটি প্রান্ত রেখার সহিত লম্বভাবে অবস্থান করে।
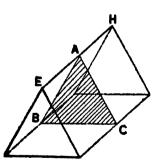
প্রিজম্; ABC প্রিজমের প্রধান ছেদ

আমরা যখন প্রিজমের দ্বারা আলোকের প্রতিসরণ আলোচনা করি তখন সর্বদা মনে করি যে রশ্মি প্রিজমের প্রধান ছেদের তলে (plane) অবস্থান করিতেছে। ∠BAC-কে প্রিজমের প্রতিসারক (refracting) কোণ ও BC-কে ভূমি (base) বলা হয়।

ধরা যাউক, ABC প্রিজমের একটি প্রধান ছেদ। PQ একটি রশ্মি AB

তলে Q বিন্দুতে আপতিত হইল [চিত্র দেখ]। এইবার আলোকরশ্মি কাচ-মাধ্যমে প্রবেশ করিলে প্রতিসৃত হইবে এবং QS প্রতিসৃত রশ্মি AB তলের উপর অঙ্কিত অভিলম্বের দিকে সরিয়া যাইবে। আলোক-রশ্মি AC তলে S বিন্দুতে আপতিত হইয়া পুনরায় বায়ু মাধ্যমে নির্গত হইবে। ইহার ফলে রশ্মি পুনরায় প্রতিসৃত হইবে এবং AC তলে অঙ্কিত অভিলম্ব হইতে দূরে সরিয়া গিয়া ST সরল রেখায় নির্গত হইবে। সুতরাং, PQST হইল আলোক-রশ্মির সমগ্র পথ এবং ইহা স্পষ্টই বোঝা যায় যে প্রিজমের ভিতর দিয়া যাইবার ফলে রশ্মি প্রিজমের ভূমির (BC) দিকে বাঁকিয়া যায়—অর্থাৎ রশ্মিটির পথের চ্যুতি (deviation) ঘটে।
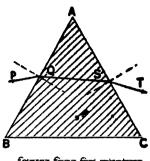
প্রিজমের ভিতর দিয়া আলোকের প্রতিসরণ

15. আলোকের বিচ্ছুরণ [Dispersion of light]

1666 খ্রীষ্টাব্দে বিখ্যাত বিজ্ঞানী সার আইজাক্ নিউটন আলোকের বিচ্ছুরণ আবিষ্কার করেন। তিনি দেখিতে পান যে সূর্যরশ্মি (সাদা আলো) কাচের প্রিজমেব ভিতর দিয়া গেলে সাতটি বর্ণের রশ্মিতে বিভক্ত হইয়া পড়ে।

পরীক্ষা : একটি অস্বচ্ছ পর্দায় H একটি সূক্ষ্ম ছিদ্র (পরপৃষ্ঠার চিত্র দেখ)। ছিদ্র দিয়া সাদা আলোকরশ্মি একটি প্রিজম্ P-র উপর আপতিত হইল। আলোক-রশ্মি প্রিজম্ হইতে নির্গত হইয়া যখন একটি পর্দা S-এর উপর পড়িবে তখন পর্দায় একটি বিভিন্ন বর্ণবিশিষ্ট পটি (band) দেখিতে পাওয়া যাইবে।

উক্ত বর্ণবিশিষ্ট-পটিকে পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে যে, উহাতে **সাতটি বর্ণ** আছে এবং উহার একপ্রান্তে লাল এবং অপরপ্রান্তে বেগুনী। অন্যান্য বর্ণগুলি হইতেছে নারাঙ্গ (orange), হল্‌দে (yellow), সবুজ (green), নীল (blue), গাঢ়নীল (indigo)। এই বর্ণগুলির ক্রমিক অবস্থায় ইংরাজি 'VIBGYOR' (প্রত্যেক বর্ণের আদ্যাক্ষর লইয়া গঠিত) কথা হইতে পাওয়া যাইবে।

এই বর্ণবিশিষ্ট পটিকে **বর্ণালী** (spectrum) বলা হয় এবং প্রিজমের ভিতর দিয়া যাইবার ফলে সাদা রং-এর আলো বিশ্লিষ্ট হইয়া সাতটি বর্ণের আলোতে বিভক্ত হইবার প্রণালীকে বলা হয় **আলোকের বিচ্ছুরণ**।
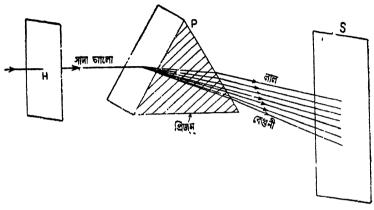
আলোকের বিচ্ছুরণ

বর্ণালী লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, বিভিন্ন বর্ণের চ্যুতি (deviation) বিভিন্ন। বেগুনী বর্ণের চ্যুতি সর্বাপেক্ষা বেশী এবং লাল বর্ণের চ্যুতি সর্বাপেক্ষা কম। ইহাতে অনেক সময় বলা যায় যে, বিভিন্ন বর্ণের **প্রতিসরণীয়তা** (refrangibility) বিভিন্ন। হল্‌দে বর্ণের চ্যুতি লাল ও বেগুনী বর্ণের চ্যুতির মাঝামাঝি বলিয়া হল্‌দে বর্ণের আলো-কে বলা হয় মধ্যবর্তী (mean) রশ্মি।

এই ঘটনা হইতে নিউটনের মনে সন্দেহ হয় যে, সাদা আলো কোন রং-এর আলো নয়, সাতটি রং-এর আলো মিশ্রিত হইয়া সাদা আলো সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ সাদা আলো যৌগিক। এই সন্দেহ নিরসনের জন্য নিউটন সাতটি রং-এর আলোর একটিকে বাছিয়া লন এবং উহাকে পুনরায় একটি প্রিজমের ভিতর দিয়া পাঠান। তিনি দেখিতে পান যে, ঐ রং-এর আর কোন বিশ্লেষণ হইল না—উহা যেমন তেমনই রহিল। অর্থাৎ, বর্ণালীর প্রত্যেকটি বর্ণ মৌলিক (monochromatic)।

সাদা আলো যে প্রকৃতই যৌগিক তাহার চূড়ান্ত মীমাংসা করিবার জন্য বর্ণালীর আলোকগুলি পুনর্যোজনা করিয়া সাদা আলো সৃষ্টির প্রকৃষ্ট উপায়। পর পৃষ্ঠায় বর্ণিত উপায়ে এই পুনর্যোজনা করা যায়।

P এবং Q দুইটি একই ধরনের ও একই পদার্থে গঠিত প্রিজম্ পাশাপাশি উল্টা করিয়া বসানো। একটি সূক্ষ্ম ছিদ্র O হইতে সাদা আলোকরশ্মি P-প্রিজমের উপর পড়িয়া বর্ণালীতে বিচ্ছুরিত হইবে, কিন্তু বর্ণালীর বিভিন্ন রশ্মি Q প্রিজমের ভিতর দিয়া যাইবার ফলে পুনর্যোজিত হইবে এবং নির্গত রশ্মি একটা পর্দা S-এর উপর পড়িলে সাদা রংয়ের আলোরূপে দেখা যাইবে।
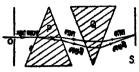
বর্ণালীর আলোকগুলির পুনর্যোজনা

অনুশীলনী

1. আলোক ও দৃষ্টির মধ্যে সম্পর্ক কি? আলো এক প্রকার শক্তি, ইহা কিরূপে বুঝিবে? আলো কি দেখা যায়?

2. উপযুক্ত পরীক্ষা দ্বারা বুঝাইয়া দাও যে, আলো সরল রেখায় চলাচল করে। সূচী-ছিদ্র ক্যামেরার বর্ণনা ও কার্যপ্রণালী ব্যাখ্যা কর। সূচী-ছিদ্রের আকার বড় করিলে কি হয়?

3. ছায়া কিরূপে হয়? ছায়া দ্বারা আলোর কি বিশেষত্ব জানা যায়?

4. প্রচ্ছায়া ও উপচ্ছায়ার ভিতর পার্থক্য কি? উহাদের উৎপত্তি কিরূপে হয়? পাখি যখন নীচু দিয়া উড়ে তখন তাহার ছায়া মাটিতে পড়ে কিন্তু উপরে উঠিলে আর ছায়া দেখা যায় না; কেন?

5. গ্রহণ কাহাকে বলে? সুন্দর চিত্র আঁকিয়া চন্দ্র ও সূর্যের গ্রহণ ব্যাখ্যা কর। সূর্যের বলয়-গ্রহণ কখন হয়? চন্দ্রের বলয়-গ্রহণ হয় কি?

6. আলোকের প্রতিফলন কাহাকে বলে? প্রতিফলনের নিয়ম কি? প্রতিবিম্ব বলিতে কি বোঝ? কয় প্রকার প্রতিবিম্ব আছে? উহাদের ভিতর পার্থক্য কি?

7. উত্তল দর্পণ কাহাকে বলে? উহার ফোকাস্-দূরত্বের সংজ্ঞা লিখ। উত্তল দর্পণ কিরূপে প্রতিবিম্ব গঠন করে?

8. অবতল দর্পণ কাহাকে বলে? অবতল দর্পণ কিরূপে বিভিন্ন প্রকারের প্রতিবিম্ব উৎপন্ন করে তাহা ছবি আঁকিয়া বুঝাইয়া দাও।

9. আলোকের প্রতিসরণ কাহাকে বলে? নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে কিরূপে আলোকের প্রতিসরণ হয় তাহা ছবি আঁকিয়া বুঝাইয়া দাও:—

(ক) বায়ু হইতে কাচে, (খ) জল হইতে বায়ুতে।

10. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির জবাব দাও:—

(i) একটি দণ্ডকে কাত করিয়া আংশিক জলে ডুবাইলে বাঁকা দেখায় কেন?

(ii) একটি জলপূর্ণ পাত্র একটু অগভীর মনে হয় কেন?

11. উত্তল লেন্স কাহাকে বলে? উহার ফোকাস্ ও ফোকাস্-দূরত্বের সংজ্ঞা লিখ। লেন্সের ভিতর দিয়া আলোর প্রতিফলন হয়, না প্রতিসরণ হয়?

12. পরিষ্কার ছবি আঁকিয়া বুঝাইয়া দাও, কিরূপে উত্তল লেন্স প্রতিবিম্ব গঠন করে। এই প্রতিবিম্ব সদ্ কি অসদ্?

13. অবতল লেন্স কিরূপে প্রতিবিম্ব গঠন করে? এই প্রতিবিম্ব সদ্ কি অসদ্?

14. মানুষের চোখের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

15. অণুবীক্ষণ যন্ত্র কাহাকে বলে? ইহা কিরূপে ছোট বস্তুর বিবর্ধিত প্রতিবিম্ব গঠন করে?

16. দূরবীক্ষণ যন্ত্র দিয়া আমরা কি কাজ করি? ইহার কার্যপ্রণালী ব্যাখ্যা কর।

17. আলোকের বিচ্ছুরণ বলিতে কি বোঝ? বর্ণালী কাহাকে বলে? বর্ণালীর বিভিন্ন বর্ণগুলির ক্রমিক পর্যায়ের নাম বল।

Objective Type প্রশ্ন

(ক) Alternative response type :

(i) *Yes or No type :—*

(a) আলোর গতি কি সরল-রেখা অবলম্বন করিয়া হয়? —

(b) বিস্তৃত আলোক-প্রভব দ্বারা ক্ষুদ্রতর অস্বচ্ছ বস্তুর যে-ছায়া উৎপন্ন হয় তাহার সর্বত্র কি সমান অন্ধকার? —

(c) এক মাধ্যম হইতে অন্য মাধ্যমে যাইবার সময় আলোকরশ্মি কি গতিপথ পরিবর্তন করে? —

(d) যে-কোন রশ্মি কাচের ভিতর দিয়া গেলেই কি বিভিন্ন বর্ণের রশ্মিতে বিভক্ত হইবে? —

(e) আলোকের গতিবেগ কি শব্দের গতিবেগ অপেক্ষা বেশী? —

(ii) *True or False type :—*

(a) আলো যে সরলরেখায় চলে ছায়া তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। —

(b) অমাবস্যায় যখন চন্দ্র পৃথিবী ও সূর্যের মাঝখানে আসে তখন চন্দ্রগ্রহণ হয়।

(c) প্রতিফলনের ফলে আপতিত রশ্মি, প্রতিফলিত রশ্মি ও আপতন বিন্দু দিয়া প্রতিফলকের উপর অঙ্কিত অভিলম্ব একই সমতলে অবস্থান করে না। —

(d) আলোকরশ্মি যখন কম ঘন মাধ্যম হইতে বেশী ঘন মাধ্যমে প্রতিসৃত হয়, তখন প্রতিসৃত রশ্মি অভিলম্বের দিকে বাঁকিয়া যায়। —

(e) উত্তল লেন্স সদ্ ও অসদ উভয় প্রকার প্রতিবিম্ব সৃষ্টি করিতে পারে। —

(খ) Recall type :—

(i) তাপ, বিদ্যুৎ প্রভৃতির ন্যায় আলোকও একপ্রকার—। —

(ii) আপতন কোণ সর্বদা প্রতিফলন কোণের—হইবে। —

(iii) প্রিজমের ভিতর দিয়া যাইবার ফলে সাদা রংয়ের আলো বিশ্লিষ্ট হইয়া সাতটি বর্ণের আলোতে বিভক্ত হইবার প্রণালীকে—বলা হয়। —

(iv) লেন্সের আলোকবিন্দু হইতে ফোকাস পর্যন্ত দৈর্ঘ্যকে—বলে। —

(গ) Completion type :—

(i) যখন কোন—(a) হইতে আগত রশ্মিগুচ্ছ—(b) বা—(c) হইয়া অন্য কোন বিন্দুতে—(d) হয় বা অন্য কোন বিন্দু হইতে—(e) হইতেছে বলিয়া মনে হয় তখন ঐ দ্বিতীয় বিন্দুকে প্রথম বিন্দুপ্রভবের—(f) বলা হয়।

—(a)
—(b)
—(c)
—(d)
—(e)
—(f)

(ii) আলোকরশ্মির নিয়মিত প্রতিফলনের সময় আপতন—(a) সর্বদা (b)—কোণের (c)—হয়।

—(a)
—(b)

(ঘ) Multiple choice type :—

(i) প্রিজমের ভিতর প্রতিসৃত হইবার ফলে সাদা আলো বিশ্লিষ্ট হইয়া সাতটি বর্ণের আলোতে বিভক্ত হইবার প্রণালীকে কি বলে?—প্রতিসরণ, বিচ্ছুরণ, প্রতিফলন।

(ii) অবতল লেন্স সর্বদা কি ধরনের প্রতিবিম্ব তৈয়ারী করে?—সদ্, অসদ্, উলটা, সোজা।

(iii) বর্ণালীর কোন্ রশ্মির প্রতিসরণীয়তা সর্বাপেক্ষা বেশী?—লাল, বেগুনী, নীল, হলদে।

(iv) চন্দ্রগ্রহণের সময় কোন্ বস্তু আলোকরশ্মিকে বাধা দিয়া ছায়ার সৃষ্টি করে?—চন্দ্র, সূর্য, পৃথিবী।

তাপ বিজ্ঞান
[Heat]

1. তাপ

তাপ সম্বন্ধে আমাদের সকলেরই কিছু-না-কিছু ধারণা আছে। আগুন জ্বালাইলে তাপ পাওয়া যায়, দিনের বেলা সূর্য উঠিলেই তাপ অনুভব করি, শীতকাল অপেক্ষা গ্রীষ্মকালে তাপ বেশী থাকে, এ-সব কথা আমাদের সকলেরই জানা আছে। কোন কঠিন পদার্থের মত তাপের কোন আকার বা আয়তন না থাকায় কিংবা গন্ধ, রং প্রভৃতি দ্বারা তাপকে বুঝিবার উপায় না থাকায়, তাপকে কোন বস্তুর মাধ্যমে বুঝিতে হয়। কোন বস্তু গরম হইয়া উঠিলেই আমরা ঐ বস্তুতে তাপের অস্তিত্ব বুঝিতে পারি। আমাদের সাধারণ অভিজ্ঞতা হইতেছে এই যে, কোন বস্তু তাপ গ্রহণ করিলে গরম হইবে এবং তাপ ছাড়িয়া দিলে ঠাণ্ডা হইবে। কাজেই **তাপকে আমরা এমন এক জিনিস বলিয়া ধরিয়া লইতে পারি যাহার গ্রহণে বস্তু গরম হইয়া উঠে এবং বর্জনে ঠাণ্ডা হইয়া যায়।**

2. তাপের উৎস [Sources of heat]

পৃথিবীতে সকল প্রকার তাপশক্তির উৎস হইতেছে সূর্য। সূর্য-দেহ হইতে যে-তাপ বিকীর্ণ হয় তাহা পরোক্ষভাবে অন্য প্রকারে সঞ্চিত হয় বলিয়া সূর্য ছাড়া তড়িৎশক্তি, রাসায়নিক শক্তি প্রভৃতি বিভিন্ন উৎস হইতেও আমরা তাপ পাইয়া থাকি। নিম্নে তাপের বিভিন্ন উৎস সম্বন্ধে সংক্ষেপে বলা হইল।

(1) **সূর্য:** সূর্য হইতে প্রতিনিয়ত বিপুল তাপশক্তি মহাশূন্যে নির্গত হইতেছে। পৃথিবী এই তাপশক্তির সামান্য অংশ লাভ করে। তবুও এই তাপশক্তিই সকল শক্তির মূল। সূর্য হইতে পৃথিবীতে তাপ আসে বলিয়া জীবজন্তু, মানুষ, গাছপালা প্রভৃতি বাঁচিয়া আছে। যদি পৃথিবী সূর্যকিরণ না পাইত তাহা হইলে কোন প্রাণীই পৃথিবীর বুকে সজীব থাকিত না।

যদিও পৃথিবী সূর্য হইতে প্রচুর পরিমাণ তাপশক্তি লাভ করে তথাপি ইহাকে সরাসরি কাজে লাগানো ব্যাপকভাবে এখনও সম্ভব হয় নাই। তোমরা

হয়তো শুনিয়াছ যে, সূর্যরশ্মির তাপকে কাজে লাগাইয়া 'Solar Cooker' নামে রন্ধন করিবার একপ্রকার উনান উদ্ভাবন করা হইয়াছে। সৌরশক্তিকে ঘরবাড়ী গরম রাখিবার জন্য, সেচের কাজে লাগানো, ছোট যন্ত্রপাতি চালানো, বেতার যন্ত্র চালানো প্রভৃতি কাজে প্রয়োগ করিবার জন্য বিজ্ঞানীরা চেষ্টা করিতেছেন।

(2) **যান্ত্রিক শক্তি :** তোমরা দুই হাতের তালু কিছুক্ষণ ধরিয়া ঘষিলে দেখিবে উহা গরম হইয়া উঠিবে। দেশলাইয়ের কাঠি দেশলাইয়ের গায়ে লাগানো বারুদে ঘষিলে তাপ উৎপন্ন হয় এবং তাহাতে কাঠিটি জ্বলিয়া উঠে। ছুরি, কাঁচি প্রভৃতি শান দিবার সময় হয়তো লক্ষ্য করিয়াছ যে, ঘর্ষণের ফলে আগুনের ফুল্‌কি উঠিতেছে। তোমরা যাহারা কলিকাতায় থাক তাহারা হয়তো

তাপের বিভিন্ন উৎস

লক্ষ্য করিয়াছ যে ট্রাম চলিবার সময় তারের সহিত ট্রামের ট্রলি-দণ্ডের ঘর্ষণে অনেক সময় আগুনের ফুল্‌কি উঠে। ইতিহাসের বইয়ে পড়িয়াছ যে, আদিকালে লোকেরা পাথরে পাথরে ঘর্ষণ করিয়া আগুন জ্বালাইত। ঘর্ষণে যে যান্ত্রিক শক্তি (mechanical energy) ব্যয় হয় এবং তাহাতে যে তাপ সৃষ্টি হয় তাহার এইরূপ অসংখ্য উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে।

(3) **রাসায়নিক শক্তি :** কয়লা পোড়াইলে তাপের উদ্ভব হয়। এ-স্থলে কয়লাতে সঞ্চিত রাসায়নিক শক্তি তাপে পরিবর্তিত হয়। এইরূপ তেল, পেট্রল

কাঠ প্রভৃতি জ্বালানী দ্রব্যে যে রাসায়নিক শক্তি বর্তমান তাহা তাপশক্তিতে আত্মপ্রকাশ করিতে পারে।

আমরা যে-খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করি তাহা শরীরের ভিতর নানাপ্রকার রাসায়নিক ক্রিয়া করে বলিয়াই আমাদের দেহে তাপ সৃষ্টি হয়। এইরূপে নানাপ্রকার রাসায়নিক ক্রিয়া তাপের উৎস হিসাবে কার্য করে।

(4) **তড়িৎ শক্তি:** বৈদ্যুতিক বাতিতে তড়িৎ-প্রবাহ পাঠাইলে বাতি আলো দেয় এবং সঙ্গে সঙ্গে তাপও প্রদান করে। এস্থলে তড়িৎ-শক্তির বিনিময়ে তাপের সৃষ্টি হইতেছে।

তড়িৎ-শক্তিকে তাপের উৎস হিসাবে ব্যবহার করিয়া ইস্তিরী, স্টোভ, হিটার প্রভৃতি নানাপ্রকার প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি তৈয়ারী করা হয়।

3. তাপের প্রভাব

পদার্থে তাপ প্রয়োগ করিলে উহার প্রসারণ হয়। আমরা জানি পদার্থ তিন রকম অবস্থায় থাকিতে পারে। যথা:—কঠিন, তরল ও বায়বীয়। তাপ প্রয়োগে উহাদের প্রত্যেকেরই প্রসারণ হয়। সুতরাং তাপের প্রত্যক্ষ ফল হইতেছে পদার্থের প্রসারণ। নিম্নে ইহাদের সম্বন্ধে আলোচনা করা হইল।

4. কঠিন পদার্থের প্রসারণ

(1) **দণ্ড ও গজ পরীক্ষা:**

A একটি কাঠের হাতল সহ লোহার দণ্ড। B একটি ধাতব গজ। A দণ্ডটি ঠাণ্ডা অবস্থায় B-এর ফাঁকের মধ্যে ঠিক ঠিক আঁটিয়া যায় [চিত্র দেখ]। এখন A দণ্ডকে তাপ প্রদান করিয়া উত্তপ্ত করিলে দেখা যাইবে যে, ইহা B-এর ফাঁকের মধ্যে আর বসিতেছে না। আবার ঠাণ্ডা করিলে ঠিক ঠিক ফাঁকের মধ্যে বসিবে। সুতরাং ইহা হইতে প্রমাণ হয় যে তাপ প্রদানের ফলে A দণ্ডটি দৈর্ঘ্যের প্রসারণ হইয়াছে।
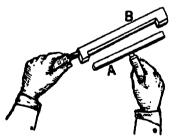
দণ্ডের দৈর্ঘ্য-প্রসারণ

(2) **বল ও আংটা পরীক্ষা :**

A একটি ফাঁপা পিতলের গোলাকার বল। ইহা ঠাণ্ডা অবস্থায় B-আংটার ভিতর দিয়া ঠিক গলিয়া যাইতে পারে। এখন বলটিকে তাপ প্রদান করিয়া উত্তপ্ত করিলে দেখা যাইবে যে, ইহা আর আংটার ভিতর দিয়া গলিয়া যাইতেছে না। আবার বলটিকে পূর্বের ঠাণ্ডা অবস্থায় আনিলে পুনরায় আংটা দিয়া গলিয়া যাইবে। সুতরাং এই পরীক্ষা হইতে বুঝা যায় যে, তাপ পাইয়া বলটির আয়তনের প্রসারণ হইয়াছে।

কঠিন পদার্থের আয়তনের প্রসারণ

আয়তন প্রসারণের ফলে বলটির ক্ষেত্রফলের প্রসারণ হয়। অতএব ইহা বলা যাইতে পাবে যে তাপ প্রয়োগে কঠিন পদার্থের ক্ষেত্র প্রসারণ ঘটে।
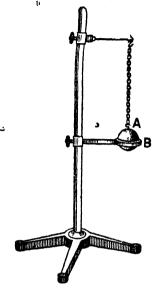
5. কঠিন পদার্থের প্রসারণের ব্যবহারিক প্রয়োগ

ইঞ্জিনিয়ারিং ও অন্যান্য কারিগরী বিদ্যায় কঠিন পদার্থের প্রসারণের বহু ব্যবহারিক প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের দৈনন্দিন জীবনেও কঠিন পদার্থের প্রসারণ ও সংকোচনকে আমরা নানারূপভাবে কাজে লাগাই। কোন কোন ক্ষেত্রে ইহা আমাদের কাজের সুবিধা করে, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে অসুবিধার সৃষ্টি করে। নিম্নে ইহার সুবিধা ও অসুবিধার কথা আলোচনা করা হইল।

সুবিধার কারণ : (ক) রিভেট করিয়া দুইটি ধাতব প্লেট দৃঢ়ভাবে আটকানোর পদ্ধতির কথা তোমাদের অনেকের হয়তো জানা আছে। যে দুইটি প্লেট জুড়িতে হইবে তাহাদের পরপর রাখিয়া একটি ফুটা করা হয় এবং একটি রিভেট গরম করিয়া ঐ ফুটার ভিতর ঢুকানো হয়। পরে হাতুড়ি

দিয়া পিটাইয়া রিভেটের মাথা প্লেটের সঙ্গে মিশাইয়া দেওয়া হয়। রিভেট যখন ঠাণ্ডা হয় তখন উহার দৈর্ঘ্যের সংকোচন হয় এবং তাহার ফলে প্লেট দুইটিকে দৃঢ়ভাবে আটকাইয়া রাখে।

(খ) লৌহদণ্ডের প্রসারণ ও সংকোচনকে প্রয়োগ করিয়া যে-সমস্ত বাড়ির দেওয়াল বাহিরের দিকে বাঁকিয়া গিয়াছে তাহা সোজা করা হয়। দেয়ালের মধ্য দিয়া কতকগুলি লৌহদণ্ড ঢুকাইয়া পাত ও স্ক্রুর সাহায্যে শক্ত করিয়া আটকাইয়া দেওয়া হয়। অতঃপর দণ্ডগুলিকে উষ্ণ করিয়া স্ক্রু আরও জোরে আঁটিয়া দেওয়া হয়। দণ্ডগুলি পরে যখন ঠাণ্ডা হয় তখন দৈর্ঘ্যে সংকুচিত হয় এবং তাহার ফলে যে প্রচণ্ড বলের উদ্ভব হয় তাহা দেওয়ালকে টানিয়া সোজা করে।

(গ) গরুর গাড়ির চাকায় যে লোহার বেড পরানো থাকে তাহা তোমরা দেখিয়াছ। ঐ বেড় পড়াইবার সময় লোহার প্রসারণ ও সংকোচনকে প্রয়োগ করা হয়। বেড়ের ব্যাস চাকার ব্যাস অপেক্ষা কিছু ছোট থাকে। বেড়কে উষ্ণ করিলে প্রসারিত হইয়া চাকার গায়ে ঠিক ঠিক আঁটিয়া যায়। পরে জল ঢালিয়া বেডকে ঠাণ্ডা করিলে উহার সংকোচন হয় এবং চাকাব গায়ে দৃঢ়ভাবে আটকাইয়া যায়।

(ঘ) শিশিতে কাচের ছিপি খুব জোরে আঁটিয়া গেলে শিশির মুখ একটু গরম করিলেই ছিপি খুলিয়া আসে। কারণ, মুখ উত্তপ্ত হইয়া প্রসারিত হয় কিন্তু কাচ তাপ ভাল পরিবহণ করে না বলিয়া ছিপি উত্তপ্ত হইতে পারে না এবং উহার প্রসারণও হয় না। সুতরাং ছিপি আলগা হইয়া যায়।
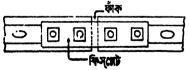
অসুবিধার কারণঃ (ক) রেল লাইন পাতিবার সময় দুই লাইনের জোড়ের মুখে কিছু ফাঁক রাখিতে হয়। কারণ, গাড়ির ঘর্ষণে অথবা রৌদ্রের উত্তাপে লাইনের লোহা উত্তপ্ত হইলে দৈর্ঘ্যের প্রসারণ হয় এবং তাহার জন্য ঐ জায়গা রাখা হয়। মুখে মুখে লাগাইয়া রাখিলে প্রসারণ-জনিত বলের দ্বারা লাইন বাঁকিয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকে।

রেল লাইনের জোড়ের মুখে ফাঁক থাকে

লাইন দুইটিকে একটি লোহার পাত ও চারিটি বোল্টের সাহায্যে সংযুক্ত রাখা হয়। এই পাতটিকে ফিশপ্লেট বলে (চিত্র দ্রষ্টব্য)।

কিন্তু ট্রাম লাইন পাতিবার সময় ঐরূপ ফাঁক রাখা হয় না। বিদ্যুৎপ্রবাহ চালু রাখার জন্য লাইনগুলি মুখে মুখে জোড়া লাগাইয়া রাখা হয়। লাইনগুলি মাটির ভিতর গাঁথা থাকে এবং গ্রানাইট পাথর ও কংক্রীট দ্বারা বেষ্টিত থাকে বলিয়া তাপমাত্রার পার্থক্য খুব কম হয় এবং সেই কারণে বাঁকিতে পারে না।

(খ) যদি মোটা কাচের গ্লাসে গরম জল ঢালা যায় তবে গ্লাসটি ফাটিয়া যায়। এইরূপ হইবার কারণ এই যে, কাচ খুব ভাল তাপ পরিবাহী নহে। ফলে গ্লাসের অভ্যন্তর উত্তপ্ত হইয়া প্রসারিত হয় কিন্তু বাহিরের অংশ সমপরিমাণ তাপ না পাওয়ায় কম প্রসারিত হয়। একই পাত্রের বাহির ও অভ্যন্তরের এই অসম প্রসারণের ফলে যে-বলের উদ্ভব হয় তাহার জন্য পাত্রটি ফাটিয়া যায়। এই অসুবিধা মনে রাখিয়া কাচের পাত্র বা চিমনি প্রভৃতি কাচের জিনিস তৈয়ারী করার সময় বিশেষ যত্ন লইতে হয়।

(গ) কোন ধাতুনির্মিত স্কেল দূরত্ব মাপিবার জন্য ব্যবহার করিলে প্রসারণ-জনিত ত্রুটির প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হয়। যে-উষ্ণতায় স্কেল তৈয়ারী করা হয় শুধু সেই উষ্ণতাতেই ইহা ত্রুটিহীন। উষ্ণতা বৃদ্ধি বা হ্রাস পাইলে প্রত্যেক দাগের প্রসারণ বা সংকোচন হয়। ফলে ঐ স্কেল দ্বারা দূরত্ব নির্ভুল ভাবে মাপা চলে না। উহার প্রয়োজনীয় সংশোধন করিয়া লইতে হয়।

6. তরলের প্রসারণ

তাপ প্রয়োগে কঠিন পদার্থের মত তরল পদার্থেরও প্রসারণ হয়। কিন্তু তরলের প্রসারণ আলোচনা করিতে গেলে কয়েকটি কথা মনে রাখিতে হইবে। প্রথমত, তরলের নিজস্ব কোন আকার নাই। তরল পাত্রের আকার ধারণ করে। সুতরাং ইহার দৈর্ঘ্য বা ক্ষেত্র প্রসারণ সম্ভব নয়। **তরলের মাত্র আয়তন প্রসারণ হয়**। দ্বিতীয়ত, তরলের প্রসারণ লক্ষ্য করিতে গেলে তরলকে কোন পাত্রে রাখিয়া উত্তপ্ত করিতে হইবে। কিন্তু তাপ প্রয়োগে তরলের সঙ্গে পাত্রেরও প্রসারণ হইবে। সুতরাং **পাত্রের প্রসারণের পরিপ্রেক্ষিতে তরলের প্রসারণ বিচার করিতে হইবে**। পর পৃষ্ঠায় বর্ণিত সহজ পরীক্ষা দ্বারা তরলের প্রসারণ দেখানো যাইতে পারে।

পরীক্ষা : A একটি কাচের ফ্লাস্ক। ইহার গলা সরু ও লম্বা। ফ্লাস্কের ছিপি দিয়া একটি সরু কাচ-নল ঢুকানো আছে। একটি স্কেল B এই নলের সঙ্গে সংযুক্ত। ফ্লাস্কটি রঙীন জলে পূর্ণ কর এবং মনে কর, জলের তল O পর্যন্ত পৌঁছিল। এই ফ্লাস্কটি গরম জলে পূর্ণ অপর একটি পাত্রে বসাইলে দেখা যাইবে যে জল P-দাগ পর্যন্ত নামিয়া আসিল। পরে আস্তে আস্তে জলের তল Q দাগ পর্যন্ত পৌঁছিল। এইরূপ হইবার কারণ কি?

তরলের প্রসারণ দেখাইবার পরীক্ষা

গরম জলে ফ্লাস্ক বসাইলে প্রথমে কাচ উত্তপ্ত হইয়া প্রসারিত হয়। কিন্তু কাচ ভাল তাপ পরিবাহী নয় বলিয়া ফ্লাস্কের ভিতরস্থ জল তখনই তাপ পায় না। সুতরাং কাচের প্রসারণের ফলে যে-আয়তনের বৃদ্ধি হয় তাহা জল অধিকার করায় জলের তল খানিকটা নামিয়া P-দাগ পযন্ত পৌঁছায়। কিন্তু পরে যখন জল তাপ পায় তখন উহার আয়তনের প্রসারণ হয়। তরলের আয়তন প্রসারণ কঠিন পদার্থ (এখানে কাচ) অপেক্ষা বেশী বলিয়া জল আস্তে আস্তে O দাগ ছাড়াইয়া Q দাগ পর্যন্ত পৌঁছায়।

সুতরাং, জলের আয়তন প্রসারণ প্রকৃতপক্ষে P-দাগ হইতে Q-দাগ পযন্ত এবং কাচের আয়তন প্রসারণ O হইতে P-দাগ পর্যন্ত হইল। যদিও কাচ তাপের সুপরিবাহী নয় তবুও ফ্লাস্কের ভিতরের জলের তাপ পাইতে বিশেষ দেরী হয় না এবং কঠিন পদার্থের আয়তন প্রসারণ খুব কম বলিয়া আমরা চোখে তরলের প্রসারণ O হইতে Q-দাগ পর্যন্ত দেখি।

উপরোক্ত কারণে O হইতে Q পর্যন্ত আয়তনকে বলা হয় তরলের আয়তনের **আপাত** (apparent) প্রসারণ এবং P হইতে Q পযন্ত আয়তনকে বলা হয় তরলের আয়তনের **প্রকৃত** (real) প্রসারণ।

যেহেতু ফ্লাস্কের গলা সমব্যাসযুক্ত নলে তৈয়ারী, সুতরাং OP, PQ এবং OQ আয়তনগুলি উহাদের দৈর্ঘ্যের সমানুপাতিক। চিত্র হইতে বোঝা যায় যে $PQ = OP + OQ$

অর্থাৎ, **তরলের প্রকৃত প্রসারণ**

= তরলের আপাত প্রসারণ + পাত্রের প্রসারণ।

7. গ্যাসের প্রসারণ

তাপ প্রয়োগে গ্যাসের প্রসারণ কঠিন ও তরল অপেক্ষা অনেক বেশী হয়। কয়েকটি সাধারণ ঘটনা হইতে গ্যাসের প্রসারশীলতা সম্বন্ধে তোমাদের ধারণা পরিষ্কার হইবে।

একটি বেলুনে সামান্য কিছু হাওয়া ভরতি করিয়া মুখ শক্ত করিয়া আটকাও। এইবার বেলুনটিকে একটু গরম কর। উনানের পাশে অথবা রৌদ্রে ধরিতে পার। দেখিবে বেলুনটি বেশ ফুলিয়া উঠিয়াছে। বেলুনের ভিতরকার বায়ু উত্তাপ পাইয়া আয়তনে প্রসারিত হয় এবং বেলুনের উপর চাপ দেয়। ফলে বেলুন ফুলিয়া ওঠে। বেলুনটিকে এখন ঠাণ্ডা কর। দেখিবে উহা আবার পূর্বের ন্যায় সঙ্কুচিত হইয়া গিয়াছে।

একটি কাচের বোতলের মুখ কর্ক দিয়া আটকাইয়া উনানের পাশে রাখ। কিছুক্ষণ পরে দেখিবে বোমার মত শব্দ করিয়া কর্ক বোতলের মুখ হইতে দূরে ছিট্‌কাইয়া গিয়াছে। কেন এরূপ হইল জান কি? উনানের উত্তাপে বোতলের ভিতরকার বায়ু আয়তনে প্রসারিত হইতে চায়, কিন্তু কাচ এই প্রসারণকে বাধা দেয়। ইহাতে বায়ুর চাপ খুব বাড়িয়া যায়। এই বর্ধিত বায়ুর চাপ কর্ককে সজোরে ঠেলিয়া বাহির করিয়া দেয়।

দুধ উথলাইয়া উঠিবার কথা তোমরা জান। আধ কড়া দুধ জ্বাল দিলে উহা উথলাইয়া কড়া ভরতি করিয়া ফেলে। কেন এরূপ হয়? দুধের ভিতর কিছু বায়ু সর্বদা দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে। উত্তাপ পাইয়া ঐ বায়ু প্রসারিত হয় এবং দুধ উথলাইয়া ওঠে।

তোমরা ফুলকো লুচি খাইয়াছ। পাতলা ময়দার লুচি উত্তপ্ত ঘিয়ে ছাড়িলে ফুলিয়া উঠে। জল, ময়দা ইত্যাদি দ্বারা লুচি বেলিবার সময় কিছু বায়ু উহাতে আবদ্ধ থাকে। উত্তাপ পাইয়া এই বায়ু প্রসারিত হয় বলিয়া লুচি ফুলিয়া ওঠে।

নিম্নের পরীক্ষা দ্বারা পরীক্ষাগারে গ্যাসের প্রসারণ দেখানো যাইতে পারে।

পরীক্ষা ঃ একটি পাতলা কাচের ফ্লাস্ক লইয়া উহাতে কিছু পরিমাণ রঙীন জল ঢাল এবং কর্ক দ্বারা মুখ বন্ধ কর। কর্ক-ছিদ্র দিয়া একটি সরু কাচ-নল

ঢুকাও যাহাতে নলটি ফ্লাস্কের তলা পর্যন্ত পৌঁছায়। জল ছাড়া ফ্লাস্কের বাকী অংশ বায়ুপূর্ণ। এইবার দুই হাত দিয়া ফ্লাস্কটির উপরাংশ আবৃত করিলে দেখা যাইবে যে কাচ-নল বাহিয়া রঙীন জল ঊর্ধ্বে উঠিতেছে। কেন এরূপ হয় ?

গ্যাসের প্রসারণ দেখাইবার ব্যবস্থা

হাতের উত্তাপে ফ্লাস্কের উপরাংশে যে বায়ু আছে তাহার আয়তনের প্রসারণ হইতে চায়। ফলে উহা জলের উপর যে-চাপ প্রয়োগ করে তাহা জলকে কাচ-নল বরাবর খানিকটা উপরে তুলিয়া দেয়।
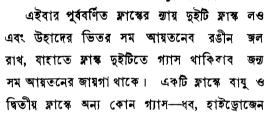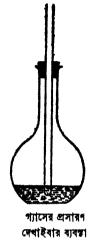
এইবার পূর্ববর্ণিত ফ্লাস্কের ন্যায় দুইটি ফ্লাস্ক লও এবং উহাদের ভিতর সম আয়তনেব রঙীন জল রাখ, যাহাতে ফ্লাস্ক দুইটিতে গ্যাস থাকিবাব জন্য সম আয়তনের জায়গা থাকে। একটি ফ্লাস্কে বায়ু ও দ্বিতীয় ফ্লাস্কে অন্য কোন গ্যাস—ধব, হাইড্রোজেন রাখা হইল। এইবার ফ্লাস্ক দুইটিকে একটি গরম জলপূর্ণ বড গামলায় রাখ। দেখিবে, দুইটি ফ্লাস্কের কাচ-নলেই রঙীন জল সমান ঊর্ধ্বে উঠিয়াছে। ইহা প্রমাণ করে যে, **সমান তাপ পাইলে সব গ্যাসের আয়তন প্রসারণ সমান হয়**। কিন্তু কঠিন বা তবলের তাহা হয় না।

৪. গ্যাসের প্রসারণের ফল

বায়ু এক প্রকার গ্যাস। সূর্যের উত্তাপে ও অন্যান্য নানা কারণে এই বায়ুব প্রসারণ হয়। এই প্রসারণের ফলে বায়ুপ্রবাহ, স্থলবায়ু ও সমুদ্রবায়ু প্রভৃতি নানারূপ প্রাকৃতিক ঘটনা ঘটে।

(ক) সমুদ্রবায়ু ও স্থলবায়ু [Sea and Land Breeze] :

তাপ পাইলে জল অপেক্ষা স্থল দ্রুত গরম হয়, আবাব তাপ হ্রাসে জল অপেক্ষা স্থল দ্রুত ঠাণ্ডা হয়। দিনের বেলাতে সূর্যতাপে জল অপেক্ষা স্থল বেশী উত্তপ্ত হয় এবং স্থল-সংলগ্ন বায়ু গরম হইয়া আয়তনে প্রসারিত হয়। ইহাতে উক্ত বায়ু হাল্‌কা হইয়া পড়ে ও ঊর্ধ্বে উঠে এবং সমুদ্র হইতে ঠাণ্ডা

হাওয়া শূন্য স্থান পুরণ করিতে স্থলের দিকে প্রবাহিত হয়। ইহাকে **সমুদ্রবায়ু** বলে। ইহা দিনের বেলায় প্রবাহিত হয় ও সন্ধ্যার দিকে সর্বাপেক্ষা প্রবল হয়।
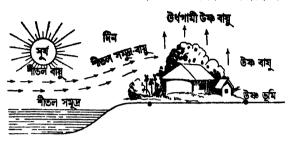
সমুদ্রবায়ু

আবার রাত্রে সূর্যতাপ না থাকায় জল অপেক্ষা স্থল দ্রুত ঠাণ্ডা হইয়া পড়ে। সুতরাং সমুদ্রের উপর গরম হাওয়া আয়তনে প্রসারিত হইয়া হাল্কা হয় এবং

স্থলবায়ু

ঊর্ধ্বে উঠে। স্থল হইতে অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা হাওয়া সেই শূন্য স্থান পূর্ণ করিতে সমুদ্রের দিকে প্রবাহিত হয়। ইহাকে **স্থলবায়ু** বলে। ইহা ভোরের দিকে সর্বাপেক্ষা প্রবল হয়।

9. তাপমাত্রা (Temperature)

গরম ও ঠাণ্ডা বোধ আমাদের সকলেরই আছে। বরফে হাত দিলে আমাদের ঠাণ্ডা বোধ হয়, কিন্তু উত্তপ্ত লোহার টুকরাতে হাত দিলে গরম বোধ হয়। **কোন পদার্থ ঠাণ্ডা কি গরম এই অনুভূতিকে আমরা সোজা কথায় পদার্থের তাপমাত্রা বলিতে পারি।** যে-পদার্থে হাত দিলে গরম লাগে তাহার তাপমাত্রা বেশী বলা হয়, আর যে-পদার্থ ঠাণ্ডা বলিয়া মনে করি তাহার তাপমাত্রা কম বলা হয়।

কিন্তু তাই বলিয়া তাপ বেশী হইলেই যে তাপমাত্রা বাড়িবে তাহার কোন অর্থ নাই। যেমন, একটি দেশলাইয়ের জ্বলন্ত কাঠি ও এক গামলা ফুটন্ত জলের কথা ধরা যাউক। দেশলাইয়ের কাঠির তাপমাত্রা গামলার ফুটন্ত জল অপেক্ষা অনেক বেশী কিন্তু দেশলাইয়ের জ্বলন্ত কাঠির মোট তাপ গামলার জলের মোট তাপ অপেক্ষা অনেক কম।

তাপ বিজ্ঞানে 'তাপমাত্রা' কথাটি এতই প্রয়োজনীয় যে ইহার বিস্তারিত আলোচনা হওয়া প্রয়োজন।

একটি উত্তপ্ত লোহার বলকে যদি এক বালতি ঠাণ্ডা জলে ছাড়িয়া দেওয়া যায় তবে দেখা যায় যে, লোহার বলটি আস্তে আস্তে ঠাণ্ডা হইতেছে এবং জল আস্তে আস্তে গরম হইতেছে। এরূপ কখনও দেখা যায় না যে উত্তপ্ত বলটি আরও উত্তপ্ত হইতেছে এবং ঠাণ্ডা জল আরও ঠাণ্ডা হইতেছে। ইহার কারণ এই যে, উত্তপ্ত বলটির গোড়াতে তাপমাত্রা ঠাণ্ডা জল অপেক্ষা বেশী থাকায় উত্তপ্ত বল ঠাণ্ডা জলকে তাপ প্রদান করিয়াছে এবং জলের তাপমাত্রা কম হওয়াতে জল সেই তাপ গ্রহণ করিয়াছে। কাজেই **তাপমাত্রা বস্তুর এমন এক তাপীয়** (thermal) **অবস্থা যাহা নির্ণয় করে যে বস্তুটি অন্য বস্তুকে তাপ দিবে কিংবা অন্য বস্তু হইতে তাপ গ্রহণ করিবে।**

এই সম্পর্কে তাপমাত্রাকে তরলের তলের (level) সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। আমরা জানি যে, উচ্চতল হইতে জল সর্বদা নিম্নতলে প্রবাহিত হয়। উল্টাদিকে কখনও প্রবাহিত হয় না। অর্থাৎ তলদ্বারা আমরা বুঝিতে পারি যে জলপ্রবাহ কোন্ দিকে হইবে। তাপমাত্রাও তেমনি বুঝাইয়া দেয়, কোন্ বস্তু হইতে কোন্ বস্তুতে তাপের প্রবাহ হইবে।

10. তাপ ও তাপমাত্রার পার্থক্য

(1) তাপ একপ্রকার শক্তি। কিন্তু তাপমাত্রা বস্তুর এক তাপীয় (thermal) অবস্থা।

(2) যখন কোন বস্তু তাপ গ্রহণ করে, তখন উহার তাপমাত্রা বাড়ে এবং যখন তাপ ছাড়িয়া দেয় তখন উহার তাপমাত্রা কমে। অর্থাৎ তাপকে কারণ (cause) বলা যায় এবং তাপমাত্রা হইল তাহার ফল (effect)।

(3) কিছু পরিমাণ জলের সহিত ইহার তলের (level) যে-তফাৎ তাপের সহিত তাপমাত্রারও সেই তফাৎ।

(4) দুই বস্তুর এক তাপমাত্রা হইলে উহাদের যে সমপরিমাণ তাপ থাকিবে তাহার কোন অর্থ নাই। আবার, দুই বস্তুর সমপরিমাণ তাপ থাকিলে যে উহাদের তাপমাত্রা এক হইবে তাহারও অর্থ নাই।

11. তাপমান যন্ত্র বা থার্মোমিটার

পারদ থার্মোমিটার ঃ

কোন জিনিস উত্তপ্ত কি ঠাণ্ডা তাহা আমরা স্পর্শ করিয়া বুঝিতে পারি। কিন্তু স্পর্শানুভূতির বিচার সর্বদা অভ্রান্ত হয় না বা সূক্ষ্মও হয় না। যেমন, শীতপ্রধান দেশের লোক আমাদের দেশে আসিলে খুব বেশী গরম বোধ করিবে কিন্তু আমরা এ দেশে থাকিতে অভ্যস্ত বলিয়া তত গরম বোধ করি না। আবার আমরা শীতের দেশে গেলে খুব বেশী ঠাণ্ডা বোধ করিব।

এক বালতি গরম জলে কিছুক্ষণ হাত ডুবাইয়া রাখিয়া ঠাণ্ডা জলে হাত ডুবাও। জল খুব বেশী ঠাণ্ডা লাগিবে। তেমনি ঠাণ্ডা জলে কিছুক্ষণ হাত ডুবাইয়া রাখিয়া গরম জলে ডুবাইলে জল খুব গরম লাগিবে।

কাজেই অনুভূতির বিচার নির্ভুল নয়। তাছাড়া তাপমাত্রার সূক্ষ্ম পরিমাপ স্পর্শ দ্বারা হইতে পারে না। এজন্য যন্ত্রের প্রয়োজন।

যে-যন্ত্রের সাহায্যে কোন বস্তুর তাপমাত্রা মাপা যায় তাহাকে তাপমান যন্ত্র বা থার্মোমিটার বলে।

যে-থার্মোমিটারে পারদ ব্যবহৃত হয় তাহাকে পারদ-থার্মোমিটার বলে। এই ধরনের থার্মোমিটারের ব্যবহার খুব বেশী দেখা যায়।

একথা সর্বদা মনে রাখিবে যে **থার্মোমিটার দ্বারা আমরা বস্তুর তাপ মাপি না ; তাপমাত্রা মাপি।**

পারদ থার্মোমিটার

থার্মোমিটারের বিবরণ ঃ

সংলগ্ন চিত্রে পরীক্ষাগারে বহুল ব্যবহৃত একটি পারদ-থার্মোমিটারের ছবি দেখানো হইয়াছে। ইহা একটি সর্বত্র সমান ব্যাসের সূক্ষ্ম রন্ধ্রবিশিষ্ট শক্ত কাচের নল। রন্ধ্রের এক প্রান্তে চোঙাকৃতি একটি কুণ্ড আছে এবং

অপর প্রান্ত বন্ধ। কুণ্ড এবং রন্ধ্রের খানিকটা অংশ পারদপূর্ণ। কাচ-নলের গায়ে তাপমাত্রার স্কেল অঙ্কিত। যে-বস্তুর তাপমাত্রা মাপিতে হয় তাহার সহিত কুণ্ডটির সংস্পর্শ ঘটাইলে, পারদ আয়তনে বাড়িয়া যে-দাগ পর্যন্ত পৌঁছাইবে তাহাই হইবে বস্তুর তাপমাত্রা।

থার্মোমিটার নির্মাণ প্রণালী :

একটি সমান ব্যাসের সরু রন্ধ্রবিশিষ্ট শক্ত কাচ-নল লও। নলটির দুমুখ খোলা। এক মুখ আগুনে গলাইয়া অন্য মুখে ফুঁ দিয়া একটি চোঙাকৃতি কুণ্ড-A তৈয়ারী কর (চিত্র দ্রষ্টব্য)। অন্য মুখে রবার নল দিয়া একটি ফানেল F আটকাও। ইহার একটু নীচে কাচ-নলের দেওয়াল একটু গরম করিয়া চাপিয়া দাও যাহাতে ঐ স্থানের রন্ধ্র একটু বেশী সরু হয় (চিত্রে C অংশ)। এখন ফানেলে কিছু বিশুদ্ধ পারা লও। কাচ-নলের রন্ধ্র খুব সরু এবং বায়ুপূর্ণ বলিয়া পারা রন্ধ্র বাহিয়া কুণ্ডে আসিতে পারিবে না। কুণ্ডটি পারদপূর্ণ করিতে নিম্নোক্ত পন্থা অবলম্বন করিতে হইবে।

থার্মোমিটার নির্মাণ কৌশল

A কুণ্ডকে গরম কর। ফলে রন্ধ্রের বায়ু আয়তনে বাড়িয়া পারদের ভিতর বুদ্‌বুদ্ সৃষ্টি করিয়া বাহির হইয়া যাইবে। কুণ্ডকে এখন ঠাণ্ডা করিলে খানিকটা পারা কুণ্ডে আসিয়া জমা হইবে। পুনরায় A কুণ্ডকে গরম কর যাহাতে কুণ্ডের পারা ফুটিতে থাকে। পারার বাষ্প রন্ধ্রের সব বায়ু ও জলীয় বাষ্প ইত্যাদি ঠেলিয়া বাহির করিয়া দিবে। কুণ্ডকে এইবার ঠাণ্ডা করিলে আরো কিছু পারা কুণ্ডে জমা হইবে। এইরূপ পর্যায়ক্রমে কুণ্ডকে গরম ও ঠাণ্ডা করিতে হইবে যতক্ষণ না কুণ্ড ও রন্ধ্রের খানিকটা অংশ পারদপূর্ণ হয়।

অতঃপর থার্মোমিটার সর্বাধিক যে-তাপমাত্রা নির্ণয় করিবে তাহা অপেক্ষা কিছু বেশী তাপমাত্রায় কুণ্ডটি রাখিতে হইবে। ফলে পারদ আয়তনে বাড়িয়া ফানেল পর্যন্ত পৌঁছাইবে। এই অবস্থাতে ফানেল হইতে অতিরিক্ত পারদ সরাইয়া কুণ্ডটিকে আস্তে আস্তে ঠাণ্ডা কর। পারদ আয়তনে কমিয়া যখন

C অংশে পৌঁছাইবে তখন ঐ স্থান গরম করিয়া গলাইয়া বন্ধ কর। অতঃপর সমস্ত নলটিকে ঠাণ্ডা করিলে পারদ সংকুচিত হইয়া কুণ্ড ও রন্ধ্রের কিছু অংশ অধিকার করিবে। এইরূপে পারদ-থার্মোমিটার তৈয়ারী হয়।

থার্মোমিটারের স্থিরাঙ্ক [fixed points] **নির্ণয়ঃ**

তাপমাত্রা নির্ণয়ের স্কেল তৈয়ারী করিলে গেলে সর্বপ্রথম স্থিরাঙ্ক নির্ণয় করিতে হইবে। দুইটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় পারদ কোথায় গিয়া দাঁড়ায় তাহাই হইল থার্মোমিটারের স্থিরাঙ্ক। যে-তাপমাত্রায় বিশুদ্ধ বরফ গলে অথবা জল জমিয়া বরফ হয় তাহাকে **নিম্ন স্থিরাঙ্ক** (lower fixed point) অথবা **হিমাঙ্ক** (freezing point) বলে এবং বায়ুর স্বাভাবিক চাপে বিশুদ্ধ জল যে তাপমাত্রায় ফুটিতে থাকে তাহাকে **ঊর্ধ্ব স্থিরাঙ্ক** (upper fixed point) বা **স্ফুটনাঙ্ক** (boiling point) বলে।

নিম্ন স্থিরাঙ্ক নির্ণয়
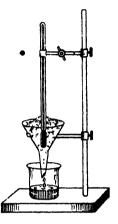
নিম্ন স্থিরাঙ্ক নির্ণয় করিতে গেলে চিত্রে প্রদর্শিত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে। একটি ফানেলে পরিষ্কার বরফের টুকরা লইয়া থার্মোমিটারের কুণ্ড ও নলের কিছু অংশ বরফে ডুবাইয়া দাও। বরফের সংস্পর্শে কুণ্ড যত ঠাণ্ডা হইবে পারা রন্ধ্র দিয়া তত নামিয়া আসিবে। পরে যখন কুণ্ড বরফের তাপমাত্রা পাইবে তখন পারদ স্থির হইয়া দাঁড়াইবে। সেই জায়গায় নলের গায়ে দাগ কাটিয়া দাও। ইহাকেই নিম্ন স্থিরাঙ্ক বা হিমাঙ্ক বলা হয়।
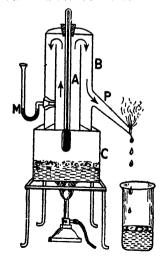
ঊর্ধ্ব স্থিরাঙ্ক নির্ণয়

ঊর্ধ্ব স্থিরাঙ্ক নির্ণয় করিতে গেলে দ্বিতীয় চিত্রানুযায়ী ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে। এখানে থার্মোমিটারকে হিপসোমিটার (**Hypsometer**) নামক যন্ত্রের ভিতর ডুবাইয়া দিতে হইবে।

এই যন্ত্রে C একটি তামার পাত্র। এই পাত্রে জল রাখিয়া জলকে ফুটাইতে হয়। C পাত্রের উপর A এবং B দুইটি ধাতব চোঙ। জলীয় বাষ্প A চোঙের ভিতর দিয়া A এবং B-এর মাঝখানে আসে এবং P মুখ দিয়া বাহির হইয়া যায়। A চোঙের বাষ্পের চাপের সহিত বায়ুমণ্ডলের চাপের প্রভেদ বুঝিবার জন্য একটি দুমুখ খোলা বাঁকানো কাচ-নল (M) পারদপূর্ণ করিয়া যন্ত্রটির সহিত লাগানো থাকে। ইহাকে ম্যানোমিটার বলে। ম্যানোমিটারের দুই বাহুতে পারদের তল সমান হইলে বাষ্পের চাপ ও বায়ুমণ্ডলের চাপ এক হইবে।

থার্মোমিটারকে এমনভাবে হিপ্‌সোমিটারে ঢুকাইতে হইবে যেন কুণ্ড জল হইতে খানিকটা উঁচুতে থাকে। জল ফুটিতে আরম্ভ করিলে কুণ্ডের পারদ আয়তনে বাড়িবে এবং রন্ধ্র বাহিয়া উপরে উঠিবে। যখন কুণ্ড বাষ্পের তাপমাত্রা পাইবে তখন পারা স্থির হইয়া দাঁড়াইবে। তখন ঐ জায়গায় কাচ-নলের গায়ে দাগ কাট। ইহাকে ঊর্ধ্ব স্থিরাঙ্ক বা স্ফুটনাঙ্ক বলা হইবে।

12. থার্মোমিটার স্কেল

স্থিরাঙ্ক দুইটির মধ্যবর্তী স্থানকে ভাগ করিয়া থার্মোমিটার স্কেল তৈয়ারী হয়। তাপমাত্রা নির্ণয়ের জন্য আমাদের দেশে দুই রকমের থার্মোমিটার স্কেল ব্যবহৃত হয়। যথা—(ক) সেন্টিগ্রেড স্কেল ও (খ) ফারেনহাইট স্কেল।
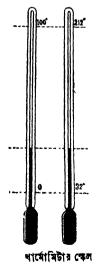
থার্মোমিটার স্কেল

(ক) **সেন্টিগ্রেড স্কেল :**

এই স্কেল অনুযায়ী নিম্ন স্থিরাঙ্ক 0° ডিগ্রী ও ঊর্ধ্ব স্থিরাঙ্ক 100° ডিগ্রী ধরা হয়। মধ্যবর্তী স্থানকে 100 সমান ভাগে ভাগ করা হয় এবং প্রত্যেক ভাগকে এক ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড বলা হয়।

(খ) **ফারেনহাইট স্কেল :**

এই স্কেল অনুযায়ী নিম্ন স্থিরাঙ্ককে 32° ডিগ্রী এবং ঊর্ধ্বস্থিরাঙ্ককে 212° ডিগ্রী ধরা হয়। মধ্যবর্তী স্থানকে সমান 180 ভাগে ভাগ করা হয়।

সংলগ্ন চিত্রে দুটি স্কেলের ছবি দেখানো হইল।

13. ডাক্তারী বা ক্লিনিক্যাল থার্মোমিটার

জ্বর হইলে দেহের তাপমাত্রা পরীক্ষা করিবার জন্য ডাক্তারগণ এই থার্মোমিটার ব্যবহার করেন। বাড়িতে তোমরা এই থার্মোমিটার নিশ্চয়ই দেখিয়াছ। ইহা একটি ফারেনহাইট থার্মোমিটার। এই থার্মোমিটার 95° ডিগ্রী হইতে 110° ডিগ্রী ফারেনহাইট পর্যন্ত দাগ কাটা থাকে, কারণ, জীবিত মানুষের দেহের তাপমাত্রা ইহার ভিতর ওঠা-নামা করে। সেইজন্য এই থার্মোমিটার অন্যান্য থার্মোমিটার অপেক্ষা সাইজে অনেক ছোট। 98·4° ডিগ্রীর কাছে একটি দাগ দেওয়া থাকে। উহা স্বাভাবিক ও সুস্থ দেহের তাপমাত্রা বুঝায়। থার্মোমিটারে কুণ্ডটির কাছে রন্ধ্র খুব সংকুচিত এবং একটু বাঁকা (চিত্রের C অংশ)। ইহার ফলে মানুষের দেহের তাপমাত্রা অনুযায়ী পারা সংকুচিত
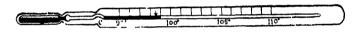
ডাক্তারী থার্মোমিটার

স্থান দিয়া অনায়াসে আয়তনে বাড়িয়া অগ্রসর হয়, কিন্তু দেহের বাহিরে থার্মোমিটার আনিলে পারা ঐ স্থান দিয়া কুণ্ডে ফিরিয়া আসিতে পারে না। ইহাতে তাপমাত্রা পড়িবার সুবিধা হয় এবং থার্মোমিটার শরীর হইতে সরাইয়া আনিবার বহুক্ষণ পরেও দেহের তাপমাত্রা কত হইয়াছিল তাহা জানিবার কোন অসুবিধা হয় না। সাধারণ থার্মোমিটারে এই সুবিধা নাই। পুনরায় থার্মোমিটার ব্যবহার করিতে হইলে পারা কুণ্ডে ফিরাইয়া আনিতে হয় এবং তাহার জন্য থার্মোমিটারে ঝাঁকুনি দিতে হয়। উপরের চিত্রে এই ধরনের একটি থার্মোমিটার দেখানো হইয়াছে।

14. সিক্সের লঘিষ্ঠ ও গরিষ্ঠ থার্মোমিটার

[Six's maximum and minimum thermometer]

ইহা একটি অ্যালকোহল থার্মোমিটার এবং ফারেনহাইট স্কেল অনুযায়ী দাগ কাটা। এই থার্মোমিটার বিশেষভাবে আবহাওয়াবিদ্‌গণ ব্যবহার করেন। কারণ, এই থার্মোমিটার দ্বারা দিনের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা পাওয়া যায়।

সংলগ্ন চিত্রে এই থার্মোমিটার দেখানো হইল। সমব্যাসযুক্ত সরু রন্ধ্রের কাচ-নল বাঁকাইয়া অনেকটা U-অক্ষরের মত করা হয় এবং একটি কাঠের ফ্রেমে খাড়াভাবে আবদ্ধ রাখা হয়।

কাচ-নলের PMQ অংশ পারদপূর্ণ। A এবং B দুইটি ইস্পাতের সূচক স্প্রীং দ্বারা কাচ-নলের দেওয়ালে আটকানো। (ছবিতে আলাদাভাবে দেখানো হইয়াছে)। সূচকটি ঠেলা খাইলে নল বাহিয়া অগ্রসর হয় কিন্তু ঠেলা না খাইলে স্প্রীং দ্বারা নলের গায়ে আটকাইয়া থাকে। C একটি লম্বা কুণ্ড। এই কুণ্ডটি এবং তৎসংলগ্ন কাচ-নলের P পর্যন্ত অ্যালকোহল দ্বারা পূর্ণ। বাঁ দিকের কাচ-নলেও D একটি কুণ্ড। এই কুণ্ডটির কিছু অংশ এবং সংলগ্ন কাচ-নলের Q পর্যন্ত অ্যালকোহল দ্বারা পূর্ণ। AQ কাচ-নল ও BP কাচ-নলের গা বাহিয়া দুইটি স্কেল ফারেনহাইটে দাগ কাটা থাকে। বাম দিকের স্কেল উচ্চ হইতে নিম্নে (অর্থাৎ, গরিষ্ঠ স্কেল) এবং ডান দিকেরটি নিম্ন হইতে উচ্চে (অর্থাৎ লঘিষ্ঠ স্কেল) দাগ কাটা আছে।
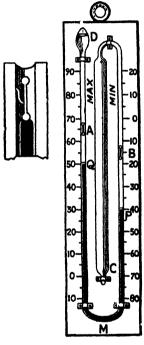
লঘিষ্ঠ ও গরিষ্ঠ থার্মোমিটার

সর্বপ্রথম একটি চুম্বক দ্বারা বাহির হইতে A এবং B সূচকদ্বয়কে টানিয়া Q এবং P-এর সহিত ঠেকাইতে হইবে। এখন যদি তাপমাত্রা বাড়িতে থাকে, তবে D এবং C কুণ্ডের অ্যালকোহল আয়তনে বাড়িবে। কিন্তু D কুণ্ডে কিছু জায়গা থাকায় ঐ কুণ্ডের কিছু তরল ঐ খালি জায়গা অধিকার করিবে; আর C কুণ্ডের অ্যালকোহল আয়তনে বাড়িয়া P পারদ-প্রান্তকে নীচের দিকে ঠেলিয়া দিবে। সঙ্গে সঙ্গে বাঁ দিকের কাচ-নলে Q পারদ-প্রান্ত উপরের দিকে উঠিবে। সূচক দুইটি অ্যালকোহলে ডুবানো থাকায় উহার আয়তন বৃদ্ধিতে সূচকের কোন স্থানচ্যুতি হয় না, কিন্তু পারদস্তম্ভ চলাচল করিলে সূচককে ঠেলিয়া লইবে। সুতরাং বাঁ দিকের কাচ-নলে Q পারদ-প্রান্ত

উপরের দিকে উঠিলে তাহার সহিত A-সূচকও উপরের দিকে উঠিবে এবং তাহার পর দেওয়ালের গায়ে আটকাইয়া থাকিবে। সুতরাং, গরিষ্ঠ স্কেল হইতে A সূচকের অবস্থান পাঠ করিলে দিনের গরিষ্ঠ তাপমাত্রা পাওয়া যাইবে।

আবার, তাপমাত্রা হ্রাস পাইলে C এবং D কুণ্ডের অ্যালকোহল আয়তনে কমিবে এবং সঙ্গে সঙ্গে P পারদ-প্রান্ত উপরের দিকে উঠিবে। তাহার সহিত P-সূচকটি নল বাহিয়া উপরের দিকে অগ্রসর হইবে এবং যখন আর তাপমাত্রা কমিবে না তখন সূচক দেওয়ালের গায়ে আটকাইয়া থাকিবে। সুতরাং, লঘিষ্ঠ স্কেল হইতে B-সূচকের অবস্থান পাঠ করিলে দিনের লঘিষ্ঠ তাপমাত্রা পাওয়া যাইবে।

15 অবস্থা পরিবর্তন

[Change of State]

আমরা জানি পদার্থ তিন রকম অবস্থায় থাকিতে পারে, যথা: **কঠিন**, তরল ও বায়বীয়। যখন কোন পদার্থ কঠিন হইতে তরলে বা তরল হইতে বায়বীয় অবস্থাতে অথবা বায়বীয় হইতে তরল ইত্যাদি এক অবস্থা হইতে অন্য কোন অবস্থাতে পবিবর্তিত হয় তখন তাহাকে পদার্থের অবস্থা পরিবর্তন বলে।

16. গলন ও কঠিনীভবন

[Melting and Freezing]

ধর, এক টুকরা বরফকে $-10°C$ তাপমাত্রাতে রাখা হইয়াছে। ঐ বরফ টুকরাতে যদি তাপ প্রয়োগ করা হয় তবে দেখা যাইবে যে, উহার তাপমাত্রা বাড়িতেছে। **যখন তাপমাত্রা 0°C হইল তখন তাপ প্রয়োগ সত্বেও তাপমাত্রার আর কোন পরিবর্তন দেখা যাইবে না,** কিন্তু বরফ গলিয়া জল হইতে শুরু কবিবে। যতক্ষণ পযন্ত না সমস্ত বরফ গলিয়া জল হইবে ততক্ষণ পযন্ত তাপ প্রয়োগ সত্ত্বেও তাপমাত্রা 0°C থাকিবে। পবে বরফগলা জলের তাপমাত্রা আস্তে আস্তে বৃদ্ধি পাইবে।

তেমনি যদি খানিকটা বিশুদ্ধ জল লইয়া ক্রমাগত ঠাণ্ডা করা যায় তবে জলের তাপমাত্রা হ্রাস পাইবে। কিন্তু যখন তাপমাত্রা 0°C-তে পৌছাইবে

তখন ঠাণ্ডা করা সত্ত্বেও জলের তাপমাত্রার কোন পরিবর্তন দেখা যাইবে না, কিন্তু জল জমিয়া বরফ হইতে শুরু করিবে। যতক্ষণ পর্যন্ত না সমস্ত জল জমিয়া বরফে পরিণত হইবে ততক্ষণ পর্যন্ত ঠাণ্ডা করা সত্ত্বেও তাপমাত্রা 0°C থাকিবে। পরে বরফের তাপমাত্রা আস্তে আস্তে হ্রাস পাইবে।

এই ঘটনা শুধু যে বরফ এবং জলের বেলাতে প্রযোজ্য তাহা নহে। প্রকৃতপক্ষে যে-সমস্ত পদার্থ তাপ প্রয়োগে রাসায়নিক ক্রিয়া করিবে না তাহাদের বেলাতেই প্রযোজ্য। কিন্তু যে-সমস্ত পদার্থকে উত্তপ্ত করিলে রাসায়নিক ক্রিয়া হয় তাহাদের বেলাতে অন্যরূপ হইবে। যেমন, কয়লা বা কাঠ ইত্যাদিতে তাপ দিলে গলিবার পরিবর্তে রাসায়নিক ক্রিয়া হইয়া উহারা পুড়িয়া যায়।

সুতরাং বলা যাইতে পারে যে সাধারণত কোন পদার্থে তাপ প্রয়োগ করিলে প্রথমে উহার তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় পৌছিলে কঠিন পদার্থ গলিতে শুরু করে এবং তখন তাপ প্রয়োগ সত্ত্বেও তাপমাত্রার আর কোন পরিবর্তন হয় না, যতক্ষণ পর্যন্ত না সমস্ত পদার্থ গলিয়া তরলে পরিণত হইবে। এই ব্যাপারকে পদার্থের **গলন** বলা হয়।

তেমনি সাধারণত কোন তরল পদার্থ হইতে তাপ নিষ্কাশন করিলে প্রথমে উহার তাপমাত্রা হ্রাস পায়। কিন্তু একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় পৌছিলে তরল পদার্থ জমিয়া কঠিন পদার্থে পরিণত হইতে শুরু করে এবং তখন তাপ নিষ্কাশন সত্ত্বেও তাপমাত্রার আর কোন পরিবর্তন হয় না, যতক্ষণ পর্যন্ত না সমস্ত জল জমিয়া কঠিন হইবে। এই ব্যাপারকে পদার্থের **কঠিনীভবন** বলা হয়।

17. বাষ্প ও বাষ্পীভবন

[Vapour and Vaporisation]

কোন তরলের বায়বীয় অবস্থাকে উক্ত তরলের **বাষ্প** বলা হয় এবং যে পদ্ধতিতে তরল বাষ্পে পরিণত হয় তাহাকে **বাষ্পীভবন** বলে। কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ তরল বাষ্পে পরিণত হইতে কিছু তাপ গ্রহণ করিবে যাহা ঐ বাষ্পে লীন অবস্থায় থাকে। এই তাপকে **বাষ্পীভবনের লীন-তাপ** বলে।

18. বাষ্পীভবনের বিভিন্ন উপায়

তরল পদার্থ দুই রকম উপায়ে বাষ্পে পরিণত হইতে পারে। যথা:— (1) বাষ্পায়ন (evaporation) ও (2) স্ফুটন (boiling or ebullition)।

(1) **বাষ্পায়ন:** ধীরে ধীরে তরল অবস্থা হইতে বাষ্পে পরিণত হওয়ার পদ্ধতিকে বাষ্পায়ন বলে। বাষ্পায়ন তরলের উপরি-তল হইতে হয় এবং যে-কোন তাপমাত্রায় হইতে পারে। গরমকালে নদী, পুকুর শুকাইয়া

জল অপেক্ষা স্পিরিট বেশী উদ্বায়ী, কাজেই স্পিরিট আগে উবিয়া যাইবে

যাওয়া, খোলা পাত্রে খানিকটা জল রাখিয়া দিলে কিছুদিন পরে তাহা উবিয়া যাওয়া, ভিজা কাপড় শুকাইতে দিলে জল শুকাইয়া যাওয়া প্রভৃতি বাষ্পায়নের দরুন হয়।

বাষ্পায়ন দ্রুত হইবে কিংবা আস্তে হইবে তাহা তরল এবং অন্যান্য কয়েকটি বিশেষ অবস্থার উপর নির্ভর করে। দুইটি প্লেটে সমান পরিমাণ জল এবং স্পিরিট ঢাল। দেখিবে স্পিরিট জলের অনেক আগে উবিয়া গিয়াছে। ইহা হইতে বোঝা যায় যে বাষ্পায়ন তরলের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। যে-তরল যত উদ্বায়ী (volatile) হইবে উহা তত দ্রুত বাষ্পীভূত হইবে। ইথার, অ্যালকোহল ইত্যাদি খুব উদ্বায়ী তরল।

তোমরা লক্ষ্য করিয়াছ যে শীতকালে ভিজা কাপড় যত তাড়াতাড়ি শুকায়, বর্ষাকালে তত তাড়াতাড়ি শুকায় না; ইহার কারণ এই যে, শীতকাল অপেক্ষা বর্ষাকালে বায়ুতে বেশী জলীয়-বাষ্প থাকে। বায়ুতে বেশী জলীয় বাষ্প থাকিলে তরল হইতে বাষ্প উঠিতে বাধা পায়, কাজেই বাষ্পায়ন দ্রুত হয় না।

গরম চা বা দুধ খাইবার সময় তোমরা অনেকে ডিশে ঢালিয়া খাও, কারণ ডিশে ঢালিলে উহা তাড়াতাড়ি ঠাণ্ডা হয়। ইহা কেন হয় জান কি? ডিশে ঢালিলে তরলের উপরিতল যত বেশী বিস্তৃত হয়, কাপে বা বাটিতে তত

হয় না। উপরিতল যত বেশী বিস্তৃত হইবে তরল তত দ্রুত বাষ্পীভূত হইয়া ঠাণ্ডা হইবে।

হাওয়া থাকিলে ভিজা কাপড় তাড়াতাড়ি শুকায়; ছায়া অপেক্ষা রৌদ্রে রাখিলে ভিজা কাপড় দ্রুত শুকাইয়া যায়, ইহা নিত্যকার ঘটনা। ইহা হইতে আমরা জানিতে পারি যে বায়ুপ্রবাহ বা উষ্ণতা বাষ্পায়নের দ্রুততা বৃদ্ধি করে।

সুতরাং, উপরোক্ত উদাহরণ হইতে আমবা বুঝিতে পারি যে, (ক) তরলের প্রকৃতি, (খ) বায়ুতে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ, (গ) তরলের উপরিতলে বিস্তৃতি (ঘ) বায়ুপ্রবাহ, (ঙ) তরলেব উষ্ণতা—এই সব বিশেষ অবস্থার উপর বাষ্পায়নেব হার নির্ভব করে।

19. **তরলের স্ফুটন** (Boiling of a liquid) :

তরল অবস্থা হইতে খুব দ্রুত বাষ্পে পরিণত হওয়ার পদ্ধতিকে স্ফুটন বলা হয়। স্ফুটন তরলের সমস্ত অংশ হইতে সংঘটিত হয় এবং পারিপার্শ্বিক চাপের উপর নির্ভর করিয়া একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় শুরু হয়। যতক্ষণ পযন্ত না সমস্ত তরল বাষ্পে পরিণত হয় ততক্ষণ পযন্ত এই তাপমাত্রা স্থির থাকে।

পরীক্ষা : একটি মোটা গলা কাচের ফ্লাস্ক লও (চিত্রে প্রদর্শিত) এবং উহার কিছু অংশ জলপূর্ণ কব। একটি থার্মোমিটাব কর্কেব ফুটা দিয়া ঢুকাও যাহাতে থার্মোমিটারের কুণ্ড জলের উপরে থাকে। একটি ছোট বাঁকানো কাচ-নল বাষ্প বাহির হইবাব জন্য লাগাও। এইবার বার্নার দিয়া ফ্লাস্ককে গরম কর। দেখিবে প্রথম প্রথম জল হইতে বুদ্‌বুদ্ উঠিতেছে এবং থার্মোমিটারের পারদ উচ্চে উঠিতেছে। আরো তাপ দিলে অবশেষে দেখা যাইবে যে সমস্ত জল টগ্‌বগ্ করিয়া ফুটিতেছে এবং প্রচুর বাষ্প উঠিতেছে। ঐ অবস্থায় বলা হয় যে জলের স্ফুটন হইতেছে। তখন থার্মোমিটাবের পারদ 100°C-এ স্থির হইয়া দাঁড়াইবে।
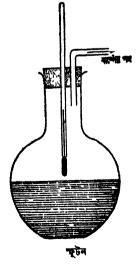
স্ফুটন

20. বাষ্পায়ন ও স্ফুটনের পার্থক্য

বাষ্পায়ন ও স্ফুটন—এই দুই পদ্ধতির ভিতর নিম্নলিখিত প্রভেদ বর্তমান :—

(1) স্ফুটন অতি দ্রুত সংঘঠিত হয় কিন্তু বাষ্পায়ন হয় ধীরে ধীরে।

(2) স্ফুটন তরলের সমগ্র অংশ ব্যাপিয়া হয়, কিন্তু বাষ্পায়ন তরলের উপরিতল হইতে হয়।

(3) সাধারণ বায়ুমণ্ডলের চাপে স্ফুটন এক নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় সুরু হয় কিন্তু বাষ্পায়ন সকল তাপমাত্রায়ই হইয়া থাকে।

21. ঘনীভবন
[Condensation]

কোন পদার্থ বায়বীয় অবস্থা হইতে তরলে পরিণত হইলে উহাকে **ঘনীভবন** বলা হয়। পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে যে তরলকে উত্তপ্ত করিলে উহা বাষ্পে পরিণত হয়। সুতরাং ঐ বাষ্পকে পুনরায় তরল অবস্থায় ফিরাইয়া আনিতে হইলে উহার তাপ নিষ্কাশন করিয়া লইতে হইবে অর্থাৎ বাষ্পকে ঠাণ্ডা করিতে হইবে। জলীয় বাষ্প ঠাণ্ডা হইলে জলকণায় ঘনীভূত হয়, ইহার বহু উদাহরণ আমাদের জানা আছে।

শরৎকালের ভোরবেলায় ঘাসের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতে পাইবে মুক্তাবিন্দুর ন্যায় অজস্র শিশির-বিন্দু ঘাসের বা পাতার উপর জমিয়া আছে। বায়ুমণ্ডলে যে জলীয়-বাষ্প থাকে তাহা রাত্রিবেলা ঠাণ্ডা হইয়া ঘনীভূত হয় এবং শিশির সৃষ্টি করে।

বায়ুমণ্ডলের জলীয়-বাষ্প ঘনীভূত হইবার ফলে আমরা মেঘ দেখিতে পাই এবং মেঘের জলকণাগুলি খুব ঠাণ্ডা হইলে উহা বৃষ্টির আকারে পৃথিবীতে পড়ে।

গরম ভাতের হাঁড়ির ঢাকনা উল্টাইয়া দেখ। দেখিবে ঢাকনাতে জলবিন্দু জমিয়া আছে।

একটি কাচের গ্লাসে একখণ্ড বরফ ফেলিয়া দাও। দেখিবে কিছুক্ষণের মধ্যে গ্লাসের চারিপাশে কুয়াশার ন্যায় জলবিন্দু জমিয়াছে। বরফ থাকায় গ্লাস খুব ঠাণ্ডা হইয়া পড়ে এবং গ্লাসের চারিপাশের বায়ুতে যে জলীয় বাষ্প থাকে তাহা ঠাণ্ডা গ্লাসের সংস্পর্শে আসায় হঠাৎ খুব শীতল হইয়া পড়ে এবং গ্লাসের চতুর্দিকে জলকণার আকারে জমিয়া যায়।

22. গলন ও বাষ্পায়নের জন্য প্রয়োজনীয় তাপ

[Necessary heat for melting and evaporation]

কোন বস্তুতে তাপ প্রয়োগ করিলে বস্তুর তাপমাত্রার পরিবর্তন হয়। থার্মোমিটারের সাহায্যে তাপমাত্রার পরিবর্তন লক্ষ্য করিয়া আমরা বুঝিতে পারি যে বস্তুটি তাপ গ্রহণ করিতেছে। কিন্তু 0°C তাপমাত্রায় যদি একখণ্ড বরফে তাপ প্রদান করা হয় তবে দেখা যাইবে যে থার্মোমিটার প্রথমত কোন তাপমাত্রার পরিবর্তন দেখাইতেছে না, অথচ তাপ গ্রহণ করিয়া বরফ আস্তে আস্তে গলিয়া যাইতেছে। যতক্ষণ পর্যন্ত সমস্ত বরফ-টুকরাটি গলিয়া জল হইবে ততক্ষণ পর্যন্ত তাপ প্রদান করা সত্ত্বেও তাপমাত্রার কোন পরিবর্তন হইবে না। পরে যখন বরফ সম্পূর্ণ গলিয়া জল হইবে তখন সেই জলের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। তাহা হইলে বরফ টুকরাটির গলন সুরু হইতে শেষ পর্যন্ত যে তাপ প্রদান করা হইল তাহা কোথায় গেল? এই তাপ বরফ-টুকরাটির গলনের সাহায্য করিল কিন্তু ইহার কোন বাহ্যিক প্রকাশ হইল না। এই তাপ বস্তুতে লীন (hidden) হইয়া থাকে। এই জন্যই এই তাপকে গলনের লীন-তাপ বলে।

ঠিক একই রকম ভাবে কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ তরলকে বাষ্পে পরিণত করিতে হইলে কিছু তাপ প্রদান করিতে হইবে যাহার কোন বাহ্যিক প্রকাশ হইবে না। এই তাপকে বাষ্পীভবনের লীন-তাপ বলে।

বাষ্পায়নের জন্য প্রয়োজনীয় লীন-তাপ বাহির হইতে প্রদান না করিলে তরল নিজ দেহ হইতে অথবা পরিপার্শ্ব হইতে ঐ তাপ প্রদান করিয়া ধীরে ধীরে বাষ্পে পরিণত হইবে। ফলে, তরল অথবা পরিপার্শ্ব শীতল হইয়া পড়ে। এই ধরনের শীতলীকরণের বহু উদাহরণ আছে।

(i) গাত্র হইতে যখন ঘাম বাহির হয় তখন পাখার হাওয়া দিলে দেহ শীতল হয়। কারণ হাওয়া দিলে ঘাম বাষ্পে পরিণত হইতে সুবিধা পায় এবং দেহ হইতে প্রয়োজনীয় লীন তাপ সংগ্রহ করিয়া দ্রুত বাষ্পে পরিণত হয় এবং দেহ ঠাণ্ডা হয়।

(ii) গরমের দিনে পানীয় জল ঠাণ্ডা করিবার জন্য জল মাটির কুঁজায় রাখা হয়। কুঁজা মাটির তৈয়ারী হয় বলিয়া ইহার গায়ে অসংখ্য ছিদ্র থাকে। এই ছিদ্র দিয়া সর্বদা জল চোঁয়াইয়া বাহিরে আসে এবং বাষ্পে পরিণত হয়।

ইহার জন্য প্রয়োজনীয় লীন-তাপ কুঁজার গাত্র সরবরাহ করে এবং কুঁজা ঠাণ্ডা হইয়া পড়ে। সুতরাং কুঁজার অভ্যন্তরস্থ জলও ঠাণ্ডা হইয়া যায়। কিন্তু কাচের পাত্র বা কাঁসার পাত্রে জল রাখিলে তত ঠাণ্ডা হয় না। কারণ ঐ পাত্রের গায়ে ছিদ্র থাকে না, কাজেই জলের বাষ্পায়নেরও তেমন সুবিধা হয় না।

23 তাপ সঞ্চালন

[Transmission of heat]

একস্থান হইতে অন্যস্থানে তাপ সঞ্চালনের তিনটি পদ্ধতি আছে। যথা :—

(1) পরিবহণ (conduction), (2) পরিচলন (convection) ও (3) বিকিরণ (radiation)।

পরিবহণ : একটি লোহার দণ্ডের এক প্রান্ত আগুনে ধরলে কিছু সময় পরে অন্য প্রান্ত গরম হইয়া পড়ে। এ স্থলে দণ্ডের ভিতর দিয়া একপ্রান্ত হইতে অন্যপ্রান্তে তাপ সঞ্চালিত হইল। কিন্তু এই তাপ সঞ্চালন কিরূপে হইল ?

দণ্ডের কণাগুলি একপ্রান্ত হইতে অন্যপ্রান্তে গিয়া তাপ পৌছাইয়া দিল কি ? তাহা যদি হইত তবে দণ্ডের আকার পরিবর্তিত হইত। আগুনে রাখা মুখ সরু হইয়া যাইত এবং হাতে ধরা প্রান্ত মোটা হইয়া যাইত। কিন্তু তাহা ত হয় না। সঠিক প্রণালী বুঝাইবার আগে তোমাদের আর একটা কথা বলি।

কোন বাড়ী তৈয়ার করিবার সময় মজুরেরা ইটের গাদা হইতে কিভাবে ইট জমিতে লইয়া আসে লক্ষ্য করিয়াছ কি ? কয়েকজন মজুর পর পর দাঁড়াইয়া যায়। অতঃপর প্রথম মজুর গাদা হইতে ইট লইয়া পরের জনকে দেয়। সে আবার তাহার পরের জনকে দেয়। এইভাবে পর পর হাত হইতে হাতে স্থানান্তরিত হইয়া অবশেষে ইট যথাস্থানে পৌছাইয়া যায়। কোন মজুর কিন্তু তাহার স্থান হইতে নড়ে না। অথচ ইট স্থানান্তরিত হইয়া গেল। পরিবহণ প্রণালীও এই রকম।

দণ্ডের যে-প্রান্ত আগুনে ধরা হইল প্রথমে সেই প্রান্তের কণাগুলি তাপ গ্রহণ করিয়া উত্তপ্ত হইল। পরে পার্শ্ববর্তী ঠাণ্ডা কণাকে সেই তাপ প্রদান করিল। এই কণা আবার উত্তপ্ত হইয়া পার্শ্ববর্তী ঠাণ্ডা কণাতে তাপ সঞ্চালন করিল। এইরূপে কণা হইতে কণাতে সঞ্চালিত হইয়া অবশেষে তাপ

অন্য প্রান্তে পৌঁছিল। এই ধরনের তাপ সঞ্চালনের পদ্ধতিকে **পরিবহণ** বলা হয়।

অতএব যে-প্রণালীতে কোন দ্রব্যের উষ্ণতর অংশ হইতে শীতলতর অংশে তাপ গমন করে অথচ ইহার জন্য দ্রব্যের কণাগুলির কোন স্থান পরিবর্তন হয় না, তাহাকেই পরিবহণ বলা হয়। সাধারণত কঠিন পদার্থে তাপ সঞ্চালন পরিবহণ প্রণালীতে হইয়া থাকে।

পরিচলন : এই প্রণালীতে পদার্থের উত্তপ্ত কণাগুলি নিজেরাই উষ্ণতর অংশ হইতে শীতলতর অংশে গমন করিয়া তাপ লইয়া যায়। সাধারণত তরল ও বায়বীয় পদার্থে তাপ সঞ্চালন পরিচলন প্রণালীতে হইয়া থাকে।
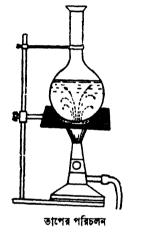
তাপের পরিচলন

পরীক্ষা : একটি কাচের ফ্লাস্কে খানিকটা জল লইয়া উহার ভিতর একটু নীল ফেলিয়া দাও। এখন ফ্লাস্কটি গরম কর। দেখিবে যে, তলার নীল জল উত্তপ্ত হইয়া হাল্‌কা হইবে এবং উপরে উঠিবে, আর উপরের ঠাণ্ডা ও ভারী জল ফ্লাস্কের গা বাহিয়া নীচের দিকে আসিবে (পার্শ্বের চিত্র দ্রষ্টব্য)। এইভাবে দুইটি জলের স্রোতের সৃষ্টি হইবে। কিছুক্ষণ পরে সমস্ত জল সমানভাবে উত্তপ্ত হইয়া পড়িবে। এস্থলে উত্তপ্ত জলের কণাগুলি নীচ হইতে উপরে গিয়া তাপ সঞ্চালন করিল। এই পদ্ধতিকে তাপের **পরিচলন** বলে।

বিকিরণ : এই প্রণালীতে কোন জড় মাধ্যমের (material medium) সাহায্য না লইয়া অথবা মাধ্যম থাকিলে তাহাকে উত্তপ্ত না করিয়া তাপ একস্থান হইতে অন্যস্থানে সঞ্চালিত হয়।

আমরা সূর্য হইতে তাপ পাই। কিন্তু সূর্য ও পৃথিবীর ভিতর যে প্রায় 9 কোটি 30 লক্ষ মাইল স্থান আছে তাহার বেশীর ভাগ শূন্য। কাজেই সূর্যতাপ পৃথিবীতে পরিবহণ বা পরিচলন পদ্ধতিতে আসিতে পারে না, কারণ, উভয় ক্ষেত্রেই জড় মাধ্যমের প্রয়োজন। উপরন্তু সূর্যতাপ পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল ভেদ করিয়া আসিলেও বায়ুমণ্ডল ঠাণ্ডাই থাকে, কারণ, যত উপরে ওঠা যায় তত

ঠাণ্ডা আবহাওয়া পাওয়া যায়। সুতরাং পৃথিবীতে সূর্যতাপ পৌছিবার পদ্ধতি পরিবহণ বা পরিচলন হইতে ভিন্ন। ইহা একটি সম্পূর্ণ আলাদা পদ্ধতি। এই পদ্ধতিকে **বিকিরণ** বলা হয়।

একটি জ্বলন্ত উনুনের পাশে দাঁড়াইলে আমরা গরম অনুভব করি। ইহা পরিচলন দ্বারা হইতে পারে না, কারণ, পরিচলনের ফলে উত্তপ্ত হাওয়া উপরে উঠিবে এবং পার্শ্ববর্তী ঠাণ্ডা হাওয়া উনুনের দিকে যাইবে। সুতরাং আমাদের ঠাণ্ডা লাগাই উচিত। আবার পরিবহণ দ্বারাও হইতে পারে না, কারণ, হাওয়ার তাপ পরিবহণ ক্ষমতা খুব কম। অথচ আমরা গরম অনুভব করি। যে-হেতু এই তাপ-সঞ্চালন পরিবহণ বা পরিচলন দ্বারা হইতেছে না, সুতরাং বিকিরণ দ্বারাই হইতেছে। প্রকৃতপক্ষে যে-কোন উত্তপ্ত বস্তুই তাপ বিকিরণ করে।

24. তিন পদ্ধতির প্রভেদ

(1) পরিবহণ এবং পরিচলনের জন্য কোন মাধ্যমের (কঠিন, তরল অথবা বায়বীয়) প্রয়োজন কিন্তু বিকিরণ মাধ্যমের সাহায্য না লইয়াও হইতে পারে।

(2) পরিবহণ এবং পরিচলন খুব মন্থর পদ্ধতি কিন্তু বিকিরণ অতিশয় দ্রুত পদ্ধতি। বিকিরণের দরুন যে-বেগে তাপ সঞ্চালিত হয় তাহা আলোর বেগের সমান। সেইজন্য আমরা দেখিতে পাই যে সূর্য উঠিবার সঙ্গে সঙ্গেই তাপ পৃথিবীতে পৌছায়।

(3) বিকিরণ প্রণালীতে তাপ সরলরেখায় সর্বদিকে চলাচল করে, কিন্তু পরিবহণ এবং পরিচলন প্রণালীতে তাপ বক্রপথে চলাচল করিতে পারে। সূর্যের তাপ নিবারণ করিতে আমরা ছাতা খুলি। গাছের ছায়ায় দাঁড়াইলে সূর্যতাপ গায়ে লাগে না। এই সব ঘটনা প্রমাণ করে যে, সূর্য হইতে বিকীর্ণ তাপ সরলরেখায় চলে।

(4) বিকিরণ প্রণালীতে তাপ মাধ্যমকে উত্তপ্ত করে না কিন্তু পরিবহণ বা পরিচলন প্রণালীতে তাপ যে-মাধ্যম অবলম্বন করিয়া চলাচল করে তাহাকে উত্তপ্ত করে।

25. তাপ পরিবহণের কয়েকটি ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত

(1) শীতকালে আমরা যে গরম পোশাক ব্যবহার করি তাহা আসলে গরমে নহে। যে-কোন সূতীর জামা এবং গরম জামা স্পর্শ করিয়া দেখ।

দেখিবে উভয়েরই উষ্ণতা এক। কিন্তু শীতকালে গরম পোশাক পরিয়া থাকিলে শীত লাগে না বলিয়া উহাদের "গরম' বলা হয়। উহা পশমের তৈয়ারী বলিয়া উহার ভিতর অসংখ্য ছিদ্র থাকে এবং ঐ ছিদ্রগুলি সর্বদা বায়ুপুর্ণ থাকে। বায়ু তাপের কুপরিবাহী। সুতরাং পশমের পোশাক পরিলে উক্ত বায়ুস্তর আমাদের দৈহিক তাপকে বাহিরে যাইতে দেয় না। ফলে দেহ গরম থাকে। কিন্তু সুতীবস্ত্রে আঁশগুলি আল্‌গাভাবে থাকে না বলিয়া ইহাদের ভিতর বায়ুস্তরও থাকিতে পারে না। এই কারণে সুতীবস্ত্র কম তাপ-নিবারক।

(2) কোন কাচের বোতলের ছিপি বোতলের মুখে শক্তভাবে আট্‌কাইয়া গেলে বোতলের মুখ একটু গরম করিলেই ছিপি আলগা হয়।

ইহার কারণ এই যে কাচ তাপের কুপরিবাহী। তাপ পাইয়া বোতলের মুখ প্রসারিত হয় কিন্তু কাচ সেই তাপ ছিপিতে পরিবহণ করিতে বেশ কিছু সময় নেয়। ফলে ছিপি প্রসারিত হয় না এবং আল্‌গা হইয়া যায়।

(3) কেট্‌লীর হাতলে বেত জড়ানো থাকে এবং ফুটন্ত জলপূর্ণ কেট্‌লী ঐ হাতল দ্বারা ধরিলে বেশী গরম লাগে না। ইহার কারণ এই যে বেত তাপের কুপরিবাহী।

26. পরিচলন প্রক্রিয়ার প্রয়োগ

(1) **উষ্ণ বায়ুদ্বারা ঘর গরম রাখা:** শীতের দেশে বাড়িঘর গরম রাখার জন্য উষ্ণবায়ুর পরিচলন স্রোতকে কাজে লাগানো হয়। বাহির হইতে হাওয়া পাইপ দিয়া ঘরে আনিয়া গরম করা হয়। এই গরম হাওয়া হাল্‌কা বলিয়া উপরে উঠিতে চায় এবং ইহাকে পাইপের সাহায্যে বিভিন্ন ঘরে লইয়া যাওয়া হয়। ফলে ঐ ঘরগুলি গরম থাকে। হাওয়া তাপ ছাড়িয়া দিয়া ঠাণ্ডা হইলে আবার নীচে আসে এবং ইহাকে পুনরায় গরম করা হয়। এইভাবে বায়ুতে পরিচলন স্রোত সৃষ্টি করিয়া ঘরবাড়ি গরম রাখা হয়।

(2) **ঘরে বায়ু চলাচল** (Ventilation): বায়ুতে পরিচলন স্রোত সৃষ্টির ফলে ঘরে বায়ু চলাচল প্রক্রিয়া সম্ভব হয়। ঘরে বেশী লোক থাকিলে তাহাদের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে বা আগুন জ্বালিয়া রাখিলে ঘরের বায়ু দূষিত হয়। এই দূষিত ও উত্তপ্ত বায়ু হাল্‌কা হওয়ায় উপরে উঠিয়া যায় এবং ঘুলঘুলি দিয়া বাহির হইয়া যায়। বাহির হইতে ঠাণ্ডা ও পরিষ্কার বায়ু জানালা-দরজা দিয়া ঘরে প্রবেশ করে। ফলে ঘরের বায়ুমণ্ডল বিশুদ্ধ থাকে।

ঘরের দরজা-জানলা বন্ধ করিয়া আলো জ্বালাইয়া রাত্রিতে নিদ্রা যাওয়া খুব বিপদ্জনক। কারণ নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে এবং আগুনের দহনে শীঘ্রই ঘরের বায়ুতে বর্তমান অক্সিজেন নিঃশেষ হইয়া যায়। তখন বায়ু চলাচলের পথ না থাকিলে নতুন অক্সিজেনের অভাবে লোকের মৃত্যু পর্যন্ত হইতে পারে।

অনুশীলনী

1. তাপ কাহাকে বলে ? তাপের বিভিন্ন উৎসের নাম কর। তাপকে একপ্রকার শক্তি বলিয়া ধরা যায় কি ?

2. তাপ ও তাপমাত্রার প্রভেদ কি ? তাপমাত্রা কোন্ যন্ত্র দিয়া মাপা যায় ? পারদ-থার্মোমিটার নির্মাণের প্রণালী বর্ণনা কর। থার্মোমিটারের রন্ধ্র সমান ব্যাসযুক্ত না হইলে ক্ষতি কি ?

3. থার্মোমিটার স্থিরাঙ্ক কাহাকে বলে ? এই স্থিরাঙ্ক নির্ণয়ের প্রণালীর বিশদ বিবরণ দাও। কত রকমের থার্মোমিটার স্কেল আছে।

4. একটি সুন্দর নকশাদ্বারা সিক্সের লঘিষ্ঠ ও গরিষ্ঠ থার্মোমিটার বর্ণনা কর এবং উহার কার্যপ্রণালী বুঝাইয়া দাও।

5. কঠিন পদার্থের প্রসারণ-সংক্রান্ত কয়েকটি পরীক্ষা বর্ণনা কর।

6. প্রশ্নগুলির উত্তর দাও :—(i) বোতলের গলায় গরম জল ঢালিলে আঁট ছিপি আল্গা হয় কেন ? (ii) রেললাইন পাতার সময় প্রত্যেক দুই টুকরা লাইনের মাঝে খানিকটা ফাঁক থাকে কেন ? (iii) দুইটি বিভিন্ন ধাতুর পাত শক্তভাবে জোড়া লাগাইয়া উত্তপ্ত করিলে বাঁকিয়া যায় কেন ? (iv) গরমকালে পাখার হাওয়ায় আরাম বোধ হয় কেন ? (v) মাটির কুঁজায় জল রাখিলে ঠাণ্ডা হয় কিন্তু ধাতব পাত্রে রাখিলে হয় না কেন ? (vi) গরমকালে জানালায় খস্খস্ টানানো হয় কেন ? (vii) কেট্লীর হাতলে বেত জড়ানো থাকে কেন ? (viii) পশমের পোশাক গরম বলা হয় কেন ?

7. কঠিন, তরল ও গ্যাসের মধ্যে কে কাহার অপেক্ষা বেশী প্রসারশীল ? গ্যাসের প্রসারশীলতা সম্বন্ধে কয়েকটি উদাহরণ দাও।

8. নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে যাহা জান লিখ :—

(i) পদার্থের গলন ও কঠিনীভবন, (ii) বাষ্পায়ন, স্ফুটন, (iv) তাপ সঞ্চালনের বিভিন্ন পদ্ধতি, (v) তরলের আপাত ও প্রকৃত প্রসারণ।

9. বাষ্পীভবন ও স্ফুটনের মধ্যে পার্থক্য কি ? বাষ্পীভবন কোন্ কোন্ বিষয়ের উপর নির্ভর করে ?

10. তাপ সঞ্চালন কোন্ কোন্ পদ্ধতি দ্বারা সম্পন্ন হয় ? তাপ সঞ্চালনের বিভিন্ন পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য কি ?

11. তাপ পরিচলন প্রক্রিয়ার কতকগুলি প্রয়োগের বিবরণ ও কার্যপ্রণালী বর্ণনা কর।

Objective Test প্রশ্ন

(ক) Alternate response type :—

(i) *Yes or No type* :—

(a) তাপকে কি একপ্রকার শক্তি বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে ? —

(b) দুইটি বস্তুর তাপ এক থাকিলেই কি তাপমাত্রা এক হইবে ? —

(c) দুইটি বস্তুর তাপমাত্রা এক হইলেই কি উহাদের একই পরিমাণ তাপ থাকিবে ? —

(d) গ্যাসের প্রসারণ কি তরল অপেক্ষা বেশী ?

(ii) *True or False type* :—

(a) কোন বস্তুকে ক্রমাগত উত্তপ্ত করিলে উহার তাপমাত্রা সর্বদা পরিবর্তন করিবে। —

(b) সমান তাপ পাইলে সকল গ্যাসেরই প্রসারণ সমান হয়। —

(c) পশমের পোশাককে আমরা গরম পোশাক বলি, কারণ উহা সূতিবস্ত্র অপেক্ষা অধিকতর উষ্ণ। —

(d) বিকিরণ পদ্ধতি তাপ সঞ্চালনের পদ্ধতি অপেক্ষা অনেক দ্রুত। —

(খ) Recall type :—

(i) বস্তুর তাপমাত্রা মাপিবার জন্য যে যন্ত্র ব্যবহৃত হয় তাহাকে — বলে। —

(ii) থার্মোমিটার স্কেল নির্মাণের জন্য দুইটি — ব্যবহৃত হয়। —

(iii) সমান তাপ পাইলে সব গ্যাসের আয়তন প্রসারণ — হয়। —

(গ) Completion type :—

যে—(a) কোন দ্রব্যের উষ্ণতর অংশ হইতে — (b) অংশে— (c) গমন করে অথচ ইহার জন্য দ্রব্যের — (d) গুলির কোন স্থান পরিবর্তন হয় না তাহাকে — (e) বলে।

—(a)
—(b)
—(c)
—(d)
—(e)

(ঘ) Multiple choice type :—

(a) যে-প্রণালীতে পদার্থের উত্তপ্ত কণাগুলি নিজেরাই উষ্ণতর অংশ হইতে শীতলতর অংশে গমন করিয়া তাপ লইয়া যায় তাহাকে কি বলে ?

—পরিবহণ, পরিচলন, বিকিরণ।

(b) খুব দ্রুত তরল অবস্থা হইতে বাষ্পে পরিণত হইবার পদ্ধতিকে কি বলে ?

—বাষ্পায়ন, কঠিনীভবন, স্ফুটন।

(c) তরলের কি ধরনের প্রসারণ সম্ভব ?—ক্ষেত্র প্রসারণ, আয়তন প্রসারণ, দৈর্ঘ্য প্রসারণ।

(d) চক্‌মকি-পাথর ঘষিয়া তাপ উৎপন্ন করিলে ঐ উৎসকে কি বলা হইবে ?

—রাসায়নিক, যান্ত্রিক, বৈদ্যুতিক।

৪

রাসায়নিক বিক্রিয়া
[Chemical reactions]

1. অ্যাসিড, ক্ষারক ও লবণ
(Acids, Bases and Salts)

A. রসায়নের ভাষায় অ্যাসিড, ক্ষারক ও লবণ এই তিনটি কথাই শ্রেণীবাচক। অ্যাসিড বলিতে এমন এক শ্রেণীর যৌগিক পদার্থ বুঝায়, যাহার কয়েকটি বিশেষ ধর্ম (properties) রহিয়াছে। অ্যাসিড কথাটির অর্থ টক। অধিকাংশ অ্যাসিডই খাইতে টক লাগে। সাধারণ ব্যবহৃত হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড, সালফিউরিক অ্যাসিড ও নাইট্রিক অ্যাসিড **খনিজ অ্যাসিড** (mineral acids) নামে পরিচিত, কারণ লবণ, গন্ধক, সোডিয়াম নাইট্রেট প্রভৃতি খনিজ পদার্থ হইতে এই সকল অ্যাসিড প্রস্তুত করা হয়। যে সকল অ্যাসিড উদ্ভিদ্ অথবা প্রাণীর দেহ হইতে পাওয়া যায় তাহাদিগকে **জৈব অ্যাসিড** (organic acid) বলে। লেবুর রসে সাইট্রিক অ্যাসিড (citric acid), তেঁতুলে টারটারিক অ্যাসিড (tartaric acid), ভিনিগারে অ্যাসেটিক অ্যাসিড (acetic acid), কালো পিঁপড়ার দেহে ফরমিক অ্যাসিড (formic acid) রহিয়াছে। চাখিয়া দেখিলে এই সব অ্যাসিডই টক লাগিবে। যৌগিক (chemical compound) হিসাবে অ্যাসিডের একটি সাধারণ ধর্ম এই যে, সকল অ্যাসিডেই হাইড্রোজেন আছে এবং কোন কোন অ্যাসিড হইতে উহার অন্তর্গত হাইড্রোজেন কোন বিশেষ ধাতুর সহিত বিক্রিয়ায় বাহির করিয়া আনা যায়।

পরীক্ষা 1. একটি উল্ফের বোতলে (Woulfe's bottle) কিছু দস্তার টুকরা লও। উপরের ফানেল দিয়া উহার উপর লঘু সালফিউরিক অ্যাসিড ঢাল। দস্তার সহিত সালফিউরিক অ্যাসিডের ক্রিয়ায় তৎক্ষণাৎ হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন হইতে থাকিবে এবং পাশের নির্গম-নল দিয়া বাহির হইয়া আসিবে।

জল অপসারণ করিয়া গ্যাস-জারে গ্যাস জমাও। দিয়াশলাইয়ের কাঠি দিয়া গ্যাস জ্বালাইয়া দাও। হাইড্রোজেন জ্বলিয়া যাইবে।

হাইড্রোজেন প্রস্তুত প্রণালী
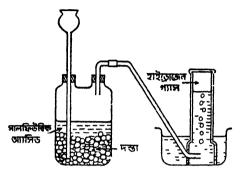
অ্যাসিডের আর একটি ধর্ম এই যে উহার জলীয় দ্রবণের মধ্যে নীল লিটমাস দিলে উহা লাল হইয়া যায়।

পরীক্ষা 2 হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডে অনেকটা জল মিশাইয়া লঘু (dilute) করিয়া লইয়া উহাতে কিছু নীল লিটমাস দ্রবণ ঢাল। উহা লাল হইবে।

কোন জলীয় দ্রবণের মধ্যে অ্যাসিড আছে কি-না, ইহা বুঝিবার আর একটি সহজ উপায় আছে। সোডিয়াম কার্বনেট (কাপড় কাচা সোডা) অথবা সোডিয়াম বাইকার্বনেট (খাবার সোডা) কোন অ্যাসিড দ্রবণের সহিত মিশিলে তৎক্ষণাৎ কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাসের বুদ্বুদ উঠিতে থাকিবে।

পরীক্ষা 3 একটি পরীক্ষা নলে খানিকটা খাবার সোডা লও। উহার মধ্যে যে কোন অ্যাসিডের দ্রবণ, এমন কি লেবুর রস ঢালিয়া লও। দেখিবে বুদ্বুদাকারে কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস উঠিতেছে।

পানীয় হিসাবে যে সোডা ওয়াটার আমরা ব্যবহার করি, তাহা বস্তুতপক্ষে কার্বন ডাই-অক্সাইড নামক গ্যাসের জলীয় দ্রবণ। মজবুত বোতলের মধ্যে ঐ গ্যাস জলের মধ্যে উচ্চচাপে (বায়ুমণ্ডলের সাধারণ চাপের তিন চার গুণ চাপে) দ্রবীভূত থাকে। বোতলের ছিপি খুলিলেই কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস

বাহির হইতে থাকে। কার্বন ডাই-অক্সাইডের জলীয় দ্রবণে **কার্বনিক অ্যাসিড** থাকে।

কার্বন ডাই-অক্সাইড + জল = কার্বনিক অ্যাসিড।

পরীক্ষা 4. একটি বীকারে খানিকটা সোডা ওয়াটার ঢালিয়া লও এবং উহার মধ্যে কিছু নীল লিটমাস দাও। নীল রং লাল হইবে।

অ্যাসিডের অপর একটি সাধারণ ধর্ম এই যে উহা বিভিন্ন ধাতুকে দ্রবীভূত করিতে পারে এবং এই বিক্রিয়ার ফলে দ্রবণে যে পদার্থ উৎপন্ন হয়, তাহাকে ঐ ধাতুর **লবণ** বলে।

পরীক্ষা 5 একটি পরীক্ষা-নলে খানিকটা নাইট্রিক অ্যাসিড লও এবং উহার মধ্যে কিছু তামার চোকলা ফেলিয়া দাও। দেখিবে, এক প্রকার বাদামী রংয়ের গ্যাস উঠিতেছে এবং তামা ঐ অ্যাসিডে ক্রমে দ্রবীভূত হইয়া যাইতেছে। সব তামা দ্রবীভূত হইয়া গেলে একটি সবুজ রংয়ের দ্রবণ পাওয়া যাইবে। এই দ্রবণের মধ্যে কপার নাইট্রেট নামক **লবণ** রহিয়াছে। দ্রবণকে বাষ্পীভূত করিয়া কপার নাইট্রেটের সবুজ দানা প্রস্তুত করা যায়।

অ্যাসিডের সর্বাপেক্ষা সুনিশ্চিত ধর্ম এই যে উহা কোন ক্ষারক পদার্থের সহিত মিলিত হইলে লবণ উৎপন্ন হয়।

অ্যাসিড + ক্ষারক = লবণ + জল

Acid + Base = Salt + Water

পরীক্ষা 6 একটি পরীক্ষা-নলে কিছু লঘু হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড লইয়া উহার মধ্যে একটু নীল লিটমাস ঢাল। দ্রবণ লাল হইবে। এখন ঐ দ্রবণের মধ্যে ফোঁটা ফোঁটা কস্টিক সোডা দ্রবণ **যোগ** করিতে থাক। দেখিবে, লাল দ্রবণ পুনরায় নীল হইতেছে। এই দ্রবণ আগুনে ফুটাইলে জল বাষ্পীভূত হইয়া যাইবে এবং পাত্রে লবণ পড়িয়া থাকিবে। এই লবণ সোডিয়াম ক্লোরাইড।

পরীক্ষা 7 একটি পরীক্ষা নলে খানিকটা কস্টিক পটাশ দ্রবণ লইয়া উহার মধ্যে লাল লিটমাস ঢাল। দ্রবণ নীল হইবে। এখন ঐ দ্রবণে ফোঁটা ফোঁটা হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড যোগ কর। দেখিবে, নীল দ্রবণ ক্রমে লাল হইতেছে। এই দ্রবণ ঘন করিলে পটাশিয়াম ক্লোরাইড নামক লবণ পাওয়া যাইবে।

B যে পদার্থ অ্যাসিডের সহিত মিলিত হইলে লবণ ও জল উৎপন্ন করে তাহাকে **ক্ষারক** (base) বলে। কোন ক্ষারক জলে দ্রাব্য হইলে উহা যেমন

লাল লিটমাসকে নীল করিয়া দেয়, তেমনি উহা হরিদ্রার হলুদ রংকে লাল রং-এ এবং বর্ণহীন ফেনলথেলিনকে লাল রং-এ পরিণত করে।

পরীক্ষা 8. এক টুকরা হলুদ ছেঁচিয়া জলের সহিত মিশাইয়া ছাঁকিয়া লও। ঐ হলুদ জল একটি পরীক্ষা-নলে লইয়া উহার সহিত একটু চুনের জল মিশাও। জলের হলদে রং লাল হইয়া যাইবে। ঐ লাল দ্রবণের মধ্যে খানিকটা পরিষ্কার লেবুর রস ঢালিয়া দাও। দ্রবণ আবার হলদে হইবে।

পরীক্ষা 9. একটি বীকারে খানিকটা জল লইয়া উহার মধ্যে কিছু ফেনলথেলিন (phenolpthalein) মিশাও। এখন ঐ বর্ণহীন দ্রবণে কিছু অ্যামোনিয়া দ্রবণ ঢাল। দ্রবণ অতি সুন্দর লাল হইবে। উহাতে যে-কোন অ্যাসিড ঢালিলে লাল রং অন্তর্হিত হইবে।

পরীক্ষা 10. একটি পরীক্ষা-নলে খানিকটা বেরিয়াম হাইড্রক্সাইড দ্রবণ লও এবং উহার মধ্যে কয়েক ফোঁটা ফেনলথেলিন যোগ কর। দ্রবণ লাল হইবে। এখন ঐ লাল দ্রবণে ফোঁটা ফোঁটা লঘু হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড যোগ কর। লাল দ্রবণ পুনরায় বর্ণহীন হইবে।

যে ক্ষারক জলে দ্রাব্য এবং দ্রবণের ক্ষরণ-ক্ষমতা (corrosive action) অপেক্ষাকৃত জোরালো, তাহাকে **ক্ষার** বা অ্যালকালি (alkali) বলে। কষ্টিক সোডা, কষ্টিক পটাশ, অ্যামোনিয়া, বেরিয়াম হাইড্রক্সাইড এগুলি অ্যালকালি ; অধিকাংশ ক্ষারকই জলে অদ্রাব্য।

C. অ্যাসিডের সহিত বিক্রিয়ায় সকল ক্ষারকই লবণে পরিণত হয়।

হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড + কষ্টিক সোডা = সোডিয়াম ক্লোরাইড + জল

এই বিক্রিয়ায় সোডিয়াম ক্লোরাইড নামক যে লবণ প্রস্তুত হইল তাহা আমাদের পরিচিত খাদ্য লবণ।

হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড + অ্যামোনিয়া দ্রবণ = অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড + জল

নাইট্রিক অ্যাসিড + বেরিয়াম হাইড্রকসাইড = বেরিয়াম নাইট্রেট + জল

সালফিউরিক অ্যাসিড + কষ্টিক পটাশ = পটাশিয়াম সালফেট + জল

অ্যাসেটিক অ্যাসিড + কষ্টিক সোডা = সোডিয়াম অ্যাসিটেট + জল

অদ্রাব্য ক্ষারকও অ্যাসিডের সহিত মিলনে লবণ উৎপন্ন করিবে। ধাতুর অক্সাইড মাত্রেই ক্ষারক এবং অ্যাসিডের সহিত মিলনে উহারা লবণ উৎপন্ন করে।

পরীক্ষা 11. একটি পরীক্ষানলে অল্প পরিমাণ কপার অক্সাইডের চূর্ণ লও। ইহা জলে অদ্রাব্য। ইহার মধ্যে খানিকটা লঘু সালফিউরিক অ্যাসিড ঢালিয়া লইয়া মিশ্রণটিকে একটু গরম কর। দেখিবে, কালো গুঁড়াটি অ্যাসিডে দ্রবীভূত হইয়া গিয়াছে এবং দ্রবণের রং নীল হইয়াছে। ইহা কপার সালফেট নামক লবণের দ্রবণ। কপার সালফেট আমাদের নিকট তুঁতে নামে পরিচিত।

পরীক্ষা 12. একটি পরীক্ষা নলে কিছু চুনের জল লও। সোডা ওয়াটারের বোতল হইতে ফোঁটা ফোঁটা সোডা ওয়াটার ঐ চুনের জলের মধ্যে ঢাল। চুনের জল ঘোলা হইবে। ঘোলা জল থিতাইতে দাও। তলায় সাদা তলানি জমিবে।

এই তলানির নাম ক্যালসিয়াম কার্বনেট এবং ইহা একটি লবণ। ইহা সোডা ওয়াটারের কার্বনিক অ্যাসিডের সহিত চুনের জল অর্থাৎ ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড ক্ষারকের মিলনে উৎপন্ন হইয়াছে।

কার্বনিক অ্যাসিড + ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড = ক্যালসিয়াম কার্বনেট + জল

লবণ মাত্রেরই অণুতে (molecule) দুইটি তড়িদাহিত (electrically charged) অংশ থাকে। একটি পজিটিভ তড়িৎসম্পন্ন ধাতুধর্মী অংশ, অপরটি নেগেটিভ তড়িৎসম্পন্ন অ্যাসিডমূলক অংশ। কোন লবণকে গলিত অবস্থায় অথবা জলে দ্রবীভূত অবস্থায় তড়িৎ-বিশ্লেষণ করিলে ক্যাথোড প্রান্তে ধাতুমূলক অংশ এবং অ্যানোড প্রান্তে অ্যাসিডমূলক অংশ পৃথক্‌ভাবে উৎপন্ন হইতে থাকিবে। খাদ্য লবণ অর্থাৎ সোডিয়াম ক্লোরাইড উত্তাপে গলাইয়া যদি উহাকে তড়িৎ-বিশ্লেষণ করা যায়, তবে ক্যাথোড প্রান্তে সোডিয়াম ধাতু এবং অ্যানোড প্রান্তে ক্লোরিন গ্যাস উৎপন্ন হয়।

2. খাদ্য লবণ প্রভৃতির রাসায়নিক সংযুক্তি ও প্রধান ব্যবহার

[Chemical composition and principal use of common salt, etc.]

A. খাদ্য লবণ (Common salt):

খাদ্য লবণ রসায়নের ভাষায় সোডিয়াম ক্লোরাইড। সোডিয়াম নামক ধাতুর সহিত ক্লোরিন নামক গ্যাসীয় অধাতুর মিলনে এই লবণ উৎপাদন করা যায়। যদি ক্লোরিনপূর্ণ একটি গ্যাস-জারে সোডিয়াম জ্বালানো যায়, তাহা হইলে খাদ্য লবণ উৎপন্ন হইবে।

খাদ্য লবণের প্রধান উৎস সমুদ্র। সমুদ্রের জলে গড়ে প্রায় 2·6 % লবণ রহিয়াছে ; অর্থাৎ 2½ মণ সমুদ্রের জল হইতে 2½ সেরের বেশি লবণ পাওয়া যায়। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে, যেখানে প্রচুর সূর্যালোকের অভাব নাই, সেখানে সমুদ্রতীরে বিস্তৃত ও অগভীর জলাশয় প্রস্তুত করিয়া সমুদ্রের জল দাঁড়াইতে দিলে উহা ঘন হইয়া আসে এবং যথাসময়ে লবণের দানা পৃথক হইয়া পড়ে। দানাগুলি একত্র জমাইয়া সামান্য জলে ধুইয়া শুকাইয়া লইয়া বিক্রয় করা হয়। সাধারণ লবণে সমুদ্রের জলের ম্যাগনেশিয়াম ক্লোরাইড একটুখানি থাকিয়া যায় বলিয়া ঐ লবণ বর্ষাকালে ঘামিয়া জল হইয়া যায়। ম্যাগনেশিয়াম ক্লোরাইড উদগ্রাহী (deliquescent)। বিশুদ্ধ সোডিয়াম ক্লোরাইড উদগ্রাহী নহে। ভারতে বিভিন্ন স্থানের সমুদ্রকূলে লবণ উৎপাদন করা হয়।

পৃথিবীর কোন কোন দেশে লবণ প্রধানত খনি হইতে পাওয়া যায়। জার্মানীর **স্টাসফুর্ট লবণ ভাণ্ডার** (Stassfurt salt deposit) এবং পোল্যাণ্ডের উইলিস্কা (Wieliczka) লবণ-খনি বিশ্ববিখ্যাত। শেষোক্ত স্থানে মাটির নীচে একটি লবণ-শহর তৈয়ারী করিয়া রাখা হইয়াছে। সৈন্ধব লবণ নামে এক প্রকার লাল রংয়ের লবণ পাওয়া যায়, উহা প্রকৃত পক্ষে খনিজ লবণ।

সোডিয়াম ক্লোরাইডের ব্যবহার বহুবিধ. খাদ্য হিসাবে যাবতীয় প্রাণী লবণ ব্যবহার করে, কারণ হজম-ক্রিয়ায় পাকস্থলীতে যে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড সক্রিয় হয়, তাহার উৎস এই খাদ্য লবণ। মানুষ গড়ে যতখানি লবণ ব্যবহার করে তাহার পরিমাণ মাথাপিছু বৎসরে প্রায় দেড় সের হইবে। সোডিয়ামের যে-সকল যৌগিক বহু ব্যবহৃত, তাহার সবগুলি লবণ হইতে প্রস্তুত হয়। সোডিয়াম কার্বনেট (কাপড়কাচা সোডা), কস্টিক সোডা, সোডিয়াম সালফেট, ধাতব সোডিয়াম এ-সকল পদার্থ এই লবণ হইতেই উৎপন্ন হয়। ক্লোরিন বিরঞ্জক (bleaching agent) হিসাবে কাগজের কলে অথবা কাপড়ের কলে অপরিহার্য, এবং যাবতীয় ক্লোরিন অথবা ক্লোরিন সম্বলিত বিরঞ্জক এই খাদ্য লবণ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। পচন নিরোধক (preservative) হিসাবেও ইহা নগণ্য নহে।

B. সোডিয়াম কার্বনেট (Sodium carbonate):

কাপড় কাচার জন্য এই লবণ বহুপ্রচলিত। কাচ তৈয়ারী করিতে প্রচুর পরিমাণে বালি ও সোডিয়াম কার্বনেট প্রয়োজন হয়। সোডিয়াম কার্বনেট হইতে চুনের সাহায্যে কষ্টিক সোডা প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহার আরও নানা-প্রকার ব্যবহার রহিয়াছে।

সোডিয়াম কার্বনেট লবণজাতীয় পদার্থ। ইহার ধাতব পজিটিভ অংশ সোডিয়াম ধাতু এবং অ-ধাতব নেগেটিভ অংশ কার্বনেট কার্বনিক অ্যাসিড হইতে জাত। মৌলিক হিসাবে এই লবণের মধ্যে সোডিয়াম, কার্বন এবং অকসিজেন—এই তিনটি উপাদান বর্তমান।

সোডিয়াম কার্বনেটের উৎপাদন বৃহৎ শিল্পের (large-scale industries) অন্তর্গত। পশ্চিম ভারতের মিঠাপুরে (গুজরাট) এই লবণের একটি বিরাট কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহার প্রস্তুত প্রণালী অ্যামোনিয়া-সোডা-পদ্ধতি অথবা ইহার আবিষ্কর্তা আর্নেস্ট সল্‌ভের নামানুযায়ী সল্‌ভে-পদ্ধতি নামে পরিচিত। ইহাতে **সাধারণ লবণ, অ্যামোনিয়া** এবং **চুনাপাথর**—এই তিনটি কাঁচামালের প্রয়োজন হয়। লবণের সংপৃক্ত দ্রবণ **ব্রাইন** (brine) প্রস্তুত করিয়া উহার মধ্য দিয়া অ্যামোনিয়া গ্যাস চালাইয়া ঐ ব্রাইনকে অ্যামোনিয়া সংপৃক্ত করিয়া লওয়া হয়। এই দ্রবণকে অ্যামোনিয়া-ব্রাইন (ammonia brine) বলে। লোহার পাতে তৈয়ারী একটা খুব উঁচু মোটা চিমনির মত স্তম্ভের মধ্যে অনেকগুলি সচ্ছিদ্র সমান্তরাল শেল্‌ফ থাকে, এই স্তম্ভের উপর দিক হইতে অ্যামোনিয়া-ব্রাইন ঢালিয়া দিলে উহা গড়াইয়া শেল্‌ফ হইতে শেল্‌ফে নীচের দিকে নামিতে থাকে এবং ঐ একই সময়ে ঐ স্তম্ভের তলা হইতে কার্বন ডাই-অক্‌সাইড গ্যাস ছাড়িয়া দেওয়া হয়। ইহাতে শেল্‌ফে শেল্‌ফে কার্বন ডাই-অক্‌সাইডের
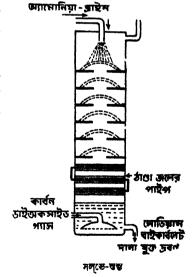
সল্‌ভে-স্তম্ভ

সহিত অ্যামোনিয়া-ব্রাইনের নিবিড় সংযোগ ঘটে এবং ফলে সোডিয়াম বাই-কার্বনেট নামক লবণের দানা নিম্নগামী দ্রবণের মধ্যে পৃথক্‌. হইতে থাকে। সল্‌ভে-স্তম্ভের তলায় যে দ্রবণ জমে, তাহা সোডিয়াম বাই-কার্বনেটের দানায় পূর্ণ থাকে। অতঃপর ঐ দ্রবণ ভ্যাকুয়াম-ফিল্টারে ছাঁকিয়া লইলে যে সোডিয়াম বাই-কার্বনেট পাওয়া গেল, তাহা বদ্ধপাত্রে উত্তপ্ত করিলে উহা সোডিয়াম কার্বনেটে (soda ash) পরিণত হয়। বদ্ধপাত্র হইতে কার্বন ডাই-অক্‌সাইড বাহির হইয়া যায় এবং উহা পুনরায় সল্‌ভে-স্তম্ভে ব্যবহার করা হয়। ভ্যাকুয়াম ফিল্টার হইতে যে পরিস্রুত দ্রবণ (filtrate) পাওয়া যায়, তাহার মধ্যে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড নামক লবণ থাকে। ইহার সহিত চুন মিশাইয়া স্টীমের সাহায্যে গরম করিলে অ্যামোনিয়া উৎপন্ন হয়। এই অ্যামোনিয়াই পুনরায় অ্যামোনিয়া-ব্রাইন তৈয়ারী করার জন্য ব্যবহৃত হয়।

কয়েকটি চুন-পোড়ানো চুল্লীতে (lime kilns) চুনাপাথর কয়লার সাহায্যে পোড়াইয়া চুন এবং কার্বন ডাই-অক্‌সাইড প্রস্তুত করা হইতে থাকে। কার্বন ডাই-অক্‌সাইড সল্‌ভে-স্তম্ভে চলিয়া যায় এবং চুন অ্যামোনিয়া প্রস্তুতির কাজে লাগে। এই স্বয়ংসম্পূর্ণ পদ্ধতি আবিষ্কারের ফলে সোডিয়াম কার্বনেট পূর্বাপেক্ষা অনেক সুলভ হইয়াছে।

এই সাধারণ সোডা হইতে খাবার সোডা অথবা বিশুদ্ধ **সোডিয়াম বাই-কার্বনেট** প্রস্তুত করা যায়। সোডা বা সোডিয়াম কার্বনেট সংপৃক্ত দ্রবণ (saturated solution) প্রস্তুত করিয়া উহার মধ্য দিয়া কিছুক্ষণ কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস চালাইলে সোডিয়াম বাই-কার্বনেটের দানা পৃথক্ হইয়া যায়। উহা ছাঁকিয়া শুকাইয়া লইতে হয়। সোডিয়াম বাই-কার্বনেটের অপর একটি সাধারণ নাম **বেকিং সোডা** (baking soda)। পাউরুটি ফুলাইবার জন্য ময়দার লেইয়ের (paste) সহিত যে বেকিং-চূর্ণ (backing powder) মিশানো হয় তাহা প্রকৃতপক্ষে এই সোডিয়াম বাই-কার্বনেট এবং কিছু টার্টারিক অ্যাসিডের মিশ্রণ মাত্র। এই দুইটি পদার্থ জলে ভিজিয়া মিশিলে কার্বন ডাই-অক্‌সাইডের বুদ্‌বুদ্‌ উঠে। ময়দার লেইয়ের মধ্যে ছোট ছোট বুদ্‌বুদ্‌গুলি আবদ্ধ থাকে ; লেই উত্তপ্ত হইলে বুদ্‌বুদ্‌গুলি প্রসারিত হইয়া রুটিকে ফুলাইয়া তোলে। বেকিং সোডা বা সোডিয়াম বাই-কার্বনেটে সোডিয়াম, হাইড্রোজেন, কার্বন ও অক্সিজেন,—এই চারিটি মৌলিক উপাদান আছে।

C. **কস্টিক সোডা** (Caustic soda) :

ইহা অত্যন্ত তীব্র ক্ষার পদার্থ। সাবান প্রস্তুত করিবার জন্য ইহা এত প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয় যে, ইহার প্রস্তুতি ভারী শিল্পের (heavy industries) অন্তর্গত। ইহার দুইটি প্রস্তুতি-পদ্ধতি সাধারণত প্রচলিত আছে :

(ক) **সোডিয়াম কার্বনেট হইতে ;**

(খ) খাদ্য লবণ বা সোডিয়াম ক্লোরাইড হইতে।

প্রথম পদ্ধতিতে **সোডিয়াম কার্বনেট** (কাপড়কাচা সোডা) জলে গুলিয়া লইয়া উহার সহিত উপযুক্ত পরিমাণে **চুন** মিশাইয়া ঐ মিশ্রণ স্টীমের সাহায্যে ফুটাইতে হয়। রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে ঐ দ্রবণে কস্টিক সোডা উৎপন্ন হয়। তখন উহা ঠাণ্ডা করিয়া ছাঁকিয়া লইলে পরিষ্কার দ্রবণে কস্টিক সোডা থাকে। উহাকে উত্তাপে ঘন করিয়া উপযুক্ত পাত্রে ঢালিয়া রাখিলে উহা ঠাণ্ডা হইলে শক্ত হইয়া যায়। বড বড় চাঙডের আকারে, অথবা বেলনের আকারে, অথবা পাতলা চোকলার আকারে উহা বাজারে বিক্রয় হয়।

অপর পদ্ধতিতে খাদ্য লবণের সংপৃক্ত দ্রবণ **ব্রাইন** (brine) হইতে **তড়িৎ-বিশ্লেষণের সাহায্যে** উহা প্রস্তুত করা হয়। তড়িৎ-শক্তি সুলভ হইলে এই পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়।

ব্রাইনকে তড়িৎ-বিশ্লেষণ (electrolysis of brine) করার জন্য নানাপ্রকার সেল প্রচলিত আছে। **নেলসন সেলে** ডোঙ্গার মত একটি সচ্ছিদ্র স্টীলের পাতে প্রস্তুত পাত্রের ভিতর দিকটা অ্যাস্‌বেস্‌টসের পরদা (asbestos fabric) দিয়া মোড়া থাকে এবং উহার মধ্যে পরিষ্কার ব্রাইন একটি পাইপ দিয়া অবিরাম আসিতে থাকে। অ্যাসবেস্‌টস্ চুয়াইয়া ব্রাইন বাহির হইয়া আসে এবং ফোঁটা ফোঁটা বাহিরের পাত্রে জমে। পাত্রের মাঝখানে কয়েকটি কার্বনের দণ্ড ব্রাইনের মধ্যে ডুবানো থাকে। এই দণ্ডগুলি ব্যাটারীর পজেটিভের সহিত এবং স্টীলের সচ্ছিদ্র পাত্রটি নেগেটিভের সহিত জুড়িয়া দিলে কার্বন দণ্ডের গায়ে ক্লোরিন গ্যাস উঠিতে থাকে এবং ঐ গ্যাস মাঝখানে উপরের নির্গমদ্বার দিয়া বাহির হইয়া যায়। যে-দ্রবণ চুয়াইয়া নীচে জমে, তাহার মধ্যে কস্টিক সোডা থাকে।

এই দ্রবণকে উত্তাপে বাষ্পীভূত করিলে ক্রমে উহার অন্তর্গত লবণ দানার আকারে পৃথক হইয়া যায় এবং অবশিষ্ট দ্রবণে কষ্টিক সোডা থাকে। লবণ সরাইয়া ফেলিয়া দ্রবণকে শুকাইয়া জলহীন করিয়া ফেলিলে কষ্টিক সোডা পাওয়া যায়।
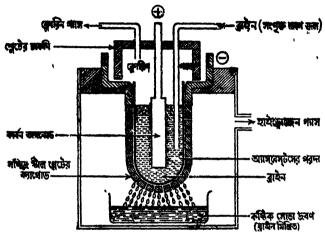
নেলসন সেল

প্রত্যেকটি মানুষই অল্পবিস্তর সাবান ব্যবহার করে, ইহা ভাবিয়া দেখিলেই একটা দেশে কত সাবান লাগে, বুঝিতে পারা যায়। সাবান প্রস্তুতিতে কষ্টিক সোডা অপরিহার্য। ইহা ছাড়া কাগজশিল্পে, বস্ত্রশিল্পে, পেট্রলিয়াম শোধনে এবং সোডিয়াম ধাতু উৎপাদনে কষ্টিক সোডা ব্যবহৃত হয়।

D. হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড (Hydrochloric acid) :

পরীক্ষা 13. একটি ফ্লাস্কে আনুমানিক 25 গ্রাম খাদ্য লবণ নিয়া উহা ছবি অনুযায়ী নির্গম নল, ওয়াশ বোতল ও গ্যাসজারের সহিত সংযুক্ত কর। ফানেলের মধ্য দিয়া ফ্লাস্কে গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিড (আনুমানিক 15 c.c.) ঢালিয়া দাও। লবণের সহিত সালফিউবিক অ্যাসিডের বিক্রিয়ায় হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড গ্যাস উঠিতে থাকিবে। ওয়াশ বোতলে গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিড আছে। গ্যাস উহার মধ্য দিয়া বাহির হইতে গিয়া আর্দ্রতাহীন হইয়া যাইবে এবং শুষ্ক গ্যাস গ্যাসজারে জমিবে। বায়ু অপেক্ষা

ভারী বলিয়া গ্যাস বায়ুকে উপর দিকে বাহির করিয়া দিয়া গ্যাসজারে সঞ্চিত হইবে। গ্যাসের উৎপাদন কমিয়া গেলে ফ্লাস্ক গরম কর।

হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড গ্যাস বর্ণহীন ও জলে অত্যন্ত বেশি দ্রাব্য। উহার জলীয় দ্রবণের নাম হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড। পরীক্ষাগারে অ্যাসিড

হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড প্রস্তুত প্রণালী
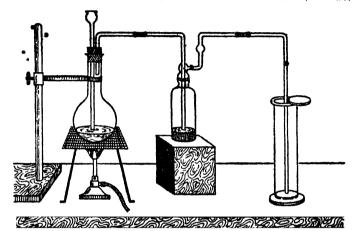
হিসাবে ইহা সর্বদা ব্যবহৃত হয়। গাঢ়তম অ্যাসিডে শতকরা 40 ভাগের বেশি অ্যাসিড থাকে না।

হাইড্রোজেন ও ক্লোরিন, এই দুই মৌলিক গ্যাসের মিলনে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড গ্যাস গঠিত। দুইটি গ্যাসজারে হাইড্রোজেন ও ক্লোরিন পৃথক্‌ভাবে লইয়া যদি একটি অপরটির উপর উপুড় করিয়া রাখিয়া দিবালোকে মিশিতে দেওয়া যায়, তবে উক্ত দুই গ্যাস মিলিত হইয়া হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড গ্যাসে পরিণত হইবে।

হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড গ্যাসের দ্রাব্যতা ও অ্যাসিড ধর্ম নিম্নলিখিত উপায়ে পরীক্ষা করা যায়।

পরীক্ষা 14. একটি ফ্লাস্ক হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড গ্যাসে পূর্ণ কর এবং উহার মুখে কর্ক আঁটিয়া দাও। কর্কের মাঝখানে যেন একটি কাচের নল লাগানো থাকে। একটি বীকারে নীল লিটমাস মিশানো অনেকখানি জল লও এবং ফ্লাস্কের কাচের নল উহার মধ্যে ডুবাইয়া ধর। দেখিবে, ধীরে ধীরে লিটমাস জল উপরে উঠিয়া নলের মাথায়

পৌঁছিবামাত্র ফোয়ারার মত উৎক্ষিপ্ত হইবে এবং নীল লিটমাস লাল হইয়া যাইবে। জানা গেল, ঐ গ্যাস জলে খুবই দ্রাব্য এবং সেই দ্রবণ অ্যাসিড-ধর্মী।
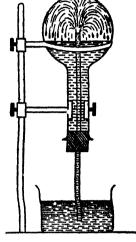
ফোয়ারা পরীক্ষা

অ্যামোনিয়ার সহিত মিলিত হইলে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড নামক লবণ উৎপাদন করে, কারণ অ্যামোনিয়া একটি ক্ষারক। বাষ্পাকারে থাকিলে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড ঘন সাদা ধোঁয়ার মত (dense white fumes) দেখায়।

পরীক্ষা 15. একটি পরীক্ষানলে অ্যামোনিয়ার দ্রবণ লও। একটি কাচের রড ঘন হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডে ডুবাইয়া লইয়া উহা র মুখে ধর। ঘন সাদা ধোঁয়া দেখিতে পাইবে।

বিভিন্ন ধাতব ক্লোরাইড প্রস্তুতিতে, নানাপ্রকার ঔষধে এবং সকল পরীক্ষাগারে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড ব্যবহৃত হয়।

3. নাইট্রোজেন-চক্র (Nitrogen cycle)

আমাদের কর্মশক্তি বজায় রাখিবার জন্য এবং শরীরের ক্ষয় পূরণের জন্য আমরা প্রোটিন জাতীয় খাদ্য গ্রহণ করি। প্রোটিন একপ্রকার নাইট্রোজেন-ঘটিত পদার্থ। বাতাসে নাইট্রোজেন থাকিলেও কোন প্রাণীই বাতাস হইতে নাইট্রোজেন আত্তীকরণ (assimilation) করিতে পারে না। প্রাণী তাহার প্রয়োজনীয় নাইট্রোজেন উদ্ভিদের দেহ হইতে সংগ্রহ করে, কিন্তু উদ্ভিদ্ তাহার নিজ দেহে নাইট্রোজেন ঘটিত খাদ্য আপনিই প্রস্তুত করে। উদ্ভিদ এই নাইট্রোজেনের বেশীর ভাগই মাটি হইতে সংগ্রহ করে। যে-মাঠে ফসল ফলে সেখানকার মাটির নাইট্রোজেন ইহার ফলে ক্রমেই ফুরাইয়া যায় এবং জমি ক্রমে ঊষর হইয়া পড়ে। প্রাণীদেহ হইতে নিঃসৃত মলমূত্র প্রভৃতি পদার্থগুলি অথবা প্রাণী মরিয়া গেলে তাহার দেহাবশেষ যদি মাটিতে ফিরিয়া আসে, তবে মাটির উর্বরতা তত নষ্ট হয় না। অথবা মাটিতে যে-গাছ জন্মে, তাহার দেহও

যদি মাটিতে ফিরাইয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলেই মাটির উর্বরতা রক্ষা হয়। মাটি উষর হইলে মাটিতে সার দিতে হয়। অ্যামোনিয়াম সালফেট, সোডিয়াম নাইট্রেট, ক্যালসিয়াম নাইট্রেট, অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট, ইউরিয়া প্রভৃতি কৃত্রিম সার অথবা লতা-পাতা-আবর্জনা, গোবর-মল-মূত্র, কসাইখানার রক্ত-মাংস প্রভৃতি জৈব সার জমিতে ছড়াইয়া দিলে জমি আবার উর্বর হয়। অবশ্য শিম জাতীয় কতকগুলি গাছের শিকড়ে এক রকম ব্যাকটিরিয়া বা জীবাণু থাকে, যাহারা বাতাস হইতে কিছু নাইট্রোজেন আত্মসাৎ করিয়া ঐ গাছের দেহে সঞ্চয় করে। এই জাতীয় গাছকে লেগুমিনাস (leguminous) গাছ বলে। মাটির কোন কোন ব্যাক্‌টিরিয়াও আপন দেহ পুষ্টির জন্য বাতাস হইতে নাইট্রোজেন আত্তীকরণ (assimilation) করে এবং মাটিতেই থাকে
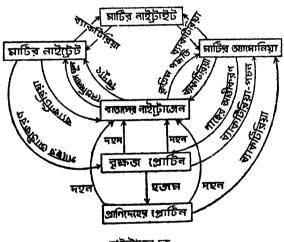
নাইট্রোজেন-চক্র

বলিয়া নাইট্রোজেন যোগায়। আকাশে যখন বিদ্যুৎ চমকায়, তখন সেই প্রচণ্ড তাপে বাতাসের কিছু নাইট্রোজেন ও অক্‌সিজেন মিলিত হয় এবং বৃষ্টির জলের সহিত নাইট্রিক অ্যাসিডরূপে পৃথিবীর মাটিতে পৌছে। তবে বর্তমান কালে মাটিতে নানাপ্রকার কৃত্রিম সার দিয়াই আমরা জমির উর্বরতা রক্ষা করি। কোন জৈব অথবা অজৈব সারের মারফত মাটিতে অ্যামোনিয়া দিলে উহা নানাপ্রকার ব্যাক্‌টিরিয়ার সাহায্যে সোডিয়াম, পটাসিয়াম প্রভৃতি ধাতুর নাইট্রাইট এবং পরে নাইট্রেটে পরিণত হইয়া গাছের খাদ্যের উপযোগী হয়।

অবশ্য এমন ব্যাক্‌টিরিয়াও মাটিতে আছে, যাহারা মাটির নাইট্রেট, নাইট্রাইট অথবা অ্যামোনিয়াকে নষ্ট করিয়া নাইট্রোজেনে পরিণত করিয়া বাতাসে ছাড়িয়া দিতেছে এবং আমাদের ক্ষতি করিতেছে। তবে তাহার পরিমাণ অনেক কম। নাইট্রোজেন-ঘটিত উদ্ভিদ্ অথবা প্রাণীর দেহ যখন পুড়িয়া যায়, তখনও অনেকখানি নাইট্রোজেন মুক্ত হইয়া বাতাসে মিলাইয়া যায়। বাতাস হইতে নাইট্রোজেনের মাটিতে, উদ্ভিদে ও প্রাণীতে প্রবেশ এবং সেই সকল স্থান হইতে আবার নাইট্রোজেনের বাতাসে ফিরিয়া যাওয়ায় এই যে অবিরাম আবর্তন চলিতেছে, ইহাকে **নাইট্রোজেন চক্র** বলে।

উদ্ভিদের খাদ্য হিসাবে জমিতে যে সকল মৌলিক পদার্থ থাকা প্রয়োজন তন্মধ্যে নাইট্রোজেন, ফসফরাস, পটাসিয়াম, ক্যালসিয়াম, বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মাটিতে নাইট্রোজেনের অভাব দূর করিবার জন্য কৃত্রিম সার হিসাবে কৃষিকার্যে অ্যামোনিয়াম সালফেট, অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট, ইউরিয়া, সোডিয়াম নাইট্রেট, ক্যালসিয়াম নাইট্রেট প্রভৃতির সার ব্যবহৃত হয়।
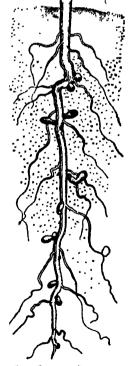
শিম জাতীয় উদ্ভিদমূলে গুটি (nodules)

পূর্বে বলা হইয়াছে শিম-জাতীয় কতকগুলি উদ্ভিদ (leguminous plants) বায়ু হইতে সরাসরি নাইট্রোজেন আত্মসাৎ করিতে পারে। ঐ সকল উদ্ভিদের মূলে একপ্রকার গুটি (nodules) জন্মে। ঐ গুটির মধ্যে রিজোবিয়াম র‍্যাডিসিকোলা নামক এক জাতীয় ব্যাক্‌টিরিয়া বা জীবাণু বাস করে। উহারা বায়ু হইতে নাইট্রোজেন অণু (molecule) গ্রহণ করিয়া গুটির মধ্যে নাইট্রোজেন-ঘটিত পদার্থ (nitrogenous compounds) প্রস্তুত করে। এই কার্যের বিনিময়ে ঐ জীবাণু গাছের দেহ হইতে কার্বোহাইড্রেট গ্রহণ করিয়া নিজেদের জীবন রক্ষা করে। কলাই, মটর, ধঞ্চে প্রভৃতি গাছ এইরূপ শিমজাতীয় উদ্ভিদ্ বলিয়া ইহাদের মূল মাটিতে নাইট্রোজেনের যোগান দেয়।

ফসলের আবর্তন (Rotation of crops) :

আমাদের দেশে অগ্রহায়ণ-পৌষ মাসে জমি হইতে ধান উঠিয়া গেলে জমিতে কলাই বুনিয়া দিতে দেখা যায়। কোথাও ধঞ্চে, মটর, অড়হর প্রভৃতি অন্যান্য শিমজাতীয় গাছও জন্মানো হইয়া থাকে। ক্রমে ঐ সকল গাছ বড় হইয়া ফুলে ফলে পুর্ণ হইয়া উঠে। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে যখন আবার ধানচাষের সময় উপস্থিত হয় তখন ঐ সকল গাছ লাঙ্গলের সাহায্যে মাটির সহিত মিশাইয়া দেওয়া হয়। এইরূপে জমিতে আপনা-আপনি নাইট্রোজেনের অভাব দূর হয়। বৃক্ষ দেহ দ্বারা যে-সার প্রস্তুত হয় তাহাকে **সবুজ সার** বলে। কোন জমিতে সর্বদা একই ফসল না ফলাইয়া বিভিন্ন ফসল পর্যায়ক্রমে ফলাইলে জমির উর্বরতা রক্ষিত হয়।

4. সার (Fertilizer)

অ্যামোনিয়াম সালফেট (Ammonium sulphate) :

উৎপাদন—কাঁচা কয়লা হইতে প্রবল উত্তাপে প্রায় 1200°—1300° সে. উষ্ণতায় যে-সকল গ্যাস বাহির হইয়া আসে, তাহার মধ্যে অল্প পরিমাণ (প্রায় 0·1%) অ্যামোনিয়া থাকে। ঐ গ্যাস বিশুদ্ধ করিবার সময় যে-সকল উপজাত দ্রব্য (by-product) পাওয়া যায়, অ্যামোনিয়া তাহাদের মধ্যে একটি। গ্যাস হইতে আলকাতরা ইত্যাদি জমাইয়া সরাইয়া লওয়ার পর ঐ গ্যাস সালফিউরিক অ্যাসিডের মধ্য দিয়া চালনা করিলে উহার অ্যামোনিয়া সালফিউরিক অ্যাসিডের সহিত মিলিত হইয়া অ্যামোনিয়াম সালফেটে পরিণত হয়। অ্যামোনিয়াম সালফেটের দ্রবণ ঘন করিলে উহার দানাগুলি পৃথক হইয়া যায়। অ্যামোনিয়াম সালফেট জমির সার হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

ভারতবর্ষ স্বাধীন হইবার পর ভারতের খাদ্য-সমস্যা বিশেষভাবে আমাদের শাসন-কর্তৃপক্ষের মনোযোগ আকর্ষণ করে। ভারতীয় জমির উৎপাদিকা শক্তি যে দীর্ঘকাল ধরিয়া ক্রমেই কমিয়া আসিতেছে, এই সিদ্ধান্তের ফলে দেশে সুবৃহৎ সার-উৎপাদনের কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইতে থাকে ; তন্মধ্যে সিন্ধ্রির কারখানা সুবিখ্যাত। এখানে বর্তমানে প্রতিদিন প্রায় এক হাজার টন

অ্যামোনিয়াম সালফেট প্রস্তুত হইতেছে। সিন্ধ্রিতে অ্যামোনিয়াম সালফেট উৎপাদনে যে-সকল কাঁচামাল ব্যবহৃত হয় তাহা এই :

(ক) কোক কয়লা (coke),

(খ) বাতাস,

(গ) জল স্টীমরূপে,

(ঘ) জিপসাম নামক খনিজ, ইহার রাসায়নিক নাম ক্যালসিয়াম সালফেট।

কোক 1000°—1200° সে.-এ উত্তপ্ত করিয়া উহার মধ্য দিয়া **বাতাস** ও **স্টীম** চালনা করিলে নাইট্রোজেন, হাইড্রোজেন ও কার্বন মনক্সাইডের গ্যাস-মিশ্রণ পাওয়া যায়। এই গ্যাস-মিশ্রণের সহিত বেশী পরিমাণ স্টীম মিশাইয়া সেই মিশ্রণকে ফেরিক অকসাইড+ক্রোমিক অক্সাইড অনুঘটকের (catalysts) সাহায্যে নাইট্রোজেন-হাইড্রোজেন-কার্বন ডাই-অক্সাইড মিশ্রণে পরিণত করা হয়। এই মিশ্রণকে জলের সহিত উচ্চচাপে মিশাইলে কার্বন ডাই-অক্সাইড জলে দ্রবীভূত হইয়া যায় এবং নাইট্রোজেন ও হাইড্রোজেনের মিশ্রণ পাওয়া যায়। পদ্ধতিটি এমন ভাবে চালানো হয়, যাহাতে এই নাইট্রোজেন-হাইড্রোজেন মিশ্রণে আয়তন হিসাবে প্রতি একভাগ নাইট্রোজেনের সহিত তিনভাগ হাইড্রোজেন মিশ্রিত থাকে। এই দুইটি গ্যাসকে রাসায়নিক সংযোগে আনিতে পারিলেই **অ্যামোনিয়া গ্যাস** উৎপন্ন হইবে।

আমাদের বায়ুমণ্ডলের চাপ প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে 14·7 পাউণ্ড এবং এই চাপকে আমরা এক বায়ুমণ্ডলীয় চাপ (one atmospheric pressure) বলি। উপরোক্ত নাইট্রোজেন-হাইড্রোজেন মিশ্রণ ইহার প্রায় 350 গুণ চাপে (pressure of 350 atmospheres) থাকে। একটি সুদৃঢ় স্টীল-নির্মিত বেলনাকৃতি (cylindrical) যন্ত্রের মধ্যে বিশেষভাবে প্রস্তুত লৌহ-অনুঘটক (iron catalyst) প্রায় 500° সে. উষ্ণতায় রাখা হয়, উহার মধ্য দিয়া ঐ নাইট্রোজেন-হাইড্রোজেন মিশ্রণ চালাইলে মিশ্রণের শতকরা 12/14 ভাগ অ্যামোনিয়ায় পরিণত হইয়া যায়। ইহার উষ্ণতা কমাইলে অ্যামোনিয়া গ্যাসীয় অবস্থা হইতে তরল অবস্থায় পরিণত হইয়া পৃথক্ হইয়া যায়। অবশিষ্ট নাইট্রোজেন-হাইড্রোজেন মিশ্রণ ফিরিয়া গিয়া পুনরায় অনুঘটক যন্ত্রে প্রবেশ করে। নাইট্রোজেন এবং হাইড্রোজেনের সম্মিলনে অ্যামোনিয়া প্রস্তুতির এই পদ্ধতি **হাবার-বশ পদ্ধতি** (Haber-Bosch process) নামে পরিচিত।

তরল **অ্যামোনিয়া** জলে মিশাইয়া তাহার সহিত কার্বন ডাই-অক্সাইড হিসাবমত মিশাইলে অ্যামোনিয়াম কার্বনেট* প্রস্তুত হয়। **কার্বন ডাই-অক্সাইড** নূতন করিয়া প্রস্তুত করিতে হয় না, গোড়ার দিকে নাইট্রোজেন-হাইড্রোজেন মিশ্রণ প্রস্তুত করিবার সময় উহা উপজাত হিসাবে পাওয়া যায়। উক্ত অ্যামোনিয়াম কার্বনেট দ্রবণের সহিত **জিপসামের** চূর্ণ মিশাইয়া নাড়িলে অ্যামোনিয়াম সালফেট উৎপন্ন হয়।

অ্যামোনিয়াম কার্বনেট + ক্যালসিয়াম সালফেট = অ্যামোনিয়াম সালফেট + ক্যালসিয়াম কার্বনেট।

ক্যালসিয়াম কার্বনেট জলে অদ্রাব্য থাকিয়া যায় এবং ছাঁকিয়া লইলে অ্যামোনিয়াম সালফেটের দ্রবণ পাওয়া যায়। ঐ দ্রবণ উত্তাপে ও নিম্নচাপে ঘন করিলে অ্যামোনিয়াম সালফেটের দানাগুলি পৃথক্ হইয়া যায়। উহা ছাঁকিয়া শুকাইয়া চালান দেওয়া হয়। উপজাত হিসাবে যে ক্যালসিয়াম কার্বনেট পাওয়া যায়, তাহা সিমেণ্ট প্রস্তুতির একটি প্রধান উপকরণ।

অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট (Ammonium nitrate):

এই লবণটি যৌগিক হিসাবে অস্থায়ী (unstable) এবং বিস্ফোরক। জমির সার হিসাবে উহা প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। সার হিসাবে ব্যবহার করিবার সময় ইহার সহিত কিছু ক্যালসিয়াম কার্বনেট মিশাইয়া দেওয়া হয়।

গাঢ় নাইট্রিক অ্যাসিড (প্রায় 40%) অ্যামোনিয়াম গ্যাস দ্বারা প্রশমিত করিয়া লইয়া উহা স্টীলের পাত্রে ঘন করিয়া লইলে অ্যামোনিয়াম নাইট্রেটের দানা পৃথক হইয়া যায়। দানাগুলি উদগ্রাহী (deliquescent)। যাহাতে ঢেলা পাকাইয়া না যায়, তজ্জন্য সামান্য পরিমাণে ভেসলিনের সহিত মিশাইলে উহার দানাগুলি গায়ে গায়ে লাগিতে পারে না।

5. **চুন** (Lime)

চুন সর্বাপেক্ষা সুলভ ক্ষারক পদার্থ বলিয়া ইহার ব্যবহার বহুব্যাপ্ত। বাড়ি তৈয়ারী করিবার জন্য বালি অথবা সুরকির সহিত চুন মিশাইয়া প্লাস্টার প্রস্তুত করা হয়। ভিজা চুনের (slaked lime) সহিত ক্লোরিনের ক্রিয়ায় ব্লিচিং পাউডার বা বিরঞ্জক চূর্ণ প্রস্তুত হয়। কস্টিক সোডা প্রস্তুত করিতে

সোডিয়াম কার্বনেটের সহিত চুনের রাসায়নিক ক্রিয়ার প্রয়োজন হয়। খর জল (hard water) মৃদু করিবার জন্যও চুন ব্যবহার করিতে হয়। চামড়ার কারখানায় কাঁচা চামড়ার লোম তুলিবার জন্য চুন লাগে। ক্যালসিয়াম কার্বাইড প্রস্তুতিতে কলি-চুনের (quick lime) সহিত কয়লা মিশাইয়া বিদ্যুৎচুল্লীতে (electric furnace) গলাইয়া ফেলিতে হয়। ব্লাস্ট ফার্নেসে লোহা প্রস্তুত করিতে চুনাপাথর (lime stone) লাগে। **সিমেণ্ট** প্রস্তুতির একটি অপরিহার্য উপাদান চুনাপাথর। **মাটিতে** অ্যাসিড থাকিলে (acidic soil) মাটিতে চুনাপাথর গুঁড়া করিয়া ছড়াইয়া দেওয়া হয়। নানাপ্রকার বৃহৎ শিল্পে চুন অথবা চুনাপাথর ব্যবহারের ইয়ত্তা নাই।

যে-খনিজ হইতে চুন প্রস্তুত করা হয় তাহার নাম চুনাপাথর বা লাইম স্টোন (lime stone)। ধূসর রংয়ের এই পাথর ভারতবর্ষের নানা প্রদেশে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। চুনাপাথরের রাসায়নিক নাম ক্যালসিয়াম কার্বনেট। শামুক, ঝিনুক, শঙ্খ প্রভৃতি প্রাণীর দেহের শক্ত খোলা বস্তুত ক্যালসিয়াম কার্বনেট। ছোট বড় নানা আকারের প্রাণীর খোলা হইতে পৃথিবীর যাবতীয় ক্যালসিয়াম কার্বনেট উৎপন্ন হইয়াছে, পণ্ডিতেরা এইরূপ অনুমান করেন

চুন ক্যালসিয়াম অক্সাইড। ক্যালসিয়াম কার্বনেট উচ্চতাপে গরম করিলে বিশ্লিষ্ট হইয়া ক্যালসিয়াম অকসাইড (quick lime) ও কার্বন ডাই-অক্সাইডে পরিণত হয়। আমাদের দেশে পাহাড় অঞ্চলে (যেমন রাঁচি) স্থানীয় লোকেরা চুনের ভাটিতে চুন তৈয়ারী করে। চুনাপাথরের খণ্ডগুলি সাজাইয়া নীচ হইতে কয়লার আগুন দিলে পাথরগুলি চুনে পরিণত হয় এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড বাতাসে মিশিয়া যায়।

ক্যালসিয়াম কার্বনেট = **চুন** + কার্বন ডাই-অক্সাইড।

চুন প্রস্তুতি :

চুন তৈয়ারী করিবার জন্য যে-চুল্লী ব্যবহৃত হয়, তাহা দুই প্রকারের হইতে পারে : (ক) খাড়া কিল্‌ন্ (vertical lime kiln), (খ) অনুভূমিক ঘূর্ণন কিল্‌ন্ (horizontal rotary kiln)। কিল্‌ন্ বা চুল্লী যে-শ্রেণীরই হউক, উহাতে উপর হইতে চুনাপাথরের টুকরা বড় বড় হপারের মুখে ঢালিয়া দিলে

উহা চুল্লীর মধ্যে পড়ে। খাড়া চুল্লীগুলি দেখিতে বাহির দিকটা গম্বুজের মত। প্রায় 60 ফুট উঁচু এই চুল্লী অবিরাম (continuous) কাজ করিতে থাকে। পাশ হইতে কয়লার আগুন অথবা কোন গ্যাস বা তৈলের আগুন দীর্ঘ শিখারূপে (long flame) চুল্লীতে প্রবেশ করিবার পাথরগুলিকে উত্তপ্ত করে। উষ্ণতা 1000° সে.-এরও বেশী হয় এবং ঐ উষ্ণতায় ক্যালসিয়াম কার্বনেট ক্যালসিয়াম অকসাইডে বা চুনে পরিণত হয়। নীচ হইতে চুনের খণ্ডগুলি বাহির হইয়া যাইতে থাকে এবং উপরে পাশের নির্গম পথে কার্বন ডাই-অকসাইড বাহির হইয়া যায়।

চুনের কিল্ন
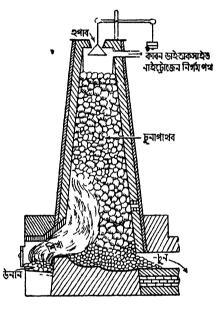
চুনাপাথরের টুকরা ছোট হইলে শোয়ানো ঘূর্ণন চুল্লী ব্যবহৃত হয়। বিরাট চিমনীর মত দেখিতে এই রোটারী বা ঘূর্ণন চুল্লীর উভয় প্রান্তে চুনাপাথর ঢালিয়া দিলে উহা গড়াইয়া নীচের দিকে নামিতে থাকে। সমস্ত চুল্লীটির ধীরে ধীরে $1\frac{1}{2}$ মিনিটে একবার আপন কক্ষের উপর ঘুরিতে থাকে। নীচের দিক হইতে কয়লার গুঁড়ার আগুন (coal dust flame) উপরের দিকে চলে ও চুনাপাথরকে বিশ্লিষ্ট করিয়া চুনে পরিণত করে। চুন নীচের প্রান্ত দিয়া বাহির হইয়া যায়। সিমেণ্টও এইরূপ ঘূর্ণন চুল্লীতে প্রস্তুত করা হয়।

চুন প্রস্তুতিতে কার্বন ডাই-অক্সাইড একটি প্রয়োজনীয় উপজাত পদার্থ কিন্তু সাধারণত উহা বাতাসে বাহির করিয়া দেওয়া হয়।

পরীক্ষা 16. একখণ্ড কলিচুন বাজার হইতে কিনিয়া আন। একখানি প্লেটের উপর উহা রাখিয়া উহার উপর আস্তে আস্তে জল ছিটাইতে থাক।

হিস্ হিস্ শব্দ করিয়া চুন হইতে ষ্টীম উঠিবে এবং চুনের খণ্ডটি জল শোষণ করিয়া আপনা-আপনি ফাটিয়া ভাঙিয়া পড়িবে এবং গুঁড়া চুনে পরিণত হইবে। এই গুঁড়া চুনকে **স্লেকড্ লাইম** (slaked lime) বলা হয়। বাড়ি তৈয়ারীতে অথবা ব্লিচিং পাউডার প্রস্তুত করিতে এই গুড়া চুন ব্যবহৃত হয়। ইহার রাসায়নিক নাম ক্যালসিয়াম হাইড্রকসাইড।

চুন + জল = ক্যালসিয়াম হাইড্রকসাইড।

কিছু বেশী জল দিয়া কাদার মত করিলে ঐ চুনকে মিল্ক অব লাইম (milk of lime) বলে। মিল্ক অব লাইম নানাপ্রকার শিল্পে ব্যবহৃত হয়। একটি বোতলে জল লইয়া উহার মধ্যে খানিকটা চুন মিশাইয়া রাখিয়া দিলে পরের দিন চুন তলানি পড়িয়া গেলে উপরে যে পরিষ্কার জল জমে, তাহাকে চুনের জল (lime water) বলে। ঔষধ হিসাবে চুনের জল ব্যবহার করা হয়। চুনের জলের ভিতর দিয়া কার্বন ডাই-অকসাইড গ্যাসের বুদ্বুদ ছাড়িলে জল ঘোলা হইয়া যায়। কার্বন ডাই-অকসাইড গ্যাসের ইহা একটি পরীক্ষা।

পরীক্ষা 17. একটি পরীক্ষা নলে কয়েক টুকরা মার্বল পাথর লইয়া উহার মধ্যে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড ঢাল। দেখিবে, উহার মধ্যে কার্বন ডাই-অকসাইড গ্যাস উৎপন্ন হইতেছে। খুব তাড়াতাড়ি উহার মুখে একটি কর্ক আঁটিয়া দাও। কর্কের মধ্যে একটি নির্গম নল আগে হইতে বসানো থাকিবে। একটি বীকারে খানিকটা পরিষ্কার চুনের জল লও এবং প্রথম পরীক্ষা নল হইতে নির্গম নলের সাহায্যে কার্বন ডাই-অকসাইড গ্যাস ঐ চুনের জলের মধ্য দিয়া চালিত কর। চুনের জল ঘোলা হইয়া যাইবে এবং বেশিক্ষণ কার্বন ডাই অকসাইড চালিত করিলে ঐ ঘোলা চুনের জল আবার পরিষ্কার হইয়া যাইবে।

কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাসের পরীক্ষা

চুনের জলের রাসায়নিক নাম ক্যালসিয়াম হাইড্রকসাইড। কার্বন ডাই-অকসাইডের সহিত বিক্রিয়ায় প্রথমে যে ক্যালসিয়াম কার্বনেট উৎপন্ন

হয় তাহা জলে অদ্রাব্য, কাজেই চুনের জল ঘোলা হইয়া পড়ে। অতঃপর আরো কার্বন ডাই-অকসাইড চালিত হইতে থাকিলে ঐ অদ্রাব্য কার্বনেট ক্রমে ক্যালসিয়াম বাই-কার্বনেটে পরিণত হয়। এই বাই-কার্বনেট জলে দ্রাব্য, সুতরাং চুনের জল আবার নির্মল দেখায়। কিন্তু এই নির্মল জল আগুনে ফুটাইলে উহা হইতে কার্বন ডাই-অকসাইড গ্যাস বাহির হইয়া যায় এবং নির্মল জল আবার ঘোলা হইয়া পড়ে।

ক্যালসিয়াম হাইড্রকসাইড + কার্বন ডাই-অকসাইড
= ক্যালসিয়াম কার্বনেট ↓ (জলে অদ্রাব্য সাদা পদার্থ)

ক্যালসিয়াম কার্বনেট + কার্বন ডাই অকসাইড + জল
= ক্যালসিয়াম বাই কার্বনেট (জলে দ্রাব্য)

উত্তাপ
ক্যালসিয়াম বাই কার্বনেট ⟶ কার্বন ডাই অকসাইড ↑
+ ক্যালসিয়াম কার্বনেট ↓ (জলে অদ্রাব্য)

চক (Chalk):

চক এবং চুনাপাথর আসলে এক রকম ছোট ছোট সামুদ্রিক প্রাণীর দেহের উপরকার খোলা (shell)। ঐ প্রাণীর নাম ফোরামিনিফেরা (foraminifera)। উহারা ঝাঁকে ঝাঁকে সমুদ্রের বুকে ভাসিয়া বেড়ায়। মরিয়া গেলে উহাদের দেহগুলি সমুদ্রের তলায় এক বিস্তৃত স্তরের সৃষ্টি করে। ঐরূপ স্তরকে উজ্ (ooze) বলে। লক্ষ লক্ষ বৎসরের ভূত্বকের বিবর্তনে ঐ স্তরের উপর অন্যান্য শিলাস্তর জমিলে সেই চাপে উহা জমাট বাঁধিয়া চকে পরিণত হয় এবং আরো বেশী চাপে পড়িলে উহা চুনাপাথরে (lime stone) পরিণত হয় এবং ভূত্বকের ওঠানামায় সমুদ্রতল একদা পাহাড়ে পরিণত হয়। চক ও চুনাপাথর মূলত একই পদার্থ। চক পোড়াইলেও চুন পাওয়া যায়, কারণ ইহাও ক্যালসিয়াম কার্বনেট।

সাদা রং হিসাবে চক (whiting) ব্যবহৃত হয়। আমরা বর্তমানে যে চক দিয়া লিখি, তাহার নাম ক্রেয়ন (crayon)। জিপসাম (gypsum) নামক একপ্রকার সাদা খনিজ হইতে ইহা প্রস্তুত হয়। লাল, হলুদে, নীল প্রভৃতি নানা রংয়ের ক্রেয়ন প্রস্তুত করা হয়। জিপসাম পদার্থটি ক্যালসিয়াম সালফেট।

6. খর জল ও মৃদু জল—খরতা দূর করিবার উপায়

(Hard water and soft water—method of softening water)

যে-জলে সাবান ঘষিলে সহজে ফেনা হয় না, তাহাকে **খড় জল** বলে। খর জল শুধুই যে কাপড় কাচার পক্ষে অনুপযোগী তাহা নহে, এঞ্জিনে যে-জল স্টীম প্রস্তুত করার জন্য ব্যবহৃত হয় তাহাও খর হইলে এঞ্জিনের বয়লার সহজে নষ্ট হইয়া যায়। পানীয় জল ঈষৎ খর হইলে কোন ক্ষতি হয় না, কিন্তু খরতা বেশি হইলে উহা স্বাস্থ্যের পক্ষে অনিষ্টকর।

কোন কোন খর জল ফুটাইয়া লইলে উহার খরতা দূর হয় এবং সেইরূপ খরতাকে **অস্থায়ী খরতা** (temporary hardness) বলে। ক্যালসিয়াম বাই-কার্বনেট অথবা ম্যাগনেশিয়াম বাই কার্বনেট জলে দ্রবীভূত থাকিলে জল খর হয় কিন্তু ফুটাইলে ঐ বাই-কার্বনেট ভাঙিয়া গিয়া অদ্রাব্য কার্বনেটে পরিণত হয় এবং থিতাইতে দিলে তলানি পড়িয়া যায়। ফুটানো ছাড়াও এই প্রকার অস্থায়ী খরতা চুনের সাহায্যে দূর করিতে পারা যায়। হিসাব মত চুনের গোলা মিশাইয়া রাখিলে ক্যালসিয়াম কার্বনেট ও ম্যাগনেশিয়াম হাইড্রক্সাইড তলানি পড়িয়া যায় এবং উপরের জল সম্পূর্ণরূপে মৃদু হইয়া যায়।

জলে ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেশিয়াম ধাতুর ক্লোরাইড ও সালফেট দ্রবীভূত থাকিলে উহা খর হয়। ফুটাইলে এ জলের কোন পরিবর্তন হয় না বলিয়া এ খরতাকে **স্থায়ী খরতা** (permanent hardness) বলা হয়। এরূপ জলের সহিত পরিমাণ মত চুন ও সোডা মিশাইয়া রাখিলে ক্যালসিয়াম কার্বনেট এবং ম্যাগনেশিয়াম হাইড্রক্সাইড তলানি পড়িয়া যায়। পরিষ্কার জল উপর হইতে সরাইয়া লইলে মৃদুজল পাওয়া যায়। স্থায়ী খরতা দূর করিবার এই পদ্ধতিকে **চুন-সোডা-পদ্ধতি** (lime-soda-process) বলে।

পরীক্ষা 18 একটি বীকারে খানিকটা চুনের জল লইয়া উহার মধ্য দিয়া কার্বন ডাই-অক্সাইড চালাইতে থাক। চুনের জল প্রথমে ঘোলা হইয়া পরে পরিষ্কার হইয়া যাইবে। এই জলে ক্যালসিয়াম বাই-কার্বনেট দ্রবীভূত থাকায় ইহা খর জল। এই জলে সাবান ঘষিয়া দেখ উহাতে ফেনা হইবে না।

অতঃপর ঐ পরিষ্কার জল কিছুক্ষণ ফুটাইয়া লও। জল আবার ঘোলা হইবে। সাদা ক্যালসিয়াম কার্বনেট থিতাইতে দাও এবং উপর হইতে পরিষ্কার জল লইয়া সাবান ঘষিয়া দেখ। ঐ জলে ফেনা হইবে।

খর জল মৃদু করিবার অন্য যে সকল উপায় প্রচলিত আছে তন্মধ্যে পারমুটাইট পদ্ধতি খুবই জনপ্রিয়। পৃথিবীর অনেক দেশেই জল এত বেশি খর যে, সে-জল দ্বারা দৈনিক জীবন চলে না এবং বাড়ীতে বাড়ীতে প্রয়োজন অনুযায়ী জলের খরতা কমাইয়া বা দূর করিয়া লইতে হয়। **জিওলাইট** (zeolite) নামক এক প্রকার খনিজ পাথর ছোট ছোট খণ্ডে ভাঙিয়া লইয়া যদি উহার মধ্য দিয়া খর জলকে ধীরে ধীরে নিঃসৃত হইতে দেওয়া যায়, তবে ঐ জিওলাইট খর জলের ক্যালসিয়াম অথবা ম্যাগনেশিয়াম শুষিয়া লইয়া তাহার বদলে সোডিয়াম ছাড়িয়া দেয়।

জিওলাইট বস্তুতপক্ষে এক প্রকার সোডিয়াম ঘটিত খনিজ পদার্থ। কোন খর জলে ম্যাগনেশিয়াম সালফেট ও ক্যালসিয়াম বাই-কার্বনেট রহিয়াছে এরূপ ধরিয়া লইলে—

সোডিয়াম-জিওলাইট + ক্যালসিয়াম বাই কার্বনেট
= ক্যালসিয়াম-জিওলাইট + সোডিয়াম বাই-কার্বনেট

ম্যাগনেসিয়াম সালফেট + সোডিয়াম-জিওলাইট
= ম্যাগনেশিয়াম-জিওলাইট + সোডিয়াম সালফেট

এইরূপ পরিবর্তনের ফলে ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেশিয়াম জিওলাইটের মধ্যে আটকাইয়া যায় ও নিঃসৃত জলে সোডিয়াম আসিয়া পড়ে। জলে সোডিয়াম সালফেট, বাই-কার্বনেট, ক্লোরাইড প্রভৃতি থাকিলেও সাবানে ফেনা হইবার কোন ব্যাঘাত ঘটে না। জিও-লাইটের চাহিদা খুবই বেশি হওয়ায় উহা কৃত্রিম উপায়ে সোডা, বালি ও অ্যালুমিনা গলাইয়া প্রস্তুত হইয়া থাকে। কৃত্রিম জিওলাইটকে **পারমু-টাইট** (permutite) বলা হয়।
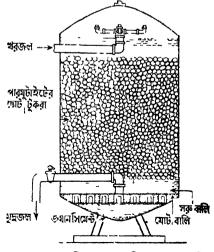
জলের খরতা দূর করিয়া মৃদুজলে পরিণত করার পদ্ধতি

একটি ড্রামের নীচের দিকে একখানি সচ্ছিদ্র প্লেটের উপরে পাথরের নুড়ি ও তাহার উপর দিকে বালি ও পরে পারমুটাইটের ছোট ছোট টুকরা (granules) স্তরে স্তরে ড্রামের উপর পর্যন্ত সাজানো থাকে। ড্রামের উপর দিক হইতে খর জল পারমুটাইটের স্তর ভেদ করিয়া নামিয়া আসিতে থাকে এবং খরতা হারাইয়া মৃদুজলে পরিণত হয়। কয়েক ঘণ্টা ধরিয়া জিওলাইটের সোডিয়ামের সহিত জলের ক্যালসিয়াম বা ম্যাগনেশিয়ামের বিনিময় ঘটিবার ফলে জিওলাইট ক্রমে অকেজো হইয়া পড়ে। তখন নীচের মুখ বন্ধ করিয়া ড্রামের মধ্যে খাদ্য লবণের (সোডিয়াম ক্লোরাইড) দ্রবণ ভরিয়া কয়েক ঘণ্টা রাখিয়া দেওয়া হয়। ইহাতে জিওলাইটে ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেশিয়ামের পরিবর্তে আবার সোডিয়াম আসিয়া পড়ে এবং সোডিয়াম-জিওলাইট পুনরায় ব্যবহারের উপযোগী হয়। ইহার পর লবণ জল বাহির করিয়া দিয়া আবার খর জল প্রবেশ করিতে দেওয়া হয়।

বর্তমানে যে কোন প্রাকৃতিক জলকে বিশুদ্ধ করিবার উপযোগী নানাবিধ রেজিন জাতীয় (resins) পদার্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে। ঐ সকল রেজিনের মধ্য দিয়া জল পরিস্রুত করিলে জলের যাবতীয় দ্রবীভূত লবণ দূর হইয়া জল একেবারে পাতিত জলের (distilled water) ন্যায় বিশুদ্ধ হয়।

অনুশীলনী

1. একটি বোতলে খানিকটা বর্ণহীন জলীয় দ্রবণ রহিয়াছে। কি কি উপায়ে প্রমাণ করিতে পার, যে উহা হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের দ্রবণ ?

চূনের জলের মধ্যে ঐ অ্যাসিড মিশাইলে কি পরিবর্তন ঘটিবে লিখ।

2. লবণ কাহাকে বলে? সোডিয়াম কার্বনেটকে লবণ বলা হয় কেন? সোডিয়াম কার্বনেটের সহিত সালফিউরিক অ্যাসিড মিশাইলে কি হয় লিখ। অন্যান্য কয়েকটি অ্যাসিডের সহিত সোডিয়াম কার্বনেটের বিক্রিয়া বর্ণনা কর।

3. কষ্টিক সোডা কি কি পদ্ধতিতে প্রস্তুত করা হয় লিখ। কষ্টিক সোডার দ্রবণের সহিত নিম্নলিখিত বস্তুগুলি মিশাইলে কি হইবে লিখ :—

(ক) নাইট্রিক অ্যাসিড, (খ) লেবুর রস, (গ) সোডা ওয়াটার।

কষ্টিক সোডা হইতে খাবার সোডা প্রস্তুত করা যায় কি-না?

4. অ্যাসিড ও ক্ষারকের সহিত লবণের সম্পর্ক উদাহরণ দ্বারা বুঝাইয়া দাও। অ্যামোনিয়াকে ক্ষার বলা হয় কেন? উহার সহিত নাইট্রিক অ্যাসিড মিশাইলে কি বিক্রিয়া হয় লিখ। একটি বোতলের বর্ণহীন জলীয় দ্রবণে অ্যামোনিয়া আছে কি-না কি কি উপায়ে বুঝিতে পার?

5. খাদ্য লবণ হইতে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড প্রস্তুতি ছবিসহ বর্ণনা কর। হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের ধর্ম ও ব্যবহার সম্বন্ধে যাহা জান লিখ। হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড হইতে হাইড্রোজেন গ্যাস কি উপায়ে প্রস্তুত করা যায় বল। হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড হইতে খাদ্য লবণ প্রস্তুত করা যায় কি ?

6 'বায়ুর নাইট্রোজেন প্রত্যক্ষভাবে আমাদের কোন কাজে না লাগিলেও প্রাণী ও উদ্ভিদের জীবনে ইহার চাহিদা খুবই বেশি' এই কথার তাৎপর্য কি ? কি উপায় অবলম্বন করিয়া বায়ুর নাইট্রোজেন হইতে নাইট্রোজেনীয় সার (nitrogenous manure) উৎপাদন করা হয় বর্ণনা কর।

7. নাইট্রোজেন চক্র ছবিসহ বিবৃত কর। ফসলের আবর্তন এই কথাটির অর্থ ব্যাখ্যা কর।

8 চুনাপাথর হইতে চুন প্রস্তুতি বর্ণনা কর। উহা হইতে কি উপজাত দ্রব্য পাওয়া যায় এবং উহার কি কি ব্যবহার হইতে পারে লিখ। সোডা ওয়াটার কাহাকে বলে

চুনের ব্যবহার সম্বন্ধে যাহা জান লিখ। চুনাপাথর ও চুনের সহিত হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের বিক্রিয়া বর্ণনা কর।

) জলের খরতা কাহাকে বলে জলের খরতা দূর করিবার প্রয়োজনীয়তা এবং উপায় বর্ণনা কর। পারমুটাইটের ব্যবহার সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

!) তিনটি বোতলে তিনপ্রকার সাদা গুঁড়া পদার্থ রহিয়াছে এর উহারা লবণ কাপড়কাচা সোডা ও কষ্টিক সোডা হইতে পারে। কোনটিতে কি আছে কি করিয়া বুঝা যাইবে

সংক্ষিপ্ত উত্তরের জন্য বিষয়মুখী (Objective Test) প্রশ্ন

1 কোন্‌টি সত্য বল :

(ক) ম্যাগনেশিয়াম অক্সাইড এক প্রকার

(i) ধাতু

(i) ক্ষারক

(i) লবণ।

ইহার সহিত সালফিউরিক অ্যাসিড মিশাইলে

(i) ইহা জ্বলিয়া উঠে

(ii) কোন ক্রিয়া হয় না

(iii) লবণ উৎপন্ন হয়।

(খ) হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের সহিত ফেনলপথেলিন মিশাইলে উহা

(i) লাল হয়,

(ii) কোন পরিবর্তন হয় না,

(iii) নীল হইয়া যায়।

উহার মধ্যে বেশি করিয়া কষ্টিক পটাশ ঢালিলে উহা

(i) লালই থাকে,

(ii) লাল হইয়া যায়,

(iii) বর্ণহীন হয়।

(গ) গাছ তাহার প্রয়োজনীয় নাইট্রোজেন সংগ্রহ করে

(i) পাতার ক্লোরোফিল দ্বারা বায়ু হইতে,

(ii) মূলরোম দ্বারা মাটি হইতে।

(ঘ) (i) সোডিয়াম ক্লোরাইড

(ii) ক্যাল্সিয়াম ক্লোরাইড,

(iii) ক্যালসিয়াম কার্বনেট

জলে দ্রবীভূত থাকিলে সেই জল খর হয়। সেই জলে

(i) চুন,

(ii) সোডা

মিশাইয়া রাখিলে জলের খরতা দূর হয়

2. শূন্যস্থান পূর্ণ কর :—

(ক) কষ্টিক সোডার জলীয় দ্রবণ—লিটমাসকে—করিয়া দেয়। উহার মধ্যে—ঢালিতে থাকিলে আবার ঐ দ্রবণ—হইয়া যায়। এই প্রশমনের ফলে—নামক—উৎপন্ন হয়।

(খ) চুনাপাথর উচ্চ তাপমাত্রায় বিশ্লিষ্ট হইয়া- এবং—গ্যাসে পরিণত হয়। প্রথমটি—পদার্থ। দ্বিতীয়টি চুনের জলকে—করে।

3. 'হাঁ' অথবা 'না' লিখিয়া উত্তর দাও :

(i) জলে হাইড্রোজেন আছে, সুতরাং উহা অ্যাসিড —

(ii) কষ্টিক সোডা লাল লিটমাসকে নীল করে -

(iii) খাদ্য লবণ থাকার জন্য সমুদ্রের জল খর —

(iv) চুনাপাথরে অ্যাসিড ঢালিলে কার্বন ডাই-অক্সাইড উৎপন্ন হয় —

(v) চুনের দ্রবণ অ্যালকালি —

(vi) শিমজাতীয় গাছ মূলের গুটি দ্বারা বায়ু হইতে নাইট্রোজেন গ্রহণ করে —

(vii) অ্যামোনিয়া একটি অ্যাসিড —

(viii) কষ্টিক সোডা একপ্রকার লবণ

৫

জীব-জীবন
[Living beings]

1 মাছ (Fish)

মেরুদণ্ডী প্রাণীদের মধ্যে মাছ একটি বিশিষ্ট আকৃতির ও প্রকৃতির জীব। জলে বাস করিতে হয় বলিয়া ইহার দেহের গঠন জল কাটিয়া চলিবার পক্ষে উপযোগী। ইহার দেহের অগ্রভাগ ছুঁচলো, মধ্যভাগ প্রশস্ত, পশ্চাদ্ভাগ আবার সরু হইয়া লেজে শেষ হইয়াছে। সকল মাছেরই মাথার দিকে দুই পাশে দুইটি পাখনা (pectoral fins) আছে। অন্যান্য প্রাণীদের ন্যায় ইহাদেরও রক্ত বিশুদ্ধ করিবার জন্য অক্সিজেন প্রয়োজন হয়, কিন্তু বাতাস হইতে সরাসরি ইহারা অক্সিজেন লইতে পারে না। জলে যে অল্প পরিমাণ বায়ু দ্রবীভূত থাকে, তাহা হইতে ইহারা ইহাদের ফুলকার সাহায্যে অক্সিজেন গ্রহণ করিয়া থাকে। ইহাদের মাথার দুই পাশের কানকোর নীচে দুই সারি লাল রংয়ের ফুলকা দেখিতে পাওয়া যায়। চোখে পাতা নাই বলিয়া মাছ চোখ মেলিয়া ঘুমায়। ইহাদের দেহের কোন নির্দিষ্ট উষ্ণতা নাই। মানুষ হিমশীতল মেরুদেশেই বাস করুক, অথবা রৌদ্রতপ্ত মরুভূমিতেই বাস করুক, তাহার দেহের উষ্ণতা প্রায় একই থাকে (আনুমানিক 98° ফা.)। কিন্তু মাছ, উভচর ও সরীসৃপ এই তিন শ্রেণীর মেরুদণ্ডী জীবের দেহের উষ্ণতা পরিবেশ অনুযায়ী পরিবর্তিত হয়। এইজন্য এই জাতীয় প্রাণীকে **শীতল রক্তবিশিষ্ট প্রাণী** (cold blooded animal) বলা হয়। রুই, কাতলা, ইলিশ, ভেটকী, কই প্রভৃতি মাছের গায়ে আঁশ (scales) আছে। শিঙি, মাগুর, ট্যাংরা, বোয়াল, শিলং প্রভৃতি মাছের গায়ে আঁশ নাই। সকল মাছেরই শরীর একটি পিছল পদার্থে ঢাকা থাকে।

রুই, কাতলা, মিরগেল, বাটা, কালবোস, পুঁটি প্রায় একই ধরনের মাছ। একটি রুই মাছের দেহ পর্যবেক্ষণ করিলে নিম্নলিখিত বিষয় লক্ষ্য করা যাইবে।

মাছের বহিরাকৃতি :

মাছ উহার খাদ্য গিলিয়া খায় বলিয়া উহার মুখের গর্ত অপেক্ষাকৃত বড। উহার নাকের ছিদ্র আছে, উহা দ্বারা ঘ্রাণ লওয়া চলে কিন্তু শ্বাসকার্য চলে না। শব্দ শুনিবার জন্য মাছের কর্ণেন্দ্রিয় আছে কিন্তু উহা মাথার খুলির মধ্যে থাকে, বাহির হইতে দেখা যায় না। দু' পাশের কানকো মাছের কান নহে। উহার নীচেই মাছের শ্বাসযন্ত্র। পিঠের উপরিভাগে মাছের যে একখানি বড পাখনা আছে তাহাকে পিঠের পাখনা (dorsal fin) বলে। ইহা ছাড়া 'কানকোর

মাছের বহিরাকৃতি

পাশে ও পেটের তলায় দুই জোড়া পাখনা আছে (pectoral and pelvic fins)। লেজের বড পাখনাটি (caudal fin) উহার সাঁতারের প্রধান সহায়ক। কানকো হইতে লেজ পর্যন্ত মাছের দেহের দুইপাশে ঠিক মাঝখানে একটি করিয়া দাগ দেখা যায়, উহাই মাছের স্পর্শেন্দ্রিয় (sense organ)। ইহা ছাড়া শিং, ট্যাংরা, বোয়াল প্রভৃতি মাছের মুখের শুঁড (barbel) উহাদের স্পর্শেন্দ্রিয়।

মাছের অন্তরিন্দ্রিয় :

পৌষ্টিক তন্ত্র (Alimentary system) **:** মাছের মুখগহ্বরের উপরে তালুর দিকে আটকানো একটি জিভ আছে। গহ্বরের পিছনের দিকে ফ্যারিংক্স (pharynx) এবং উহার তলায় মাছের কতকগুলি দাঁত আছে। মাছ খাদ্যবস্তু গিলিয়া লইলে উহা সরাসরি পাকস্থলীতে এবং অন্ত্রের প্রথম ভাগে গিয়া হজম হয়। যকৃত হইতে পিত্তরস নিঃসৃত হইয়া পিত্তাশয়ে (gall bladder) জমে ও সেখান হইতে প্রয়োজন মত হজমের সহায়তার জন্য খাদ্যের

সহিত মিশ্রিত হয়। পাকস্থলী হইতে লম্বা নলের মত অন্ত্র (intestine) বাহির হইয়া পায়ুতে (anus) শেষ হইয়াছে। মাছের পেটের মধ্যে পাকস্থলীর
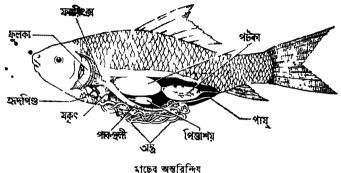
মাছের অন্তরিন্দ্রিয়

উপরে দুই কুঠরী-বিশিষ্ট বায়ুপূর্ণ পটকা (swim bladder) রহিয়াছে। উহার মধ্যস্থ বাতাস ছাড়িয়া দিয়া মাছ জলের নীচে তলাইয়া যায়।

রক্তসঞ্চালন তন্ত্র (Circulatory system) : মাছের ফুলকা দুইটির মাঝখানে একটু নীচে উহার হৃৎপিণ্ড (heart) রহিয়াছে। উহার দুইটি কুঠরী, উপরেরটি নিলয় (ventricle) এবং নীচেরটি অলিন্দ (auricle)। অলিন্দের নীচে সাইনাস ভেনোসাস (sinus venosus) নামে একটি প্রধান শিরায় শরীরের দূষিত রক্ত জমা হয়। এখান হইতে দূষিত রক্ত প্রথমে অলিন্দে এবং সেখা হইতে নিলয় হইয়া ধমনীতে (ventral aorta) যায় এবং সেখান হইতে ফুলকায় গিয়া বাতাসের অক্সিজেন গ্রহণ করে এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড ছাড়িয়া দেয়। এইরূপে রক্ত বিশুদ্ধ হইয়া সর্বাঙ্গে ছড়াইয়া পড়ে এবং দূষিত রক্ত পুনরায় সাইনাস ভেনোসাসে একত্রিত হয়। সুতরাং মাছের হৃৎপিণ্ডে বিশুদ্ধ রক্ত কখনই থাকে না। মাছের রক্তে প্লাজমা, শ্বেতকণিকা ও লোহিত কণিকা আছে এবং উভয় কণিকার মধ্যেই নিউক্লিয়াস (nucleus) আছে।

শ্বাসতন্ত্র (Respiratory system) : সাধারণ মাছের ফুসফুস না থাকায় উহা ডাঙায় বেশীক্ষণ বাঁচিতে পারে না। মাছের কানকো তুলিয়া ধরিলে যে সরু চিরুনির মত লাল ফুলকা দেখা যায় তাহা অসংখ্য রক্তবহা নালীর মিলনস্থল। মুখের মধ্যে জল লইয়া মাছ উহা ফুলকার মধ্য দিয়া ছাড়িয়া দেয়। তখন

ফুলকার সূক্ষ্ম পরদা ভেদ করিয়া জলের দ্রবীভূত অক্সিজেন রক্তের সহিত মিশিয়া যায় এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড মিশ্রিত জল কানকো দিয়া বহির হইয়া যায়। জলে বায়ু দ্রবীভূত না থাকিলে ঐ জলে মাছ বাঁচে না। এই জন্য মাছ পুষিবার জলাধারে (aquarium) সবদা অক্সিজেনের বুদ্বুদ ছাড়িতে হয়। একপ্রকার

উপরে মাগুর, নীচে বাঁদিকে শিঙি ও ডানদিকে কইমাছের অতিরিক্ত শ্বাসযন্ত্র দেখানো হইয়াছে

অতিরিক্ত শ্বাসযন্ত্র (accessory respiratory organs) আছে বলিয়া কই, শিং অথবা মাগুর মাছ ডাঙায় রাখিয়া দিলেও অনেকক্ষণ বাঁচিয়া থাকে।

বংশ বিস্তার :

স্ত্রী-মাছ একসঙ্গে অনেকগুলি ডিম ছাড়িয়া দিলে পুং-মাছ সেই ডিমের উপর এক প্রকার রস ছড়াইয়া দিয়া উহাদিগকে নিষিক্ত (fertilize) করে। ঐ ডিম হইতে কয়েকদিন পরে বাচ্চা বাহির হয়।

মাছের চাষ (Cultivation of fish) :

মাছ আমাদের একটি প্রধান খাদ্য। ইংল্যাণ্ড, নরওয়ে, সুইডেন, জাপান, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে বৈজ্ঞানিক প্রথায় মাছ উৎপাদনের ও ধরিবার ব্যবস্থা আছে। আমাদের দেশে মাছের বহুল উৎপাদন অদ্যাপি সম্ভব হয় নাই বলিয়া মাছ এদেশে অত্যন্ত দুর্মূল্য।

ইলিশ, ভেটকী, তপসে, শিলং প্রভৃতি লোনা জলের মাছ নদীর মোহনায় জন্মে। ম্যাকারেল, পমফ্রেট প্রভৃতি খোলা সমুদ্রের মাছ। ধরিবার সুবন্দোবস্ত ও ঠাণ্ডায় রাখার ব্যবস্থা করিতে পারিলে এ সকল মাছ অপেক্ষাকৃত

সুলভ হয়। রুই, কাতলা, মিরগেল, কালবোস প্রভৃতি মিষ্টজলের মাছ বড় বড় পুকুরে, দীঘিতে, বিলে, খালে ও মিষ্টজলের নদীতে জন্মে। সাধারণত ইহারা বর্ষাকালে নদীর মোহনার দিকে অথবা বড় বড় বিলে ডিম পাড়ে। কয়েকদিনের মধ্যে ঐ ডিম ফুটিয়া সরু সূতার মত বাচ্চা বাহির হয়। জেলেরা এই বাচ্চা সূক্ষ্মজালে ধরিয়া আনিয়া পুকুরে ফেলিয়া উহাদিগকে নানাপ্রকার পোকামাকড় খাওয়ায়। বড় হলে এবং মাছের সেই বাচ্চাগুলি হাঁড়িতে করিয়া বিক্রয় করে। মাছের এই পোনা বাচ্চা পুকুরে ছাড়িয়া দিলে আলো বাতাসে খেলা করিয়া ইহারা অল্পদিনেই বড় হইয়া উঠে। মশা, মাছি, ফড়িং প্রভৃতির শূককীট মাছের একটি প্রধান খাদ্য। মাছ প্রধানত আমিষ ভোজী।

2 ব্যাঙ (Toad)

মাছ অপেক্ষা ব্যাঙের দেহ অনেকাংশে জটিল ও উন্নত। শৈশবে যখন ইহারা ডিম হইতে ফুটিয়া বাহির হয় তখন মাছের ন্যায় ইহাদের ফুলকা থাকে এবং ইহারা জলে বাস করিয়া বড় হয়। কিন্তু প্রায় তিন মাস ধরিয়া ইহাদের

ব্যাঙের বহিরাকৃতি

দেহের রূপান্তর ঘটিতে থাকে এবং অবশেষে ইহাদের ফুসফুস, চারিটি পা প্রভৃতি গজাইয়া ইহারা একেবারে ডাঙার অধিবাসী বনিয়া যায়। এইজন্য ব্যাঙকে উভচর প্রাণী বলা হয়।

আমাদের দেশে যে সকল ব্যাঙ দেখিতে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে সোনা ব্যাঙ, কুনো ব্যাঙ ও গেছো ব্যাঙ সুপরিচিত। সোনা ব্যাঙের দেহ মসৃণ, গায়ের রং সবুজ, উপরে কালো ডোরা। ইহারা জলে বাস করে। কুনো ব্যাঙ ঝোপে-ঝাড়ে, নর্দমার পাশে, ঘরের কোণে বাস করে, ইহারা দেখিতে কুৎসিত, গায়ের রং ধূসর। গেছো ব্যাঙ গাছে বাস করে। ইহারা দেখিতে অনেকটা সোনা ব্যাঙের মত, কিন্তু আকারে ছোট।

ব্যাঙের বহিরাকৃতি (External structure of a Toad

একটি সাধারণ কুনো ব্যাঙ লইয়া পরীক্ষা করিলে দেখা যায়, উহার গায়ের রং ধূসর, সারা গায়ে বিশেষত পিঠের দিকে বহুসংখ্যক কালো গুটির মত আঁচিল, সামনের দুইটি পা অপেক্ষাকৃত ছোট এবং প্রতি পায়ে চারিটি করিয়া আঙুল, পিছনের দুইটি পা বেশি লম্বা এবং প্রতি পায়ে পাঁচটি করিয়া আঙুল। শরীরে মাথা ও ধড়, এই দুইটি অংশ থাকিলেও গলা নাই বলিয়া উহারা একাকার হইয়া আছে। ব্যাঙের মুখ বেশ বড়, চোয়াল দুইটি দুইদিকে অনেকখানি বিস্তৃত। উহার জিভ নীচের চোয়ালে আটকানো এবং জিভের অগ্রভাগ ভিতরে গলার দিকে প্রসারিত। সম্মুখে পোকা-মাকড় দেখিলে জিভটা চকিতে উল্টাইয়া বাহির করিয়া উহাকে আটকাইয়া মুখের ভিতরে লইয়া যায়। জিভে একপ্রকার চটচটে পদার্থে পোকা-মাকড় আটকাইয়া যায়। মাথার উপরে

জিভের সাহায্যে পোকামাকড় ধরিবার কৌশল

দুইটি বড় বড় চক্ষুর প্রত্যেকটিতে তিনটি করিয়া পাতা—উপরেরটি বড়, নীচেরটি

ছোট, তৃতীয়টি পাতলা ও স্বচ্ছ। সম্মুখে নাকের ছিদ্রে কপাট আছে, ইচ্ছামত উহা খোলা ও বন্ধ করা চলে। দুই পাশে পাতলা পর্দা দিয়া ঢাকা দুইটি কান আছে। কানের ঠিক পিছনে দুইদিকে দুইটি মোটা গ্রন্থি (gland) আছে। ধরিতে গেলে একপ্রকার বিষাক্ত রস ছড়াইয়া দিয়া ব্যাঙ আত্মরক্ষা করে। পশ্চাদ্ভাগে দুই পায়ের মাঝখানে উহার পায়ু ছিদ্র আছে। উহা দ্বারা ব্যাঙ মলমূত্র ত্যাগ করে।

ব্যাঙের অন্তরিন্দ্রিয় (Internal organs of a Toad) ঃ

পৌষ্টিক তন্ত্র (Alimentary system) ঃ মুখগহ্বরের নীচে ব্যাঙের ফ্যারিংক্স রহিয়াছে। এখান হইতে একটি পথ ফুসফুসের সহিত যুক্ত এবং অপরটি অন্ননালী (oesophagus) হইয়া পাকস্থলীতে পৌঁছিয়াছে। খাদ্যদ্রব্য পাকস্থলীতে ও তৎপরে ক্ষুদ্রান্ত্রে (small intestine) হজম হয়। যকৃত ও

ব্যাঙের অন্তরিন্দ্রিয়

পিত্তাশয় (gall bladder) হইতে রস নিঃসৃত হইয়া হজমের সাহায্য করে। অতঃপর অপাচ্য পদার্থ বৃহদন্ত্র (large intestine) হইয়া পায়ুর পথে বাহির হইয়া যায়। দেহের দুই পাশের দুইটি বৃক্ক (kidney) হইতে রক্তের দূষিত অংশ মূত্রাশয়ে জমে ও পরে পায়ুর পথে নির্গত হয়।

রক্ত-সংবহন তন্ত্র (Circulatory system) : ব্যাঙের হৃৎপিণ্ড তিন কক্ষে বিভক্ত। উহার নীচের কক্ষকে নিলয় (ventricle) এবং উপরের দুইটি কক্ষকে অলিন্দ (auricle) বলে। দেহের দূষিত রক্ত দুইটি মহাশিরা (vena cava) দিয়া সাইনাস ভেনোসাসে আসে এবং তথা হইতে ডান অলিন্দে পৌঁছে। অপরদিকে ফুসফুস কর্তৃক পরিশোধিত রক্ত বাম অলিন্দে

ব্যাঙের হৃদ্‌পিণ্ড

পৌঁছে। পরে এই দুইটি দূষিত ও বিশুদ্ধ রক্ত একসঙ্গে নিলয়ে যায় কিন্তু সম্পূর্ণ না মিশিয়া উভয় রক্তই মহাধমনীতে যায়। সেখান হইতে পরে দূষিত রক্ত ফুসফুসে গিয়া অক্সিজেন গ্রহণ করে এবং বিশুদ্ধ রক্ত ধমনীজাল মারফৎ সর্বাঙ্গে অক্সিজেন বিলি করিয়া দূষিত হইয়া পুনরায় শিরা উপশিরা মারফত ডান অলিন্দে ফিরিয়া আসে। ব্যাঙের রক্তের রক্তরসে (plasma) লোহিত কণিকা ও শ্বেতকণিকা আছে এবং উভয় কণিকার নিউক্লিয়াস আছে।

শ্বাসতন্ত্র (Respiratory system) : ব্যাঙ নাক দিয়া বাতাস টানিয়া লইয়া উহা মুখগহ্বরে জমায় এবং চাপ দিয়া ঐ বাতাস ফুসফুসে পাঠাইয়া দেয়। মুখগহ্বরের মধ্যে রক্তবাহী সূক্ষ্ম নল থাকায় মুখেও কিছু রক্তের অক্সিজেন

ব্যাঙের জীবন-বৃত্তান্ত (ও রূপান্তর)
(Life-history - metamo phosis)

গ্রহণ চলে। পরে দূষিত বাতাস নাক ও মুখ দিয়া বাহির হইয়া যায়। এইজন্য জোর করিয়া মুখ খোলা রাখিলে ব্যাঙ মরিয়া যায়।

সমস্ত শীতকাল উহারা ঘুমাইয়া কাটায়। এই সময় উহাদের শ্বাসকার্য অতি ধীরে ধীরে চলে। ব্যাঙ এই সময় তাহার ত্বক দ্বারাও কিছু কিছু শ্বাসকার্য চালায়। এই সময় উহারা অনাহারে থাকে বলিয়া অত্যন্ত নির্জীব হইয়া পড়ে। এই শীতের ঘুমকে শীতস্তম্ভ বা হাইবারনেশন (hibernation) বলে।

ব্যাঙের জীবন-ইতিহাস বা **রূপান্তর** (Life history or Metamorphosis of a Toad) :

স্ত্রী ব্যাঙ বর্ষার জলে এক সঙ্গে অনেকগুলি ডিম পাড়িলে উহারা একত্রে জেলির মত ভাসিয়া বেড়ায় (১)। কয়েক দিন পরে ডিম (২) ফুটিয়া ব্যাঙাচি বাহির হইলে প্রথমে কিছুদিন উহারা কোন জলজ উদ্ভিদের গায়ে আটকাইয়া অনাহারে পড়িয়া থাকে (৩)। ইহার পর উহাদের মুখ ফুটে এবং মাছের ফুলকার মতন একজোড় ফুলকা উহাদের দেহের বাহিরের দিকে গজায় (৪)। এই সময় উহারা জলজ উদ্ভিদ খাইয়া বাঁচে। অতঃপর উহাদের বাহিরের ফুলকা ছোট হইতে থাকে এবং মাথার দুই পাশে মাছের মত কানকো ও তাহার নিচে ফুলকা জন্মায় (৫)। এই সময় উহারা মাছের মত জীবন যাপন করে। ইহার পর উহাদের ফুসফুস জন্মিতে থাকে এবং উহারা জলে থাকিলেও উপরে ভাসিয়া উঠিয়া শ্বাস লয় (৬)। ইহার পরে উহাদের পশ্চাতের পা গজায় ও লেজ ছোট হইতে থাকে (৭)। ক্রমে উহাদের সম্মুখের পা দুইটিও বাহির হয় এবং ফুলকা শুকাইয়া যায় (৮)। তখন উহারা স্থলচরে পরিণত হয়। লেজটি ছোট হইতে হইতে ক্রমে অদৃশ্য হইয়া যায় (৯—১০)। ব্যাঙাচি হইতে পূর্ণাঙ্গ ব্যাঙে পৌঁছিতে প্রায় তিনমাস সময় লাগে। একটি ব্যাঙ 30/35 বৎসর পর্যন্ত বাঁচিতে পারে।

প্রশ্ন

1 ব্যাঙকে উভচর প্রাণী বলে কেন ? ছবি আঁকিয়া ব্যাঙের বহিরাকৃতি বর্ণনা কর। ব্যাঙের খাদ্য ও খাদ্য-গ্রহণ সম্বন্ধে যাহা জান লিখ। হাইবারনেশন কাহাকে বলে ?

2. ব্যাঙের হৃৎপিণ্ড ও রক্তসঞ্চালন সম্বন্ধে যাহা জান লিখ। ব্যাঙের শ্বাসগ্রহণের প্রণালী বর্ণনা কর।

৩. জন্মাবধি ব্যাঙের দেহের ক্রমপরিণতি বর্ণনা কর।

৪. একটি সাধারণ মাছের শ্বাসতন্ত্র বর্ণনা কর। মাছের রক্ত সম্বন্ধে যাহা জান লিখ। মাছের অতিরিক্ত শ্বাসযন্ত্র কাহাকে বলে? পটকা মাছের কোন্ কাজে লাগে?

৫. তোমার পরিচিত কয়েকটি বিভিন্ন মাছের আকৃতি বর্ণনা কর। ইহারা কোথায় জন্মে? মাছের চাষ সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

Objective Test Questions

সংক্ষিপ্ত উত্তরের জন্য বিষয়মুখী প্রশ্ন

1. কোন্‌টি সত্য বল :

(ক) মাছ নিশ্বাস লয়

(i) নাকের ছিদ্র দ্বারা

(ii) ফুলকা দ্বারা,

(iii) পটকা দ্বারা।

(খ) ব্যাঙ উভচর কারণ উহা

(i) জলে ও ডাঙ্গায় থাকিতে পারে,

(ii) ব্যাঙাচি অবস্থায় জলচর থাকে।

৬

মানবদেহ
[The Human body]

1. রক্ত (Blood)

দেহের কোন স্থান কাটিয়া গেলে যে লাল তরল পদার্থ বাহির হয় তাহাকে **রক্ত** বলে। আমাদের হৃৎপিণ্ড অনবরত পাম্প করিয়া বিশুদ্ধ রক্ত আমাদের সর্বাঙ্গে ছড়াইয়া দেয় এবং সেই রক্ত দেহের কোষে কোষে অক্সিজেনের যোগান দিতে থাকে। ইহাতে আমরা আমাদের প্রয়োজনীয় শক্তি (energy) ও পুষ্টি (nutrition) লাভ করি। এই কার্যের ফলে রক্ত অবিশুদ্ধ হইয়া পড়ে এবং সেই অবিশুদ্ধ রক্ত পুনরায় হৃৎপিণ্ডে ফিরিয়া আসে। অতঃপর আমাদের ফুসফুসে প্রবেশ করিয়া সেই রক্ত অক্সিজেন আহরণ করিয়া বিশুদ্ধ হইয়া পুনরায় সর্বাঙ্গে সঞ্চারিত হয়। বুকের বাঁদিকে কান পাতিলে অথবা স্টেথস্কোপ (stethoscope) যন্ত্রের সাহায্যে আমরা হৃৎপিণ্ডের পাম্পের কাজ শুনিতে পাই। হৃৎপিণ্ডের **সঙ্কোচন** ও **প্রসারণ** (যথাক্রমে systole এবং diastole)—এই উভয় ক্রিয়া মিলিয়া একটি হৃৎস্পন্দনের শব্দ (heart beat) উৎপন্ন হয়। একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের বেলায় মিনিটে প্রায় 75 বার এই **হৃৎস্পন্দন** অনুভব করা যায়। আমাদের কব্জির পাশে যে নাড়ী (artery) আছে সেখানে আলগোছে টিপিয়া ধরিলেও ঐরূপ **নাড়ী-স্পন্দন** (pulse beat) অনুভব করা যায়। বয়স অল্প হইলে স্পন্দনের সংখ্যা বেশি হইয়া থাকে। বাল্যকালে স্পন্দনের সংখ্যা 90 অথবা তাহার বেশিও হইতে পারে। অসুস্থ হইলেও স্পন্দনের সংখ্যা বাড়িয়া যায়।

অণুবীক্ষণ যন্ত্রে রক্তের কণিকা দেখানো হইয়াছে ১২০০ গুণ বর্ধিত
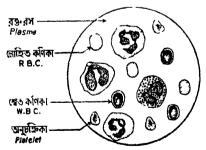
একটি ভাল অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নীচে এক ফোটা রক্ত লইয়া পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে একপ্রকার হলদে রংয়ের তরল পদার্থের মধ্যে অসংখ্য ছোট ছোট রক্তকণিকা ভাসিয়া বেড়াইতেছে। ঐ তরল পদার্থকে **রক্তরস** (plasma) এবং ঐ সকল কণিকাকে **রক্তকণিকা** (blood corpuscles) বলা হয়

রক্তরসে নানাপ্রকার লবণ, প্রোটিন ও শর্করাজাতীয় পদার্থ এবং শতকরা প্রায় 90 ভাগ (90%) জল থাকে। রক্তরস একটি অতি মৃদু ক্ষারীয় দ্রবণ (slightly alkaline)। রক্তকণিকাগুলি তিন প্রকারের হইয়া থাকে। যথা :—

লোহিত কণিকা (Red blood corpuscles)। ইহারা সংখ্যায় সর্বাপেক্ষা বেশী। এক ফোঁটা রক্তে ইহাদের সংখ্যা 30 লক্ষ হইতে পারে। লোহিত কণিকা দেখিতে গোল, দুই পাশ ভিতরের দিকে চাপা। উহার ভিতরে একপ্রকার লাল রংয়ের লৌহসমন্বিত পদার্থ থাকে, উহাকে **হিমোগ্লোবিন** (hæmoglobin) বলে। রক্ত ফুসফুসে গেলে এই হিমোগ্লোবিন বাতাস হইতে **অক্সিজেন** গ্রহণ করিয়া অক্সি-হিমোগ্লোবিনে (oxy-hæmoglobin) পরিণত হয় এবং সেই রক্ত দেহের সর্বাঙ্গে ছড়াইয়া পড়িলে উহার অন্তর্গত অক্সিজেন দেহের কোষে কোষে বিলি হইয়া যায়। তখন অক্সিজেন সংগ্রহ করিবার জন্য রক্ত আবার হৃৎপিণ্ড হইয়া ফুসফুসে আসে। লোহিত কণিকায় কোন নিউক্লিয়াস (nucleus) নাই।

শ্বেত কণিকা (White blood corpuscles) : ইহাদের সংখ্যা লোহিত কণিকার প্রায় 500 ভাগের একভাগ। ইহারা আকারে বড়, বর্ণহীন এবং ইহাদের মধ্যে একটি করিয়া নিউক্লিয়াস (nucleus) আছে। ইচ্ছামত ইহারা আকার বদলাইতে পারে এবং আমাদের শরীরের ক্ষতিজনক কোন **জীবাণু** কোন প্রকারে আমাদের দেহে প্রবেশ করিলে ইহারা ঐ জীবাণুকে জড়াইয়া ধরিয়া ধ্বংস করিয়া ফেলে।

রক্তে লোহিত ও শ্বেত কণিকা ছাড়া আর এক প্রকারের কণিকা আছে। উহাকে **অণুচক্রিকা** (platelets) বলে। উহারা আকারে অতি ক্ষুদ্র ও বর্ণহীন। উহারা রক্তকে জমাট বাঁধিতে সাহায্য করে।

তরল রক্তে **ফাইব্রিনোজেন** (fibrinogen) নামক একপ্রকার প্রোটিন থাকে। কোন স্থান কাটিয়া গিয়া রক্ত বাহির হইলে ঐ তরল ফাইব্রিনোজেন কঠিন **ফাইব্রিনে** (fibrin) পরিণত হয় এবং সেই জমাট ফাইব্রিনকে অবলম্বন করিয়া রক্তের বিভিন্ন কণিকাগুলিও জমাট বাঁধিয়া যায়। জমাট রক্ত (clotted blood) হইতে চুয়াইয়া যে হলদে রংয়ের রস বাহির হয়, তাহাকে **রক্তমণ্ড** (serum) বলে।

2. হৃৎপিণ্ড ও রক্তসংবহন
(The heart and circulation of blood)

আমাদেব হৃৎপিণ্ড কতকগুলি অনৈচ্ছিক (involuntary) পেশী দ্বাবা গঠিত অর্থাৎ ইহাব ক্রিয়া আমাদেব ইচ্ছাব উপব নির্ভব কবে না। এই যন্ত্রটি

হৃৎপিণ্ড
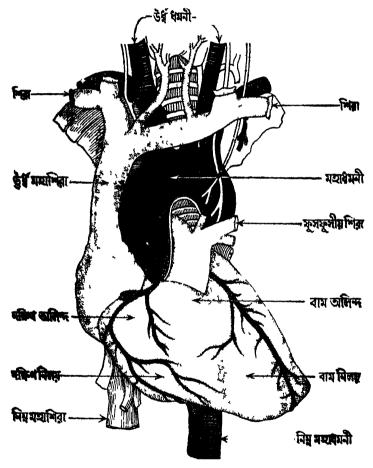
আমাদেব দেহে জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত অবিশ্রান্ত সংকুচিত ও প্রসাবিত হইয়া পাম্পের ন্যায় কাজ কবিতে থাকে ইহা বুকের মধ্যে দুই পাশে দুই ফুসফুসেব মাঝখানে একটু বাঁদিকে হেলিয়া অবস্থিত। আমাদেব হাত মুষ্টিবদ্ধ কবিলে

দেখিতে যেরূপ হয়, হৃৎপিণ্ড আকার ও আয়তনে অনেকটা সেইরূপ দেখিতে। উহার মাঝখানে একখানি খাড়া পরদা উহাকে দুইটি পেশীময় গহ্বরে (muscular cavity) ভাগ করিয়াছে। প্রত্যেক গহ্বরে দুইটি করিয়া কক্ষ আছে। একটি উপরে এবং অপরটি নীচে। উপরের কক্ষ দুইটিকে **অলিন্দ** (auricle) এবং নীচের কক্ষ দুইটিকে **নিলয়** (ventricle) বলে। কোন অলিন্দ হইতে অপর অলিন্দে অথবা কোন নিলয় হইতে অপর নিলয়ে যাইবার কোন পথ নাই। কেবল মাত্র প্রত্যেক উপরের অলিন্দ হইতে নীচের নিলয়ে যাইবার পথ খোলা। দক্ষিণ অলিন্দ হইতে দক্ষিণ নিলয়ে নামিয়া আসার পথে একটি **তিন পাল্লাযুক্ত কপাটিকা** (tricuspid valve) এবং বাম অলিন্দ হইতে বাম নিলয়ে নামিয়া আসার পথে একটি **দুই পাল্লাযুক্ত কপাটিকা** (bicuspid valve) আছে। কপাটিকাগুলির অবস্থান এরূপ যে, রক্ত কেবল উপর হইতে নীচে আসিতে পারে। বিপরীত দিকে চলিতে পারে না। দক্ষিণ নিলয় হইতে ফুসফুসীয় ধমনীর (pulmonary artery) পথে একটি অর্ধচন্দ্র কপাটিকা (semilunar valve) এমনভাবে আছে যে রক্ত নিলয় হইতে ফুসফুসের দিকে যাইতে পারে, ফিরিতে পারে না। বাম নিলয় হইতে মহাধমনীর (aorta) পথে অনুরূপ একটি অর্ধচন্দ্র কপাটিকা আছে, যাহা রক্তকে বাহির হইয়া যাইতে দেয় কিন্তু ফিরিতে দেয় না।

মানবদেহে তিনপ্রকার রক্তবহা নালী (blood vessels) আছে। যথা— **ধমনী** (artery), **শিরা** (vein) এবং **জালক** (capillary)। বাম নিলয় হইতে বিশুদ্ধ রক্ত **মহাধমনীর** (aorta) পথে বাহির হইয়া শাখা-প্রশাখা অতিক্রম করিয়া শরীরের সর্বত্র নাড়ী জালকের (capillaries) মধ্যে ছড়াইয়া পড়ে। অতঃপর জালকের পাতলা দেওয়াল চুয়াইয়া রক্তের তরল **রস লসিকা** (lymph) বাহির হয়। উহা দেহকোষগুলিকে খাদ্য এবং অক্সিজেন যোগায় এবং বিনিময়ে দেহকোষ হইতে কার্বন ডাই-অক্সাইড ও অন্যান্য দূষিত পদার্থ গ্রহণ করে। পরে এই দূষিত লসিকা আবার জালকে ফিরিয়া আসিয়া শিরার (veins) শাখা-প্রশাখা অতিক্রম করিয়া **ঊর্ধ্ব মহাশিরা** (superior vena cava) এবং **নিম্ন মহাশিরার** (inferior vena cava) পথে হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণ অলিন্দে প্রবেশ করে। বাম নিলয়

হইতে বিশুদ্ধ রক্ত যাত্রা করিয়া সমস্ত শরীর ঘুরিয়া দূষিত রক্তরূপে দক্ষিণ অলিন্দে ফিরিয়া আসিলে এই যে সঞ্চালন সম্পূর্ণ হয়, ইহাকে **বৃহত্তর রক্ত সঞ্চালন** (systemic or general circulation) বলে।
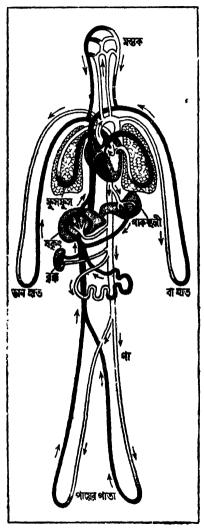
মানব দেহে রক্ত সঞ্চালনের চিত্র

দক্ষিণ নিলয় ও অলিন্দের রক্ত সর্বদাই দূষিত এবং বাম নিলয় ও অলিন্দের রক্ত সর্বদাই বিশুদ্ধ থাকে। দক্ষিণ অলিন্দ দূষিত রক্তে পূর্ণ হইলে উহা আপনি সঙ্কুচিত হয় ও রক্ত দক্ষিণ নিলয়ে প্রবেশ করে। অতঃপর দক্ষিণ নিলয় সঙ্কুচিত হইলে দূষিত রক্ত **ফুসফুসীয় ধমনীর** (pulmonary artery) দুই শাখা বাহিয়া দুইদিকের ফুসফুসের জালকে প্রবেশ করে এবং বাতাস হইতে অক্সিজেন গ্রহণ করিয়া ও কার্বন ডাই-অকসাইড ছাড়িয়া দিয়া বিশুদ্ধ হয়। পরে এই বিশুদ্ধ রক্ত ফুসফুসীয় উপশিরা ও শিরার (pulmonary veins) মধ্য দিয়া বাম অলিন্দে প্রবেশ করে। দক্ষিণ নিলয় হইতে ফুসফুস হইয়া বাম অলিন্দে পৌঁছিলে রক্তের এই যে সঞ্চালন ঘটে, ইহাকে **ক্ষুদ্রতর রক্ত সঞ্চালন** (pulmonary circulation) বলে। ইহার পর বিশুদ্ধ রক্ত বাম অলিন্দের সঙ্কোচনের ফলে বাম নিলয়ে যায় এবং সেখান হইতে পুনরায় মহা ধমনীর (aorta) পথে যাত্রা করে।

এই দুই প্রকার রক্ত সঞ্চালন ছাড়াও যে রক্ত-প্রবাহ পাকস্থলী, অগ্ন্যাশয়, যকৃৎ, প্লীহা প্রভৃতির মধ্য দিয়া চলে তাহাকে **পোর্ট্যাল রক্ত সঞ্চালন** (portal circulation) বলে এবং যে ধারা বৃক্কের (kidney) মধ্য দিয়া চলিয়া দূষিত অংশকে মূত্ররূপে ত্যাগ করে তাহাকে **রেন্যাল রক্ত সঞ্চালন** (renal circulation) বলে। এতদ্ব্যতীত হৃৎপিণ্ডের মাংসপেশীর মধ্যে যে বিশুদ্ধ ও দূষিত রক্তের সঞ্চালন ক্রিয়া চলে, তাহাকে **করোনারী রক্ত সঞ্চালন** (coronary circulation) বলে।

চব্বিশ ঘণ্টায় হৃৎপিণ্ড যে পরিমাণ রক্ত পাম্প করে তাহার পরিমাণ দুই হাজার গ্যালনের বেশী হইবে। একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের দেহে তাহার ওজনের প্রায় কুড়িভাগের একভাগ রক্ত রহিয়াছে। আমাদের হাড়ের ভিতর যে মজ্জা আছে, আমাদের শরীরের রক্ত সেই মজ্জার কারখানায় প্রস্তুত হয়।

3. মানবদেহের পচনতন্ত্র

(Digestive System)

এঞ্জিন হইতে শক্তি পাইতে হইলে যেমন উহাতে কয়লা বা পেট্রোল দিতে হয়, আমাদের দেহরস হইতে কর্মশক্তি পাইবার জন্য তেমনই খাদ্যের প্রয়োজন। তা' ছাড়াও শুধু চালু থাকার জন্য দেহের যে-ক্ষয় সর্বদাই ঘটিতেছে, তাহা পূর্ণ করার জন্য খাদ্যের প্রয়োজন। খাদ্য শরীরে প্রবেশ করিয়া নানা প্রকারে পরিবর্তিত হইয়া রক্তস্রোতে মিশিয়া যায় এবং শরীরের সর্বত্র দেহকোষ অথবা দেহতন্ত্রের গঠনে সহায়তা করিতে থাকে।

মুখ (Mouth) ও **দাঁত** (Teeth): মুখে দাঁতের সংখ্যা উপরের পাটিতে 16 এবং নীচের পাটিতে 16। প্রতি পাটিতে সামনের চারিটি **ছেদন দাঁত** (incisor—চিত্রের 1 & 2), উহার দুইদিকে একটি করিয়া দুইটি **শ্বদন্ত** canine—চিত্রের 3), শ্বদন্তের পাশে দুইটি করিয়া চারিটি **চর্বণ দাঁত** (premolar—চিত্রের 4 & 5), এবং মাড়ির শেষ প্রান্তে তিনটি করিয়া ছয়টি **পেষণ দাঁত** (molar—চিত্রের 6, 7 & 8) আছে। দাঁত হাড় না হইলেও হাড়ের মতই জীবন্ত পদার্থ এবং উহার ভিতরেও অসংখ্য নাভতন্তু, রক্তবহা নালী প্রভৃতি রহিয়াছে।

খাদ্য মুখে প্রবেশ করিলে যখন উহা দাঁতের সাহায্যে পিষ্ট হইতে থাকে, তখন মুখের সমস্ত লালাগ্রন্থি হইতে **লালা** (saliva) নিঃসৃত হইয়া খাদ্যের সহিত মিশে। মুখের মধ্যে তিন জোড়া লালাগ্রন্থি (salivary gland) আছে, যথা—(১) কানের নীচের প্যারটিড (parotid) (২) নীচের চোয়ালের পাশে সাবম্যাক্সিলারী (submaxillary), (৩) জিভের নীচে সাবলিঙ্গুয়্যাল (sublingual)। লালা জিনিসটা ঈষৎ **ক্ষারক** (alkaline) এবং বর্ণহীন তরল পদার্থ। প্রতি চব্বিশ ঘণ্টায় আধসের তিনপোয়া লালা আমাদের মুখে

দাঁত
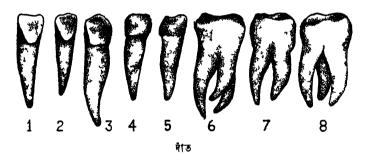
নিঃসৃত হইয়া আমাদের হজমে সাহায্য করে। দাঁতের পেষণে খাদ্য লেইরূপে পরিণত হইলে উহা গিলিবার উপযুক্ত হয়। সুখাদ্যের দৃশ্য, গন্ধ, এমন কি চিন্তাও মুখে লালা বাহির করিয়া আনে এবং খাদ্য মুখে প্রবেশ করা মাত্রই লালা নিঃসরণ আরম্ভ হয়। লালায় **টায়ালিন** নামক একপ্রকার এঞ্জাইম (enzyme) থাকে, উহা শ্বেতসার (starch) জাতীয় অদ্রাব্য খাদ্যগুলিকে দ্রাব্য মল্টোজে পরিণত করিতে থাকে।

জিভ (Tongue): মুখের মধ্যে খাদ্যকে নাড়িয়া চাড়িয়া শক্ত নরম বাছিয়া শক্ত জিনিসকে পেষণ দাঁতে পৌঁছাইয়া দেওয়া ইত্যাদি কাজ করে আমাদের **জিভ**। ইহা ছাড়া খাদ্যের গুণ, স্বাদ প্রভৃতির অনুভূতি আমরা জিভের সাহায্যেই পাই। জিভে উপরকার ছোট ছোট **গুটিকা**গুলি (taste-buds) স্বাদগ্রহণে সহায়তা করে। আমরা জিভের আগায় মিষ্টি ও নোনা আস্বাদ, দুই পাশে টক আস্বাদ, এবং জিভের একেবারে ভিতরের দিকে তিতা ও ধাতব আস্বাদ পাই। গিলিবার সময় খাদ্য পাছে শ্বাসনালীর পথে ঢুকিয়া পড়ে, এইজন্য আমাদের **আলজিভ** (epiglottis) গিলিবার মুহূর্তে শ্বাসনালীর মুখ চাপিয়া রাখে। কোন রকমে একটু ভুল হইয়া গেলে আমরা বিষম খাই।

অন্ননালী (Gullet or Oesophagus) ও **পাকস্থলী** (Stomach): পিষ্ট, পিচ্ছিল ও পিণ্ডাকার খাদ্য গিলিত হইয়া অন্ননালীতে প্রবেশ করিলে সেখানকার পেশীগুলি সংকোচন-প্রসারণের ঢেউ তুলিয়া খাদ্যদ্রব্যকে ঠেলিয়া নীচে পাকস্থলীতে পৌছাইয়া দেয়। অন্ননালীর দৈর্ঘ্য প্রায় 10 ইঞ্চি। পাকস্থলীর প্রবেশ দ্বারকে **কার্ডিয়াক প্রান্ত** (cardiac end) এবং নির্গম দ্বারকে **পাইলরিক প্রান্ত** (pyloric end) বলে। খাদ্য পাকস্থলীতে প্রবেশ করিলে উহার পেশী ও গ্রন্থিগুলি সক্রিয় হয় এবং **গ্যাস্ট্রিক রস** (gastric juice) নামক এক প্রকার অম্লরস নিঃসৃত হইয়া খাদ্যের সহিত মিশিতে থাকে। এই রসে **পেপসিন** ও **রেনিন** নামক এঞ্জাইম এবং কিছু হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড (½%) থাকে। খাদ্যের সহিত কোন জীবাণু আসিলে তাহা ঐ হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডে নষ্ট হইয়া যায়। প্রতি চব্বিশ ঘণ্টায় নিঃসৃত গ্যাস্ট্রিক রসের পরিমাণ প্রায় 10 লিটার হইবে। ইহার প্রায় সবটাই পরে ক্ষুদ্র অন্ত্রে শোষিত হইয়া রক্তে চলিয়া যায়। পাকস্থলীতে প্রোটিন-খাদ্য পেপসিন দ্বারা হজম হইতে থাকে। হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড কম পড়িলে এই প্রোটিন হজম ব্যাহত হয় এবং গ্যাস্ট্রিটিসের ব্যথা হইতে পারে। প্রোটিন হজম হইয়া এখানে **পেপটোনে** (peptones) পরিণত হয়। খাবার দুই ঘণ্টা পরে পাকস্থলীতে অর্ধজীর্ণ শ্বেতসার, পেপটোন, চর্বির ইমালশন, সেলুলোজের অকেজো অংশ (roughage) ও গ্যাস্ট্রিক রস থাকে। পাকস্থলীর সাধারণ দৈর্ঘ্য প্রায় দশ ইঞ্চি ও আয়তন দুই পাইন্টের বেশী নহে। কিন্তু অর্ধতরল খাদ্যে পূর্ণ হইলে পাকস্থলীর আয়তন বাড়িয়া প্রায় পাঁচ লিটার হয়। পাকস্থলীতে খানিকটা পেপটোন কৈশিক নালীর মারফত রক্তস্রোতে মিশিয়া যায়।

পাকস্থলীর অর্ধতরল অর্ধজীর্ণ খাদ্য (উহাকে **কাইম** chyme বলে) অতঃপর **ডুয়োডেনাম** বা গ্রহণী (duodenum) নামক নলে প্রবেশ করে এবং নীচে নামিতে নামিতে যকৃৎ হইতে **পিত্তরস** (bile) এবং **অগ্ন্যাশয়** (pancreas) হইতে **অগ্ন্যাশয় রসের** (pancreatic juice) সহিত মিশে, যকৃতের পাশে **পিত্তাশয়** (gall bladder) অব্যবহৃত অতিরিক্ত পিত্তরস সঞ্চয় করিয়া রাখে। পাকস্থলী হইতে খাদ্য একসঙ্গে বাহির হয় না। পাকস্থলীর নির্গম প্রান্ত **পাইলোরাস** (pylorus) এমনভাবে কাজ করে যাহাতে পাকস্থলীর অ্যাসিড

মিশ্রিত **কাইম** ক্ষুদ্রান্ত্রে পৌঁছিলে উহার অম্লত্ব ঐ সকল রসের দ্বারা ক্ষারত্বে (alkaline) পরিণত হয়। এজন্য পাকস্থলীর খাদ্য থামিয়া থামিয়া বাহির হয়। যকৃৎ হইতে যে পিত্তরস বাহির হয়, তাহার পরিমাণ 24 ঘণ্টায় 2½ পাউণ্ডের কম হইবে না এবং অগ্ন্যাশয় রসের পরিমাণও ঐ সঙ্গে প্রায় তিন-চতুর্থাংশ পাইন্ট হইবে। এই শেষোক্ত রস **ক্ষারমূলক** (alkaline)। ইহাতে প্রোটিন হজম করিবার জন্য **ট্রিপসিন** নামক এঞ্জাইম, চর্বি হজম করিবার জন্য **লাইপেজ** নামক এঞ্জাইম এবং স্টার্চ হজম করিবার জন্য **অ্যামাইলেজ** নামক এঞ্জাইম থাকে। পিত্তরস চর্বিকে ইমালশন্ করিতে এবং অন্ত্রে রেচনের কাজে (purging) সহায়তা করে।

খাদ্য কিভাবে রক্তস্রোতে প্রবেশ করে : ডুয়োডেনামে কাইম আরো তরল হইয়া **কাইলে** (chyle) পরিণত হইয়া **ক্ষুদ্রান্ত্রে** (small intestine) প্রবেশ করে। ক্ষুদ্রান্ত্রের দৈর্ঘ্য প্রায় 23 ফুট। এখানে যে **ক্ষুদ্রান্ত্র রস** (intestinal juice) নিঃসৃত হয়, তাহার মধ্যে (ক) **ইরেপসিন** (erepsin) নামক এঞ্জাইম পেপটোনকে অ্যামিনো অ্যাসিডে, (খ) **সুক্রেজ** নামক এঞ্জাইম শর্করাকে গ্লুকোজ ও ফ্রাক্টোজে, (গ) **ল্যাকটেজ** নামক এঞ্জাইম দুগ্ধশর্করাকে (lactose) গ্লুকোজ ও গ্যালাকটোজে, (ঘ) **মল্টেজ** নামক এঞ্জাইম মল্টোজকে গ্লুকোজে পরিণত করে। ক্ষুদ্রান্ত্রের গায়ে অসংখ্য অতি সূক্ষ্ম নলের মত **ভিলাই** (villi) থাকে., ঐ পথে খাদ্যরস (digested food) রক্তস্রোতের সহিত মিশিয়া যায়। ক্ষুদ্রান্ত্রের এক তৃতীয়াংশ পথ যাইবার মধ্যেই খাদ্যের পেপটোন ও স্টার্চ হজম হইয়া রক্তে চলিয়া যায়, কিন্তু চর্বি আরও নীচে গিয়া পেটের **লসিকা গ্রন্থির** (lymphatic glands) মারফত রক্তের শিরায় পৌঁছে। রক্তস্রোতে মিশিয়া খাদ্য আমাদের সর্বাঙ্গে দেহকোষগুলির পুষ্টিসাধন করে। ফুসফুস হইতে রক্ত যে অক্সিজেন বহন করিয়া আনে, তাহার সহিত খাদ্যরসের দহনের ফলে আমরা **শক্তি** (energy) লাভ করি।

এঞ্জাইমের কার্য (Action of enzymes) : কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন অথবা ফ্যাট জাতীয় বিভিন্ন খাদ্য আমাদের শরীরে প্রবেশ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের কোন প্রকার কাজে লাগে না। শরীরে গ্রহণের উপযুক্ত করিবার জন্য উহাদিগকে মুখে, পাকস্থলীতে ও ক্ষুদ্রান্ত্রে নানা প্রকারে পরিবর্তিত করা হয় এবং এই পরিবর্তনের কাজ করে এঞ্জাইম নামক পদার্থ। শরীরের বিভিন্ন

গ্রন্থি বা গ্ল্যাণ্ড হইতে ইহারা নিঃসৃত হয় এবং অতি অল্প পরিমাণে থাকিয়া ইহারা অনেকখানি রাসায়নিক পরিবর্তন সাধন করিতে পারে। এইজন্য এঞ্জাইম বলিতে **উদ্ভিদ্ বা প্রাণীর দেহকোষ হইতে উৎপন্ন একপ্রকার অনুঘটক** (catalyst) বোঝা যায়। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে, 40° সে, উষ্ণতায় এক ভাগ ওজনের অ্যামাইলেজ নামক এঞ্জাইম (ইহা অগ্ন্যাশয় হইতে নিঃসৃত হয়) যথেষ্ট সময় পাইলে 40 লক্ষ ভাগ ওজনের শ্বেতসারকে পরিবর্তিত করিয়া 28 লক্ষ ভাগ মল্টোজে পরিণত করিতে পারে। স্টার্চ বা শ্বেতসার মল্টোজে পরিবর্তিত হইবার পর ক্ষুদ্রান্ত্রে গিয়া মল্টেজ নামক এঞ্জাইমের সাহায্যে গ্লুকোজে পরিণত হইয়া তবে আমাদের দেহের কাজে লাগে। এঞ্জাইম নানা-প্রকারের হয় এবং কোন বিশেষ এঞ্জাইমের কাজ অপর এঞ্জাইম করিতে পারে না।

নিম্নে কয়েক শ্রেণীর এঞ্জাইম উল্লেখ করা হইল :

(ক) প্রোটিন ভাঙিবার এঞ্জাইম, নাম—**প্রোটিয়েজ** (protease)
(খ) চর্বি বা ফ্যাট ভাঙিবার এঞ্জাইম, নাম—**লাইপেজ** (lipase)
(গ) স্টার্চ ভাঙিবার এঞ্জাইম, নাম—**এমাইলেজ** (amylase)
(ঘ) শর্করা ভাঙিবার এঞ্জাইম, নাম—**সুক্রেজ** (sucrase)
মল্টেজ (maltase),
ল্যাকটেজ (lactase)।

(ঙ) জমাট বাঁধানো এঞ্জাইম, যথা—
রক্ত জমাট বাঁধাইবার জন্য **থ্রম্বেজ** (thrombase)
দুধ হইতে ছানা জমাইতে **রেনিন** (rennin)।

ইহা ছাড়াও নানাপ্রকার এঞ্জাইমের বিষয় জানা আছে। এঞ্জাইম পদার্থটির রাসায়নিক সংযুতি সম্পূর্ণ জানা নাই। তবে ইহার ভিতরে কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন আছে, ইহা নিশ্চিত। আমাদের হজমের

কাজে যে এঞ্জাইমগুলি লাগে, তাহাদের কাজ ও উৎপত্তিস্থল নিম্নে দেখানো হইল :

	এঞ্জাইম	উৎপত্তিস্থল	পরিবর্তনের কাজ
কার্বো-হাইড্রেটের জন্য	টায়ালিন (লালার অ্যামাইলেজ)	লালাগ্রন্থি	স্টার্চ হইতে মল্টোজ ও ডেকস্ট্রিন
	অ্যামিলপসিন (অগ্ন্যাশয়ের,)	অগ্ন্যাশয়	,, ,, ,, ,,
	ইনভারটেজ (সুক্রেজ)	ক্ষুদ্র অন্ত্র	শর্করা হইতে গ্লুকোজ ও ফ্রাকটোজ
	মল্টেজ	,,	মল্টোজ হইতে গ্লুকোজ
	ল্যাকটেজ	,,	ল্যাকটোজ হইতে গ্লুকোজ ও গ্যালাকটোজ
প্রোটিনের জন্য	পেপসিন	পাকস্থলী	প্রোটিন হইতে পেপটোন ও প্রোটিয়েজ
	ট্রিপসিন	অগ্ন্যাশয়	,, ,, ,, ,, এবং অ্যামিনো অ্যাসিড
	ইরেপসিন	ক্ষুদ্র অন্ত্র	পেপটোন হইতে অ্যামিনো অ্যাসিড
চর্বির জন্য	লাইপেজ	পাকস্থলী ও অগ্ন্যাশয়	চর্বি বা ফ্যাট হইতে গ্লিসারিন ও ফ্যাটি অ্যাসিড

লিভারের কার্য (Action of the liver): রক্তস্রোতে গ্লুকোজ নিয়ন্ত্রিত করা লিভারের প্রধান কার্য। ক্ষুদ্রান্ত্র হইতে গ্লুকোজ রক্তে মিশিয়া গেল, তাহা পোর্ট্যাল শিরার পথে লিভারে পৌঁছিলে লিভারের কোষগুলি (liver cells) গ্লুকোজকে গ্লাইকোজেন নামক 'প্রাণিজ স্টার্চে' (animal starch) পরিণত করিয়া সঞ্চয় করিয়া রাখে। দেহযন্ত্রে যখনই কোথাও কাজ করিবার জন্য গ্লুকোজের চাহিদা হয়, তখনই লিভার সঞ্চিত গ্লাইকোজেনকে গ্লুকোজে পরিণত করিয়া কর্মক্ষেত্রে পাঠাইয়া দেয়। রক্তে সাধারণতঃ 0·1% এর বেশী গ্লুকোজ থাকে না, থাকা উচিতও নয়। **অ্যাড্রিন্যালিন** (adrenalin) নামক হরমোনের (hormone) সহায়তায় লিভার এই কাজ নিয়ন্ত্রণ করিতে থাকে। রক্ত দেহের কোষে কোষে গ্লুকোজের যোগান দেয় এবং এই কাজে রক্তের সহায়ক আর এক প্রকার হরমোন। উহার নাম **ইনসুলিন** (insulin) এবং উহার উৎপত্তিস্থান অগ্ন্যাশয়। এই ইনসুলিন যদি রক্তে না থাকে অথবা কম

পড়ে, তাহা হইলে রক্ত দেহকোষে গ্লুকোজ দিতে পারে না, ফলে রক্তে গ্লুকোজ জমিয়া যায় এবং বহুমূত্র বা ডায়াবেটিস (diabates) নামক রোগ দেখা দেয়।

খাদ্য বেশী গ্রহণ করিলে এবং ভাল হজম হইলে উহার শর্করা চর্বিতে পরিণত হইয়া চামড়ার নীচে জমে। অসুস্থ হইয়া অথবা অন্য কোন কারণে শরীরের যখন দুর্দিন উপস্থিত হয়, তখন লিভার রক্তস্রোতের মারফৎ ঐ চর্বি ফিরাইয়া আনিয়া দেহযন্ত্রের কাজে লাগায়। আমাদের খাদ্যের প্রোটিন ক্ষুদ্রান্ত্র হইতে **অ্যামিনো অ্যাসিডরূপে** (amino acid) রক্তের সহিত মিশিয়া যায়, দেহের সর্বত্র পৌঁছিয়া উহা দেহকোষের পুষ্টি ও সংস্কার সাধন করিতে থাকে এবং নূতন নূতন কোষ গঠন করিতে থাকে। আমাদের শরীরে কার্বোহাইড্রেট ও চর্বি তাপশক্তি যোগায় কিন্তু প্রোটিন না হইলে সংস্কার ও নির্মাণ কার্য চলে না। অ্যামিনো অ্যাসিডের কাজ শেষ হইলে বাড়তি অ্যামিনো অ্যাসিড রক্তের সহিত লিভারে পৌঁছে, লিভার তখন উহাকে গ্লুকোজে পরিবর্তিত করিয়া দেয় যাহাতে উহা রক্তের সহিত মিশিয়া অতঃপর তাপ ও শক্তির সৃষ্টি করিতে পারে। লিভারের আর একটি প্রধান কাজ পিত্তরস (bile) উৎপন্ন করিয়া ক্ষুদ্রান্ত্রে খাদ্যের সহিত মিশাইয়া দেওয়া। এই পিত্তরস রক্তের লোহিত কণিকার ধ্বংসাবশেষ মাত্র। লিভারকে শরীরের **শোধনাগার** (clearing house) বলা হয়। এখানে নাইট্রোজেনঘটিত যাহা কিছু আবর্জনা ও অপ্রয়োজনীয় পদার্থ রক্তে জমে (যেমন ইউরিয়া), তাহা একত্র করিয়া দেওয়া হয়, পরে ঐ রক্ত বৃক্কে (kidneys) গেলে এ সকল আবর্জনা বিষাক্ত পদার্থ মূত্ররূপে বাহির হইয়া যায়। প্রায় তিন পাউণ্ড ওজনের এই লিভার যন্ত্রটি আমাদের শরীরের একটি অন্যতম প্রধান যন্ত্র (organ)।

7. খাদ্য (Food)

কয়লা না দিলে যেমন এঞ্জিন চলে না, খাদ্য না পাইলে আমাদের দেহযন্ত্রও তেমনিই চলিতে পারে না। আবার এঞ্জিনে কয়লার কার্বনটুকু শুধুই জ্বলিয়া যায়, ছাই পড়িয়া থাকে, শরীরেও তেমনি খাদ্যের যেটুকু আমাদের গ্রহণ করিবার যোগ্য, সেইটুকুই আমরা গ্রহণ করিয়া হজম করিয়া লই, অসার আবর্জনা অংশ মল মূত্র-ঘর্মরূপে বাহির হইয়া যায়। কিন্তু দেহ এঞ্জিন নহে, কারণ খাদ্য আমাদের শরীরে প্রবেশ করিয়া যেমন আমাদিগকে কাজ করিবার শক্তি যোগায়, তেমনিই আমাদের দেহের সহিত মিশিয়া এক হইয়া যায়, কিন্তু

কয়লার সহিত এঞ্জিনের কোন সম্পর্ক নাই। খাদ্য আমাদের দেহের গঠনে, বৃদ্ধিতে এবং ক্ষয়-ক্ষতি পূরণ করিতে সাহায্য করিয়া দেহেরই অংশবিশেষে পরিণত হয়।

সকল দেশের সকল মানুষের খাদ্য পর্যালোচনা করিলে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, স্বাভাবিক নিয়মেই মানুষ এমন সকল খাদ্য অন্যান্য উদ্ভিদ্ অথবা প্রাণীর দেহ হইতে সংগ্রহ করিয়া লইয়াছে, যাহা তাহার বাঁচিবার পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়। যখন মানুষ বিজ্ঞান জানিত না, তখনও যে-সকল খাদ্য সে প্রকৃতি হইতে সংগ্রহ করিত, তাহার মধ্যে সামঞ্জস্য থাকিত। ক্ষেত্রের শস্যের সহিত শিকারের মাংস এবং বনের ফলমূল তাহাকে যে-খাদ্য যোগাইত, তাহা আজিকার ভাষায় সুষম (balanced) ছিল। সে-হিসাবে আমাদের বর্তমান জীবন প্রকৃতি হইতে দূরে সরিয়া আসার জন্য আমাদের সামঞ্জস্য ক্ষুণ্ণ হইয়াছে।

বিজ্ঞানের ভাষায় আমাদের খাদ্যের প্রধান উপাদান (ক) **কার্বোহাইড্রেট**[১] বা শ্বেতসার জাতীয় পদার্থ, (খ) **প্রোটিন**[২] বা আমিষ জাতীয় পদার্থ, (গ) **ফ্যাট**[৩] বা চর্বি জাতীয় পদার্থ। আমাদের খাদ্যের মধ্যে ভাত, রুটি, ডাল, আলু, গুড, চিনি প্রভৃতি পদার্থ কার্বোহাইড্রেট-প্রধান, মাছ, মাংস, ডিম প্রভৃতি প্রোটিন-প্রধান, মাখন, ঘি ও বিভিন্ন তেল ফ্যাট-প্রধান। খাদ্য আমাদের শরীরে প্রবেশ করিলে মুখের লালা এবং পাকস্থলীর ক্ষুদ্রান্ত্রের নানাপ্রকার জারক রস (digestive juices) এবং এঞ্জাইমের সাহায্যে ভাঙিয়া চুরিয়া কয়েকটি সরল যৌগিক পদার্থে (simpler chemical compounds) পরিণত হয়। তখন সেই সকল সরল পদার্থগুলি (যেমন, গ্লুকোজ, অ্যামিনো অ্যাসিড ইত্যাদি) রক্তের সহিত মিশিয়া দেহের কোষে পৌঁছে এবং সেখানকার দেহকোষের সংস্কার সাধন করিতে থাকে। ফুসফুস হইতে রক্তের হিমোগ্লোবিন অক্সিজেন গ্রহণ করিয়া অক্সি-হিমোগ্লোবিনে

১। কার্বোহাইড্রেটের উপাদান কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন। শেষের দুইটি জলের অনুপাতে আছে বলিয়া কার্বোহাইড্রেট বলা হয়। গরম করিলে জল বাহির হইয়া যায়, কয়লা পড়িয়া থাকে।

২। প্রোটিন অত্যন্ত জটিল পদার্থ। উহাতে কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন থাকে। কখনো বা সালফার, ফসফরাসও থাকে।

৩। ফ্যাটের উপাদানও কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন। উহাতে গ্লিসারিন ও ফ্যাটি অ্যাসিড মিলিত হইয়া আছে।

পরিণত হয়। এই অক্সিহিমোগ্লোবিন দেহকোষের গ্লুকোজের দহনে সাহায্য করে, ইহার ফলে **তাপ ও শক্তির** উদ্ভব হয়।

গ্লুকোজ + অকসিজেন = কার্বন ডাই-অকসাইড + জল + শক্তি

দহনের ফলে দেহকোষে যে-সকল অসার পদার্থের (waste products) সৃষ্টি হয়, রক্ত সে-সকল সংগ্রহ করিয়া শিরার পথে ফিরিয়া যায়। পরে ফুসফুস, কিডনী এবং ঘর্মগ্রন্থির মারফত সেই সকল পদার্থ শরীর হইতে বাহির হইয়া যায়। খাদ্যের দহন অথবা অন্যান্য পরিবর্তনে যে **শক্তি** উৎপন্ন হয়, তাহা ব্যবহৃত হয় আমাদের

(ক) পেশীর কাজে,

(খ) শরীর গরম রাখিবার জন্য,

(গ) শ্বাসকার্য, হৃৎস্পন্দন প্রভৃতি শারীরিক ক্রিয়ায়,

(ঘ) হজম যন্ত্রগুলির ক্রিয়ায়।

শক্তি (Energy): আমাদের প্রয়োজনীয় **যাবতীয় শক্তি আমরা খাদ্য হইতে লাভ করি**। কোন খাদ্য বাহিরের অকসিজেনে পোড়াইলে যতখানি শক্তি পাওয়া যায়, শরীরের ভিতরকার দহন ক্রিয়াতেও ঐ খাদ্য সেই একই পরিমাণ শক্তি দিবে ইহা প্রমাণিত সত্য। কাজেই কোন খাদ্যের শক্তি উৎপাদনের ক্ষমতা আমরা ল্যাবরেটরীতে নির্ণয় করিতে পারি। পরীক্ষা করিয়া জানা গিয়াছে যে, কার্বোহাইড্রেটের ও প্রোটিনের শক্তি দিবার ক্ষমতা সমান এবং ফ্যাটের শক্তি দিবার ক্ষমতা প্রায় উহার দ্বিগুণ। এক আউন্স ফ্যাট হইতে যে শক্তি পাওয়া যায়, তাহা এক আউন্স কার্বোহাইড্রেট অথবা প্রোটিন হইতে যতখানি শক্তি পাওয়া যায়, তাহার দ্বিগুণেরও কিছু বেশী। অনুপাতে কার্বোহাইড্রেট : প্রোটিন : ফ্যাট = 4 : 4 : 9। আমাদের খাদ্য হইতে আমরা যে শক্তি লাভ করি, তাহার খানিকটা ব্যবহৃত হয় আমাদের নিছক বাঁচিয়া থাকার জন্য। যদি আমরা একেবারে অলস হইয়া শুইয়া থাকি, তাহা হইলেও আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাস, রক্তসঞ্চালন, পরিপাক ক্রিয়া প্রভৃতি অবিরাম চলিতে থাকে এবং আমাদের মস্তিষ্কের কাজও একেবারে বন্ধ থাকে না। এই নিম্নতম দৈহিক ও মানসিক ক্রিয়ার জন্য চব্বিশ ঘণ্টায় একজন পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির প্রায় 1600 কিলোক্যালরি (1 কিলোক্যালরি = 1000 ক্যালরি) শক্তির প্রয়োজন। ইহাকে **নিম্নতম বিপাক** (basal metabolism) বলে। বিশ্রামের সময়

আমাদের শরীরে যে-হারে দহন ক্রিয়া চলিতে থাকে, পেশীর কাজ আরম্ভ হইলে তৎক্ষণাৎ দহনের হারও বাড়িয়া যায় এবং আমরা জোরে নিঃশ্বাস লইয়া দহন বাড়াইয়া দিই। নিম্নে বিভিন্ন ব্যক্তির দৈনিক **ক্যালরি প্রয়োজনীয়তা** (caloric requirements) দেওয়া হইল (কিলোক্যালরিতে)।

পুরুষ (120 পাউণ্ড ওজন)	হাল্‌কা কাজ	2000
	মাঝারি কাজ	3000
	কঠোর পরিশ্রম	3600
স্ত্রীলোক (160 পা. ওজন)	হাল্‌কা কাজ	2100
	মাঝারি কাজ	2500
	কঠোর কাজ	3000
	সন্তান বহন	2100
	সন্তান পালন	2700
বালক (12—15 বৎসর)	স্বাভাবিক কাজ	2400
(15—21 বৎসর)		2400

N. B.—Prepared by the Nutrition Advisory Committee of the Indian Research Fund Association (now Indian Council of Medical Research) in 1944

শক্তি উৎপাদনই খাদ্যের একমাত্র কাজ নহে। যে-শিশু অথবা বালক-বালিকা বাড়িয়া উঠিতেছে, তাহার খাদ্যে শরীরের নূতন নূতন দেহকোষ গড়িয়া তোলার উপাদান থাকার প্রয়োজন। তাছাড়া আমাদের দেহকোষের ক্ষয় ও সংস্কার দেহের মধ্যে সবদাই চলিতে থাকে বলিয়াও খাদ্যের প্রয়োজন হয়। দেহকোষ গড়িয়া তোলা অথবা উহার সংস্কারের কাজে **প্রোটিনের** প্রভাব সর্বাপেক্ষা বেশী। এজন্য আমাদের মোট যতখানি ক্যালরির বা তাপশক্তির প্রয়োজন তাহার সমস্তটাই কোন এক প্রকার খাদ্য হইতে গ্রহণ করিলে চলিবে না। বিশেষজ্ঞদের মতে মোট ক্যালরির 10-12% প্রোটিন হইতে, 25-30% ফ্যাট হইতে এবং অবশিষ্ট (অর্থাৎ প্রায় 60%) কার্বোহাইড্রেট হইতে আসা উচিত। বাড়ন্ত শিশু ও বালক-বালিকার পক্ষে এবং সন্তানবতী মাতার পক্ষে এই অনুপাতের পরিবর্তন হওয়া উচিত এবং প্রোটিন বেশী থাকা উচিত। প্রোটিন কথাটির অর্থ প্রথম (protos=first); সত্যই **দেহপুষ্টিতে প্রোটিনের স্থান সর্ব প্রথমে।**

খাদ্য হইতে আমরা যে আঁশালো **সেলুলোজ** এবং হেমিসেলুলোজ গ্রহণ করি, তাহাও কার্বোহাইড্রেট। নানাপ্রকার তরকারি, শাকসব্‌জিও ও ফলমূলে

ঐ সেলুলোজ থাকে। ইহা আমরা হজম করিতে পারি না বলিয়া মলের সহিত ইহা নিঃসৃত হইয়া যায়। কিন্তু খাদ্যে এইরূপ অকেজো অংশের প্রয়োজন আছে। কারণ, ইহারা আমাদের খাদ্যের আয়তন (bulk) বাড়াইয়া অন্ত্রের সঙ্কোচন-প্রসারণের কাজে (peristalsis) সহায়তা করে। খাদ্যের এইরূপ অসার অথচ প্রয়োজনীয় অংশকে **রাফেজ** (roughage) বলে।

আমাদের কয়েকটি প্রধান খাদ্যের কার্বোহাইড্রেট, ফ্যাট ও প্রোটিনের শতকরা পরিমাণ এবং উহাদের শক্তি যোগাইবার ক্ষমতা নিম্নে দেওয়া হইল।

খাদ্য	কার্বোহাইড্রেট	ফ্যাট	প্রোটিন	খনিজ	Ca	P	Fe mg/100 g.	Cal. value K. Cal. Per 100 g.
কলে ছাঁটা সিদ্ধ চাল	79 I	0·4	6·4	0·8	·01	·15	2·2	346
গম (আটা)	72·2	1·7	12·1	1·8	·04	·32	7·3	353
ডাল মসুর (lintil)	59 7	·7	25·1	4	·13	·25	2	346
মুগ	56.6	1·1	19·7	4 5	·07	·3	4·4	315
আলু (7% জল)	22·9	·1	1·6	·6	·01	·03	·7	99
বেগুন (92% জল)	6·4	·3	1 3	·5	·02	·06	1.3	34
মিঠা আলু (68% জল)	31	·3	1·2	·1	·02	·05	·8	132
কাঁচা কলা (75% জল)	14·7	·2	1·4	·5	·01	·03	·6	66
কুমড়া (92% জল)	5 3	·1	1·4	·6	·01	·03	·7	28
ফুলকপি (89% জল)	5·3	·4	3·5	1·4	·03	·06	1·3	39
বাঁধাকপি (90% জল)	6·3	·1	1·8	·6	·03	·05	·8	33
পেঁয়াজ (84% জল)	13·2	·1	1·8	·6	·04	·06	1·2	61
টম্যাটো (92% জল)	4·5	·1	1·9	·7	·12	·04	2·4	27
নারিকেল (36 3 জল)	13	41	4·5	1	01	·24	1.7	444
বাদাম (5% জল)	10·5	58·9	20·8	2 9	·23	·49	3·5	655
আপেল (86% জল)	39·4	·2	1·3	·7	·01	·05	·4	153
লেবু (85% জল)	13·4	·1	·3	·3	·01	·02	1·7	56
কলা (পাকা (61% জল)	11·1	·9	1	·3	·07	·01	2·3	57
কমলা লেবু (87% জল)	10·6	·3	·9	·4	·05	·02	·1	49
পাকা আম (76% জল)	11.8	·1	·6	·3	·01	·02	·3	50
হাঁসের ডিম (71% জল)	·7	13·7	13·5	·1	·07	·26	·3	180
পাঁটার মাংস (71% জল)	·5	13·8	18·5	1·3	·15	·15	2·5	194
মাঝারি মাছ (78% জল)	·2	1·6	21·5	2	·06	·41	2·3	100
মুরগীর মাংস (72% জল)	·3	·6	25·6	1·3	·03	·25	—	109
গরুর দুধ (87·6% জল)	4·8	3·6	3·3	·7	12	·09	·2	65
মহিষের দুধ (81% জল)	5·1	8·8	4·3	·8	·21	·13	·2	117

100g = 3·5 oz. = 8·62 tolas

ভিটামিন বা **খাদ্যপ্রাণ** (Vitamin) : খাদ্যে কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন ও ফ্যাট উপযুক্ত পরিমাণে থাকিলেই যে আমাদের দেহযন্ত্রের সকল প্রকার প্রক্রিয়া সুচারুরূপে চলিতে পারে, এরূপ নহে। দেহের স্বাভাবিক ভাঙা-গড়ার ক্রিয়ার (বিপাক বা metabolism) যেমন শক্তি-উৎপাদক খাদ্য ছাড়াও ক্যালসিয়াম-ফস্‌ফরাস-লৌহ প্রভৃতি খনিজ পদার্থের প্রয়োজন হয়, তেমনই প্রাকৃতিক খাদ্যে (natural food-stuff) এমন কতকগুলি জৈব পদার্থ অতি অল্প পরিমাণে থাকার প্রয়োজন হয় যাহার অভাবে শরীরের ভাঙা-গড়ার কাজ শুধু যে ভালভাবে চলে তাহা নহে, শরীরে নানাপ্রকার ব্যাধি দেখা দেয়। ঐ সকল জৈব পদার্থকে **ভিটামিন** বলে। ইহাদের পরিমাণ খাদ্যদ্রব্যে অতি অল্পই থাকে, অনেক সময় এত অল্প থাকে যে উহাকে পৃথক্ করিয়া আনিয়া উহার প্রকৃতি নির্ণয় করা (to study its properties) অসম্ভব হয়। বেরিবেরি, স্কার্ভি, রিকেট্‌স্, পেলাগ্রা প্রভৃতি রোগ কেন হইত, তাহা পূর্বে জানা ছিল না। খাদ্যে সকল প্রকার উপাদান এবং লবণ থাকা সত্ত্বেও ঐ সকল দুঃসাধ্য ব্যাধির আক্রমণে কত লোক আজীবন পঙ্গু হইয়া থাকিত অথবা মারা যাইত। পরে দেখা গেল, টাট্‌কা শাকসব্‌জি ফলমূল, টাট্‌কা মাখন, কড, শার্ক প্রভৃতি মাছের লিভারের তেল ঐ সকল রোগের ঔষধ ও প্রতিষেধক। গত অর্ধ শতাব্দী ধরিয়া খাদ্য-বিজ্ঞানীদের চেষ্টায় ঐ সকল টাট্‌কা ও প্রাকৃতিক খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে অনেকগুলি ভিটামিনের অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে। যে সকল রোগ বিশেষ বিশেষ ভিটামিনের অভাবে দেখা দেয়, তাহাদিগকে **অভাবজনিত ব্যাধি** (deficiency diseases) বলে।

ভিটামিনগুলি শরীরের গঠন প্রত্যক্ষভাবে কোন অংশ গ্রহণ করে না, উহা অতি অল্প পরিমাণে বর্তমান থাকিয়া শরীরের নানাপ্রকার মেটাবলিজমে সাহায্য করে মাত্র। রসায়নের ভাষায় এইরূপ পদার্থকে **অনুঘটক** (catalyst) বলে। বিভিন্ন ভিটামিন এ, বি, সি, ডি, প্রভৃতি অক্ষর দ্বারা সূচিত হয়। ভিটামিন মোটামুটি তিন শ্রেণীতে বিভক্ত : (ক) জলে দ্রাব্য ভিটামিন, (খ) ফ্যাটে দ্রাব্য ভিটামিন। এ-, ডি-, ই- এবং কে-ভিটামিন ফ্যাটে দ্রাব্য (fat-soluble) এবং বি-1, বি-2 প্রভৃতি ভিটামিন এবং সি-ভিটামিন জলে দ্রাব্য (water-soluble)। এখানে কয়েকটি ভিটামিনের কথা বলা হইল।

(ক) **এ-ভিটামিন:** এ-ভিটামিন আমাদের শরীরের টিস্যু গঠনে এত প্রয়োজনীয় যে, শৈশবে ইহার অভাব ঘটিলে চক্ষুরোগ, দাঁতের পাইওরিয়া, চামড়ার রুক্ষতা প্রভৃতি জন্মে। আমাদের শরীরে বিশেষত লিভারে আমরা এ-ভিটামিন সঞ্চয় করিয়া রাখি। শিশুদের খাবারের সঙ্গে কডলিভার বা হ্যালিবাট লিভারের তেল দিলে এ-ভিটামিনের অভাব পূর্ণ হয়। ভারতবর্ষে ইদানীং এই উদ্দেশ্যে হাঙ্গরের লিভার হইতে যে তেল প্রস্তুত হইতেছে, তাহা আমদানী-করা কডলিভার তেলের চাইতে বেশী এ-ভিটামিন-সমৃদ্ধ। গাজর এবং অনেক সবুজ শাকে **ক্যারোটিন** নামে একপ্রকার হলদে রংয়ের পদার্থ আছে। ইহা এ-ভিটামিন না হইলেও শরীরের এ-ভিটামিনের অভাব পূর্ণ করে। এইজন্য ইহাকে এ-প্রোভিটামিন (A-provitamin) বলে। দুধ, মাখন, ডিম, লিভার, টম্যাটো, পালং, স্কোয়াস প্রভৃতি খাদ্য হইতে আমরা এ-ভিটামিন এবং ক্যারোটিন পাই। পাকা আম, পেঁপে, লেবু ও টম্যাটোতে ক্যারোটিন আছে। একজন পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির প্রয়োজন দৈনিক 3000—4000 আন্তর্জাতিক ইউনিট এ-ভিটামিন (1 আন্তর্জাতিক ইউনিট = 0.0006 মিলিগ্রাম ক্যারোটিন)। রান্নায় এ-ভিটামিন তেমন নষ্ট হয় না।

(খ) **বি-ভিটামিন:** বি-ভিটামিন বলিতে কয়েকটি ভিটামিনের সমষ্টি বুঝা যায়। ইহারা জলে দ্রাব্য। ইহাদের মধ্যে বি-1 ভিটামিনের অভাব বেরিবেরির কারণ এবং উহার রাসায়নিক নাম **থায়ামিন**। চাউলের দানার পাতলা আবরণে এই থায়ামিন থাকে। কলে ছাটা সিদ্ধ চাউলে থায়ামিন ঠিকই থাকে, কিন্তু কলে ছাটা আতপ চাউলে ইহা থাকে না। চাউল বেশী ধুইলে অথবা সিদ্ধ করিয়া বেশী ফেন ফেলিয়া দিলে এই ভিটামিন এবং চাউলের ফস্‌ফরাস, নিকোটিনিক অ্যাসিড প্রভৃতি বাহির হইয়া যায়। ডালে, চিনাবাদামে, আটায় ইহা থাকে। দুধ, মাছ, মাংস, ফল ও অন্যান্য তরকারীতে এই ভিটামিন প্রায় থাকে না। একজন পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির দৈনিক প্রয়োজন ইহার এক মিলিগ্রাম।

বি-২ সমষ্টি (B_2 complex) ভিটামিন আমাদের শরীরের পুষ্টি ও রক্ষার জন্য একান্ত প্রয়োজন। **নিকোটিনিক অ্যাসিড, রিবোফ্ল্যাবিন, ফোলিক অ্যাসিড, বায়োটিন** প্রভৃতি কয়েকটি পদার্থ ইহার অন্তর্গত। এই সমষ্টি-ভিটামিনের অভাবে পেলাগ্রা, চক্ষুরোগ, মুখে ঘা, চামড়ার

রোগ প্রভৃতি জন্মে। চাল, আটা, দুধ, ডিম, লিভার প্রভৃতি হইতে আমরা এই ভিটামিন পাই। ইহার অভাব মিটানোর জন্য নানাপ্রকার উৎকৃষ্ট ঔষধ পাওয়া যায়। খাদ্য ফুটাইলে এই সকল ভিটামিন বিশেষ নষ্ট হয় না।
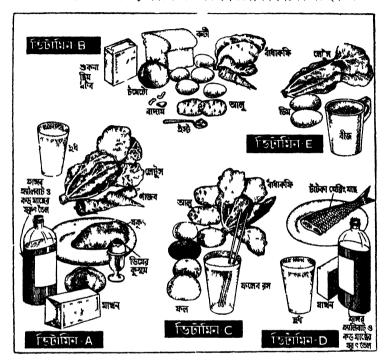
(গ) **সি-ভিটামিন:** ইহার নাম **অ্যাসকরবিক অ্যাসিড**। এই ভিটামিনের অভাবে স্কার্ভি রোগ জন্মে। দাঁতের গোড়া ফুলা, অতিরিক্ত রক্তপাত, মাথাধরা, পিঁচুনি প্রভৃতি স্কার্ভি রোগের লক্ষণ। লেবু, টম্যাটো, পালং, অঙ্কুরিত মুগ বা ছোলা এবং বিশেষভাবে আমলকী এই ভিটামিনের আধার। একজন পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির খাদ্যে দৈনিক 30—50 মিলিগ্রাম এই সি-ভিটামিন থাকা উচিত। খাদ্য ফুটাইলে এই ভিটামিন বেশীর ভাগই নষ্ট হইয়া যায়।

(ঘ) **ডি-ভিটামিন:** এই ভিটামিনের অভাবে হাড়ের গঠন খারাপ হইয়া রিকেটস্ হয়। হাঙর-লিভার ও কড-লিভার ও কবাতমাছ-লিভার হইতে যে-তেল পাওয়া যায়, তাহা এই ভিটামিনের আধার। আমাদের চামড়ার

সূর্যের আলো পড়িলে সেখানে এই ডি-ভিটামিন জন্মায় বলিয়া বিশেষত শৈশবে সূর্যালোক সেবন বিধেয়। একটি শিশুর দৈনিক প্রয়োজন 400—800 আন্তর্জাতিক ইউনিট (এক গ্রাম ডি-ভিটামিন $= 4 \times 10^7$ আন্তর্জাতিক ইউনিট)। রান্নায় এই ভিটামিনের কোন ক্ষতি হয় না।

নিম্নে কয়েকটি প্রধান খাদ্যের ভিটামিন-মূল্য দেখানো হইল। সংকেতগুলির অর্থ এইরূপ :

+	আছে
++	মাঝারি পরিমাণ
+++	যথেষ্ট
–	নাই বলিলেও চলে

	এ-ভিটামিন	বি-1 ভিটামিন	সি-ভিটামিন	বি-2 ভিটামিন
চাল (পালিশ করা)	—	–		–
চাল (কলে ছাঁটা)	+	++	—	+
আটা	+	+++	—	+
মুগ	+	++	—	++
মসুর	++	++	—	+++
দুধ	+++	+	++	+++
লিভার	+++	+	+	+++
কডলিভার তেল	+++	—	—	++
ডিম	+++	+	—	+++
মাছ	+	+	—	+
মাংস	+	+	–	+
কমলালেবু	—	+	+++	+
টম্যাটো	+	+	+++	+
আলু (সিদ্ধ)	++	++	++	+
লেবু	—	+	+++	+
আপেল	+	+	++	++
অঙ্কুরিত মুগ	+	++	+	+

	এ-ভিটামিন	বি-1 ভিটামিন	সি-ভিটামিন	বি-2 ভিটামিন
আম	+++	++	+++	++
কুমড়া	++	+	+	+
গুড়	+	+	—	—
চিনি	—	—	—	—
নারিকেল	+	++	—	++
কলা	+	++	++	++
পালং শাক	+++	+	++	++
স্যালাড (লেটুস শাক)	+	++	++	++
পেঁয়াজ	—	+	++	+
গাজর	+++	++	++	++

খাদ্যে জলের স্থান (Function of water in food) : আমাদের শরীরের ওজনের শতকরা প্রায় 65 ভাগই জল। আমাদের যাবতীয় খাদ্য, লবণ ও ভিটামিন জলের সাহায্যে সমস্ত দেহে সঞ্চালিত হইয়া দেহকে রক্ষা করে এবং দেহের যাবতীয় দূষিত পদার্থ জলের সাহায্যে দেহ হইতে মূত্র, ঘাম, অশ্রু প্রভৃতি রূপে নির্গত হয়। আমাদের ত্বক্ হইতে অবিরাম যে-ঘাম বাহির হয়, তাহা বাষ্পীভূত করিতে আমাদের খাদ্য হইতে উৎপন্ন তাপের প্রায় 25% ব্যয়িত হয়। ইহাতেই আমাদের শরীরের **তাপসাম্য** রক্ষিত হয়। একজন পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির শরীর হইতে দিনে প্রায় $1\frac{1}{2}$ পাইণ্ট জল ঘামরূপে এবং 4 পাইণ্ট জল মূত্ররূপে বাহির হইয়া যায়। আমাদের খাদ্য ভাত, ডাল, ঝোল, দুধ, চা প্রভৃতির সহিত আমরা যথেষ্ট জল গ্রহণ করি। কোন সময়ে তরল খাদ্যের অভাব হইলে আমাদের প্রচুর জল পান করা উচিত।

খাদ্যলবণ : দুধ, নারিকেল, ডাল ও বিভিন্ন প্রকারের শাক-সব্‌জিতে খাদ্যলবণ থাকে। ইহা ছাড়া খাদ্যের সঙ্গে আমরা যথেষ্ট খাদ্যলবণ মিশাইয়া লই। এই সোডিয়াম ক্লোরাইড হইতে আমরা আমাদের হজম রসের (গ্যাস্ট্রিক রস) হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড পাই। আমাদের ঘামের সহিত প্রতিদিন প্রায় 2-3 আউন্স খাদ্যলবণ বাহির হইয়া যায় বলিয়া গ্রীষ্মপ্রধান দেশে অধিকতর খাদ্যলবণ প্রয়োজন হয়।

আমাদের প্রয়োজনীয় খাদ্য (Our food needs) : একজন সাধারণ পরিশ্রমী পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির পক্ষে দৈনিক প্রায় 2500 ক্যালরি শক্তির প্রয়োজন হয় এবং ঐ শক্তি উৎপাদনের জন্য তাহার খাদ্যে নিম্নলিখিত পরিমাণের উপাদান থাকা উচিত। ইহাকে **প্রমাণ খাদ্য** (standard diet) বলে।

প্রোটিন	65	গ্রাম
ফ্যাট	60	,,
কার্বোহাইড্রেট	350	,,
ক্যালসিয়াম	0·68	,,
ফসফরাস	1	,,
লোহা	20	মিলিগ্রাম
এ-ভিটামিন	3000	আন্তর্জাতিক ইউনিট
বি-1 ভিটামিন	300	,,
সি-ভিটামিন	30 –50	মিলিগ্রাম
বি 2 এবং ডি ভিটামিন		উপযুক্ত পরিমাণ

কার্বোহাইড্রেট কোন খাদ্যবস্তু নহে, উহা একটি রাসায়নিক নাম মাত্র। সাদা চিনি বিশুদ্ধ কার্বোহাইড্রেট, কিন্তু তাই বলিয়া কার্বোহাইড্রেটের স্থলে চিনি আমাদের খাদ্য নহে। যে-দেশে যে-কার্বোহাইড্রেট জন্মে সেখানকার লোকেরা সেই কার্বোহাইড্রেটে অভ্যস্ত হইয়া যায়। চাল, ডাল, আটা, ময়দা, সাগু, বাজরা, ছাতু (যব), ভুট্টা, জোয়ার, গুড়, চিনি প্রভৃতি কার্বোহাইড্রেট শ্রেণীর অন্তর্গত। বাঙালীর খাদ্যে চালই প্রধান এবং কলে পালিশ করিয়া না লইলে ইহাতে খনিজ লবণ ও ভিটামিন যথেষ্ট থাকে। আটায় প্রোটিনের পরিমাণ কিছু বেশী আছে। চাল ও আটার মিশ্র খাদ্য গ্রহণ করা আমাদের পক্ষে যুক্তিসঙ্গত হইবে। কার্বোহাইড্রেট বৃক্ষজাত এবং অপেক্ষাকৃত সস্তা। আমাদের খাদ্য কার্বোহাইড্রেট-প্রধান।

প্রোটিন দুই প্রকারের হয়—**প্রাণিজ** ও **উদ্ভিজ্জ**। প্রাণিজ প্রোটিন যেমন উৎকৃষ্ট, তেমনি সহজপাচ্য কিন্তু প্রাণিজ প্রোটিন দুর্মূল্য বলিয়া আমাদের মত অনুন্নত দেশে সকলের ভাগ্যে জুটিতে পারে না। মাছ, মাংস, চিংড়ি, শামুক, ডিম প্রভৃতি প্রাণিজ প্রোটিন। ছোলা, মসুর, মুগ, মাষকলাই, খেসারী, অড়হর, সয়াবীন ও অন্যান্য বীন উদ্ভিজ্জ প্রোটিন। মাছ-মাংসে জল

বেশী থাকে বলিয়া এক সের মাংসের চাইতে এক সের ডালে প্রোটিন অনেক বেশী থাকে, কিন্তু ডালের প্রোটিন অপেক্ষা মাছ-মাংসের প্রোটিন অনেক বেশী স্বাস্থ্যপ্রদ। দেহকোষ গড়িয়া তোলার জন্য প্রোটিন অপরিহার্য বলিয়া শিশুর খাদ্যে যথেষ্ট সহজ-পাচ্য প্রোটিন থাকা উচিত। **দুধ** একটি **স্বয়ংসম্পূর্ণ খাদ্য**। গড়ে ইহাতে 3-4% প্রোটিন, 3-4% ফ্যাট ও 4-5% কার্বোহাইড্রেট থাকে। মাতৃদুগ্ধে প্রোটিন কম ও কার্বোহাইড্রেট বেশী থাকে। দুধের কার্বোহাইড্রেটের নাম ল্যাকটোজ; ইহা চিনির সমগোত্রীয়। দুধে ক্যালসিয়াম, ফস্‌ফরাস, লৌহ প্রভৃতি খনিজ এবং প্রয়োজনীয় ভিটামিনগুলিও আছে। মহিষের দুধে ফ্যাট অনেকটা বেশী থাকে।

ফ্যাট আমাদিগকে শক্তি যোগায় কার্বোহাইড্রেটের দ্বিগুণেও বেশী। কিন্তু ফ্যাট সহজপাচ্য নহে। খাদ্যে আমরা উদ্ভিজ্জ ও প্রাণিজ দুই প্রকার ফ্যাটই ব্যবহার করিয়া থাকি। উদ্ভিজ্জ ফ্যাট অপেক্ষা প্রাণীজ ফ্যাট আমাদের বেশী কাজে লাগে। নারিকেল, তিল, সরিষা প্রভৃতির তেল আমাদের রান্নায় ব্যবহৃত হয়। মাখন, ঘি প্রভৃতি ফ্যাট প্রাণিজ। **বনস্পতি** নামক যে-ফ্যাট আমরা প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করি, উহা নারিকেল প্রভৃতি তেল হইতে হাইড্রোজেনের সাহায্যে উৎপন্ন হয়। যে-সকল ভিটামিন ফ্যাটে দ্রাব্য, সেগুলি বিভিন্ন ফ্যাটের সহিত আমাদের খাদ্যে পৌঁছে। এ- ও ডি-ভিটামিন প্রাণিজ ফ্যাট হইতেই প্রধানত আমরা পাইয়া থাকি। বর্তমানে যে-বনস্পতি বাজারে বিক্রয় হয় তাহাতে উপযুক্ত পরিমাণে এ- ও ডি-ভিটামিন মিশানো থাকে।

খনিজ লবণ ও **ভিটামিন** আমরা খাদ্যের মারফত পাইয়া থাকি। প্রকৃতিজাত খাদ্যদ্রব্যে আমাদের প্রয়োজনীয় লবণগুলির প্রায় সবই বর্তমান থাকে। অভাব ঘটিলে পরিপূরক হিসাবে সেই সকল বিশেষ লবণ গ্রহণ করা উচিত। বাঙালীর খাদ্যে ক্যালসিয়াম ও লৌহের অভাব অনেক সময় বিশেষ ক্ষতির কারণ হয়। সে ক্ষেত্রে ক্যালসিয়াম ও লৌহ-সমন্বিত পথ্যের ব্যবস্থা করিতে হয়। দুধ, মাখন, ডিম, টাট্‌কা শাকসব্‌জি, কড প্রভৃতি লিভারতেল, টম্যাটো, কমলালেবু প্রভৃতি খাদ্য বিশেষভাবে ভিটামিন-সমৃদ্ধ। শরীরে কোন বিশেষ ভিটামিনের অভাব ধরা পড়িলে আজকাল কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত ভিটামিন অথবা ভিটামিন-সমৃদ্ধ খাদ্য ব্যবস্থা করা হয়।

সুষম খাদ্য (Balanced diet) : যে-খাদ্যে কোন বিশেষ ব্যক্তির শরীরে শক্তিলাভ ও পোষণের পক্ষে প্রয়োজনীয় উপাদানগুলি উপযুক্ত পরিমাণে রহিয়াছে, সেই খাদ্য সেই ব্যক্তির পক্ষে **সুষম খাদ্য**। মোটামুটিভাবে একজন সুস্থ পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির গড় প্রমাণ খাদ্য (standard diet) পূর্ব অনুচ্ছেদে দেওয়া হইয়াছে। যে-শিশু বাড়িয়া উঠিতেছে, তাহার যথোচিত বৃদ্ধির পক্ষে সকল দিক বিচার করিয়া যে-খাদ্য উপযুক্ত বিবেচিত হয়, তাহা সেই শিশুর সুষম খাদ্য। তাহার খাদ্যে আপেক্ষিকভাবে যে-পরিমাণ ক্যালসিয়াম খাদ্য অথবা প্রোটিন থাকা উচিত, একজন বয়স্ক ব্যক্তির পক্ষে তাহা নিষ্প্রয়োজন। এই যুক্তিতে গড়ে একজন স্ত্রীলোকের খাদ্য যেরূপ হইলে সুষম হইবে, কোন শিশুর মায়ের খাদ্য অবশ্যই সেরূপ হইলে চলিবে না। আবার কঠোর পরিশ্রমী ব্যক্তির পক্ষে যে-খাদ্য একান্ত প্রয়োজন, অল্প পরিশ্রমী ব্যক্তির নিকট তাহা অতিরিক্ত হইয়া পড়ে। এইরূপে দেশভেদে, বৃত্তিভেদে, এমন কি ঋতুভেদেও খাদ্যের পার্থক্য ঘটে।

কুন্নুরের (দক্ষিণ ভারত) ন্যাশন্যাল রিসার্চ ল্যাবরেটরী হইতে একজন পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির **সুষম খাদ্যের** যে-তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে তাহা নিম্নে দেওয়া হইল।

খাদ্যশস্য (cereals)—	14 আউন্স
ডাল (pulses)—	3 "
শাকসব্জি (green leafy vegetables)—	4 "
মূল জাতীয় সব্জি (root vegetables)—	3 "
অন্যান্য সব্জি (other vegetables)—	3 "
ফল (fruits)—	3 "
দুধ (milk)—	10 "
চিনি ও গুড় (sugar and jaggary)	2 "
বনস্পতি, ঘি ইত্যাদি (vegetable oil, ghee etc.)—	2 "
মাছ ও মাংস—	3 "
ডিম—	একটি

বলা বাহুল্য, এ-তালিকা অনুযায়ী খাদ্য সাধারণ ভারতবাসীর পক্ষে অসাধ্য, কারণ আমাদের গড় আয়ের তুলনায় ইহার মূল্য প্রায় দ্বিগুণ হইবে আমাদের

আর্থিক অবস্থা, রুচি এবং কোথায় কোন্ বস্তু সুলভ, এই সকল চিন্তা করিয়া যতখানি সম্ভব সুষম খাদ্যের ব্যবস্থা করা উচিত।

দরিদ্র বাঙালীর দৈনিক খাদ্যের মোটামুটি যে আভাস আমরা পাই তাহা এই—

কলে ছাঁটা চাল—	½ সের	(16 আউন্স)
ডাল—	1 ছটাক	(2 আউন্স)
তেল—	¼ ছটাক	(½ আউন্স)
তরকারী—	ছটাক	(1½ আউন্স)
শাকসব্জি-	⅛ ছটাক	(¼ আউন্স)
মাছ -	⅓ ছটাক	(1 আউন্স)

লবণ ও কিছু মশলা।

এই খাদ্যের তাপমূল্য 2163 ক্যালরি এবং একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের পক্ষে নিতান্ত অপ্রচুর। কিন্তু বর্তমান বাজারে এই খাদ্যের মূল্যও মাসে 25/ 0 টাকা পড়ে। অথচ এই খাদ্যে দুধ নাই, প্রোটিন এবং ফ্যাট দুই ই অত্যন্ত কম আছে এবং সামান্যই প্রাকৃতিক লবণ ও ভিটামিন আছে। আটা, নারিকেল, ছোলা প্রভৃতি পরিপূরক (protective food) ইহার সহিত যোগ করিয়া ইহাকে খানিকটা উন্নত করা সম্ভব। কিন্তু তাহাতে খরচ আরও 8/10 টাকা বাড়িয়া যাইবে।

মধ্যবিত্ত বাঙালীর খাদ্য গড়ে এইরূপ হয়—

কলে ছাঁটা চাউল—	10 আউন্স	ঘি—	1 আউন্স
ডাল—	3 ,,	দুধ —	8 ,,
তরকারী—	6 ,,	চিনি—	2 ,,
শাকসব্জি —	4 ,,	মাছ—	2 ,,
তেল—	2 ,,	লবণ, মশলা ইত্যাদি।	

এই খাদ্যের তাপমূল্য প্রায় 2650 ক্যালরি হয়। এই খাদ্য মোটামুটি ঠিক থাকিলেও ইহাতে প্রাণিজ প্রোটিন কম পড়ে। কিন্তু এই খাদ্যের বর্তমান বাজার দর মাসিক প্রায় 40/45 টাকা। এই খাদ্যে চালের বদলে কিছু আটা এবং পরিপূরক হিসাবে কিছু অঙ্কুরিত ছোলা, কিছু মাংস, কিছু ফল ও একটি ডিম বাড়াইয়া দিলে ইহা সুষম খাদ্য হইতে পারে। অবশ্য তাহার মোট খরচ প্রায় 45 টাকা পড়িবে।

আমাদের বর্তমান কালের জীবনযাত্রায় অনেক প্রকার চালানী খাদ্যের উপর নির্ভর করিতে হয়। কোন খাদ্যকে বেশী স্থায়ী করিতে গেলে উহার অনেক উপাদান (বিশেষত ভিটামিন জাতীয়) নষ্ট হইয়া যায়। কোন বিশেষ খাদ্যে তাপমূল্য উপযুক্ত পরিমাণে থাকিলেও উহাকে যে-সকল পরিপূরক খাদ্য দ্বারা সমৃদ্ধ (fortified) করা হয়, তন্মধ্যে দুধ, ফলমূল, শাকসব্জি ও ডিম প্রধান। কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত ভিটামিন ইদানীং এই উদ্দেশ্যে যথেষ্ট ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

রাফেজ (Roughage): খাদ্য সম্বন্ধে নানাপ্রকার ভ্রান্ত ধারণাও অনেকের মনে দৃঢ়মূল হইয়া থাকে। ডিম খাইলে পেট গরম হয় এরূপ ধারণা অনেকেরই আছে, কিন্তু তাহারা হয়তো ডাল সহজপাচ্য মনে করে। অথচ ইহা প্রমাণিত সত্য যে একটি আধসিদ্ধ ডিম হজম করিতে দুই ঘণ্টারও কম সময় লাগে এবং ডাল হজম করিতে তিন ঘণ্টারও বেশী সময় লাগে। অনেকে মনে করেন, শাকসব্জি শুধু মলবৃদ্ধি করে মাত্র, উহার আর কোন উপকারিতা নাই। অথচ আমাদের জানা উচিত যে শাকসব্জিতে আমাদের একান্ত প্রয়োজনীয় কতকগুলি ভিটামিন থাকে এবং মলবৃদ্ধি করিয়া উহা আমাদের উপকারই করে। এইরূপ মলবৃদ্ধিকারক পদার্থকে **রাফেজ** বলে। মাখন হইতে ঘি প্রস্তুতির সময় মাখনের অনেকটা ভিটামিনই নষ্ট হইয়া যায়; কিন্তু অনেকে মনে করেন, মাখন অপেক্ষা ঘি শ্রেষ্ঠ খাদ্য। রোগের প্রতিরোধ অথবা প্রতিকারের জন্য অনেকে উপবাসের উপর বেশী জোর দেন, অথচ ইহা মনে রাখেন না যে খাদ্যের অভাবে শরীরের প্রতিরোধ-ক্ষমতা আপনি কমিয়া যায়। খাদ্য সম্বন্ধে যে-সকল বৈজ্ঞানিক তথ্য নির্ভুল প্রমাণিত হইয়াছে, সেগুলি স্বীকার করিয়া লওয়া সকল খাদ্য ব্যবস্থায় আমাদের প্রাথমিক কর্তব্য।

অনুশীলনী

1. মনুষ্যদেহের রক্ত সংবহনতন্ত্র বর্ণনা কর। রক্ত দূষিত হয় কেন এবং কি উপায়ে উহা পুনরায় বিশুদ্ধ হয় লিখ।

2. একটি হৃৎপিণ্ডের ছবি আঁকিয়া উহার প্রধান কার্য বুঝাইয়া দাও। ঊর্ধ্ব মহাশিরা ও ফুসফুসীয় ধমনী কাহাকে বলে?

3. মনুষ্য-রক্তের উপাদান কি কি? কোথাও কাটিয়া গিয়া রক্ত বাহির হইলে উহা জমিয়া যায় কেন? লোহিত রক্ত কণিকা ও শ্বেত রক্ত কণিকার কার্য বর্ণনা কর।

4. আমাদের পরিপাক ক্রিয়ায় (ক) লালা, (খ) গ্যাষ্ট্রিক রস, (গ) অগ্ন্যাশয় রস (ঘ) ক্ষুদ্রান্ত্র রসের প্রভাব বর্ণনা কর। যকৃৎ ও পিত্তরস সম্বন্ধে যাহা জান বল। কোন্ পরিবর্তনে আমরা বায়ুর অক্সিজেনের সাহায্য ব্যতিরেকে শক্তি লাভ করি? বিপাক বা মেটাবলিজম্ কাহাকে বলে উদাহরণ সাহায্যে বুঝাইয়া দাও। শ্বেতসার কিরূপে হজম হয় লিখ। হজম ক্রিয়ায় বিভিন্ন এঞ্জাইমের প্রভাব বর্ণনা কর।

5 খাদ্যের সহিত আমাদের কর্মক্ষমতার সম্পর্ক আলোচনা কর। খাদ্যের কোন উপাদান কি উপায়ে আমাদিগকে শক্তি যোগায় বুঝাইয়া দাও। বেসেল্ মেটাবলিজম্ কাহাকে বলে? আমাদের দেহ-গঠনে এবং বিভিন্ন দেহ-যন্ত্রের পরিচালনে খনিজ পদার্থের স্থান নির্ণয় কর। ক্যালসিয়াম, লৌহ, ও ফস্ফরাস আমাদের শরীরে কোন্ প্রয়োজনে লাগে বুঝাইয়া দাও। খাদ্যের তাপশক্তি সম্বন্ধে কি জান লিখ। খাদ্যে জলের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা কর।

6. ভিটামিন কাহাকে বলে? খাদ্যদ্রব্যে ভিটামিনের অস্তিত্ব কিরূপে জানিতে পারা যায়? কোন্ ভিটামিনের অভাব কি কি উপায়ে পূর্ণ করা যায় লিখ। নিম্নলিখিত খাদ্যবস্তুগুলি কোন্ বিশেষ ভিটামিনের আধার লিখ,—হাঙর-লিভারের তেল পাতিলে ঢেকিছাটা চাল, কড-লিভার তেল, গাজর, দুধ, পালং শাক। খাদ্য ছাড়াও কোন ভিটামিন আমরা পাইতে পারি কি? বেরিবেরি কাহাকে বলে এবং উহার প্রতিকার কি?

7. প্রমাণ খাদ্য কাহাকে বলে? খাদ্য নির্বাচনে আমাদের কি উপায় অবলম্বন করা উচিত বুঝাইয়া দাও এবং একটি সুষম খাদ্য তালিকা প্রস্তুত করিয়া দেখাও। শহরে এবং গ্রামে আমাদের খাদ্য-ব্যবস্থার পার্থক্য কি? মধ্যবিত্ত বাঙালীর খাদ্য কিরূপে উন্নত করা সম্ভব?

8, নিম্নলিখিত খাদ্যগুলি সম্বন্ধে যাহা জান লিখ—ঝুনো নারিকেল, আলু, ছাতু, মাখন, ছানা মাছ, মসুর ডাল।

9, চাল ধুইলে এবং ভাতের ফেন ফেলিয়া দিলে কি ক্ষতি হয় লিখ। ভাত কিরূপে রান্না করা সমীচীন? দুধ বেশী ফুটাইলে কি দোষ হয়? শাক ভাজিয়া খাওয়া উচিত নয় কেন?

10. সুষম খাদ্য কাহাকে বলে, উদাহরণসহ বুঝাইয়া দাও।

11. টীকা লিখ:—পেষণদাত, আল্‌জিভ, রেনিন, গ্যালেট, লেকটোজ, ভিলাই, ক্যালরি, ইনসুলিন, অ্যামিনো অ্যাসিড, প্রোটিন, অভাবজনিত ব্যাধি, এঞ্জাইম, ডি-ভিটামিন, বাফেজ, অনুঘটক।

সংক্ষিপ্ত উত্তরের জন্য বিষয়মুখী (Objective test) প্রশ্ন

1. কোনটি সত্য বল:—

(ক) আমাদের দূষিত রক্ত বিশুদ্ধ হয়

(i) হৃৎপিণ্ডে,

(ii) ফুসফুসে,

(iii) মস্তিষ্কে।

কোন্‌টি সত্য বল ঃ—

(খ) রক্তের শ্বেতকণিকা

(i) আমাদের কোন কাজে লাগে না,

(ii) রক্ত জমাট বাঁধিতে সাহায্য করে,

(iii) বহিরাগত জীবাণু ধ্বংস করে।

(গ) শরীরের রক্তকণিকা উৎপন্ন হয়

(i) লিভারে, (ii) অস্থির মজ্জায়, (iii) ফুসফুসে।

(ঘ) হৃৎপিণ্ডের পেশী

(i) ঐচ্ছিক (ii) অনৈচ্ছিক।

(ঙ) লালায় যে টায়ালিন নামক (i) অ্যাসিড, (ii) এঞ্জাইম থাকে তাহা খাদ্যের অদ্রাব্য ষ্টার্চকে দ্রাব্য (i) গ্লুকোজ, (ii) অ্যামিনো অ্যাসিড, (iii) মল্টোজে পরিণত করে।

(চ) ইনসুলিন একপ্রকার (i) এঞ্জাইম, (ii) হরমোন, (iii) শর্করা।

(ছ) অ্যাপেনডিক্স্ আমাদের একটি (i) প্রয়োজনীয়, (ii) অকেজো দেহযন্ত্র।

২। শূন্যস্থান পূর্ণ কর ঃ—

(ক) বাম নিলয় হইতে — রক্ত যাত্রা করিয়া সমস্ত শরীর ঘুরিয়া — রক্তরূপে দক্ষিণ — ফিরিয়া আসে। উহা — রক্তে পূর্ণ হইলে আপনি সঙ্কুচিত হয় ও রক্ত — নিলয়ে প্রবেশ করে।

(ক) আমরা শক্তিলাভ — করি হইতে। আমাদের—তিনটি প্রধান উপাদান (i) —, (ii) —, (iii) —। হজম ক্রিয়ায় ইহারা গ্লুকোজে ও অ্যামিনো অ্যাসিডে পরিণত হইয়া রক্তস্রোতে মিশে। রক্তের — নামক পদার্থ বায়ু হইতে — গ্যাস শুষিয়া লয় ও ঐ গ্যাসের সাহায্যে দেহে যে — ক্রিয়া ঘটে, তার ফলে আমরা — লাভ করি।

৩। হাঁ অথবা না লিখিয়া উত্তর দাও ঃ

(ক) ভিটামিন অত্যন্ত প্রয়োজনীয় খাদ্য।

(খ) লাইপেজ নামক এঞ্জাইম চর্বি হজমের সহায়তা করে।

(গ) আমাদের লোহিত রক্তকণিকায় নিউক্লিয়াস আছে।

(ঘ) রক্ত পাম্প করিবার কার্য হৃৎপিণ্ডের, ফুসফুসের নহে।

(ঙ) ফুসফুসীয় ধমনীতে রক্ত থাকে।

(চ) গাজর হইতে আমরা ক্যারোটিন পাই।

(ছ) ডিমে যথেষ্ট সি-ভিটামিন থাকে।

(জ) প্রাণিজ প্রোটিন অপেক্ষা উদ্ভিজ্জ প্রোটিন আমাদের বেশী প্রয়োজনীয়।

(ঝ) সুষম খাদ্যে শাকসবজি থাকা একান্ত দরকার।

(ঞ) রুচি অনুযায়ী খাদ্য সুষম হয়।

দ্বিতীয় ভাগ

[FOR CLASS X]

১

শব্দ-বিজ্ঞান

[Sound]

সূচনা

'শব্দ' সম্বন্ধে আমাদের সকলেরই কিছু-না-কিছু ধারণা আছে। প্রতিদিন নানারকমের শব্দ আমাদের কানে আসে। যানবাহন চলাচলের শব্দ, লোকের কথাবার্তার শব্দ, জল পড়ার শব্দ—এইরকম অসংখ্য শব্দ প্রতিদিন আমরা শুনি। প্রতিদিনের এই অভিজ্ঞতা হইতে শব্দ সম্বন্ধে কতকগুলি প্রাথমিক বিষয়ের সহিত আমরা সকলেই পরিচিত। যেমন, আমরা বুঝি যে, কতগুলি শব্দ শ্রুতিমধুর এবং কতগুলি শ্রুতিকটু। বাদ্যযন্ত্রের শব্দ, স্রোতস্বিনী নদীর কুলুকুলু ধ্বনি, বংশীধ্বনি প্রভৃতি শ্রুতিমধুর বলিয়া পরিচিত। তেমনি গাড়ীর ঘর্ঘর শব্দ, মেসিনের শব্দ প্রভৃতি শ্রুতিকটু। শ্রুতিমধুর শব্দ আবার এক এক সময় এত অপ্রীতিকর হয়, মনে হয় এই পৃথিবী হইতে শব্দ একেবারে বন্ধ হইলেই বুঝি ভাল হইত। যেমন, তোমার কানের কাছে যদি অনবরত গ্রামোফোন বাজানো যায়, তবে নিশ্চয়ই তুমি বিরক্ত বোধ করিবে, গান যতই না শ্রুতিমধুর হউক! কিন্তু পৃথিবী হইতে শব্দ একেবারে বন্ধ হইয়া যাওয়ার কথা আমরা ভাবিতেও পারি না। কল্পনা কর যে, কোন কিছুতেই আর শব্দ হইতেছে না। গাড়ী-ঘোড়া চলিতেছে শব্দ নাই, মানুষ কথা বলিতেছে—মুখ হইতে শব্দ বাহির হইতেছে না, জোরে ঘণ্টা পিটাইতেছে—কিন্তু শব্দহীন। পৃথিবীর কোথাও কোন শব্দ নাই। শব্দহীন সেই পৃথিবীর কথা ভাবিলে শিহরিয়া উঠিতে হয়।

তোমরা বোধ হয় জান যে, চাঁদের দেশে কোন শব্দ নাই—কারণ চাঁদে কোন বায়ু বা গ্যাস নাই। কঠিন, তরল বা গ্যাসীয় কোন পদার্থই না থাকিলে শব্দ চলাচল করিতে পারে না। তাই চাঁদে চিরদিনের জন্য শ্মশানের নীরবতা বিরাজ করে। পৃথিবী চাঁদের মত নীরব হইলে মানুষের পক্ষে বাঁচা কঠিন হইত। তোমরা একথা শুনিলে বিস্মিত হইবে যে, এমনও শব্দ আছে যাহা আমরা শুনিতে পাই না। না-শোনা এই শব্দের নাম শ্রুতিপারের শব্দ (supersonic sound)। শব্দ-বিজ্ঞান পড়িলে জানিতে পারিবে যে, শব্দ-সৃষ্টির জন্য বস্তুর কম্পন প্রয়োজন। প্রতি সেকেণ্ডে বস্তুর কম্পন-সংখ্যা যদি

একটি নির্দিষ্ট সীমা ছাড়াইয়া যায় তবে ঐ শব্দ কানে ধরা পড়ে না। পরীক্ষায় দেখা যায় যে কম্পন-সংখ্যা প্রতি সেকেণ্ডে 20,000-এর বেশী হইলে ঐ শব্দ কানে শোনা যায় না। কিন্তু কুকুর ঐ শব্দ শুনিতে পায় ; কারণ, কুকুরের কান ঐ শব্দ শুনিবার উপযোগী করিয়া তৈয়ারী। কানে শোনা না গেলেও এই শ্রুতিপারের শব্দের প্রয়োজনীয় ব্যবহারিক প্রয়োগ আছে। নানারকমের এই যে শব্দ এবং তাহাদের বিচিত্র ব্যবহার—এসম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিতে হইলে শব্দ-বিজ্ঞানের সহিত পরিচিত হওয়া দরকার। একথা সর্বদা স্মরণ রাখিবে যে আলো, তাপ প্রভৃতির ন্যায় শব্দও একপ্রকার শক্তি। আলো, তাপ প্রভৃতি যেমন দৃশ্যমান নয়, শব্দও তেমনি আমরা দেখিতে পাই না। শব্দশক্তি কানে পৌঁছাইলে আমাদের শ্রবণের অনুভূতি হয়।

এই অধ্যায়ে শব্দ-বিজ্ঞানের প্রাথমিক সূত্র ও তথ্যগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করা হইল।

1-2. শব্দের উৎপত্তি (Production of Sound)

আমরা কান দিয়া শব্দ শুনি এবং ঐ শব্দ কোথা হইতে হইতেছে যদি অনুসন্ধান করি তবে দেখিব যে, কোন-না-কোন **কম্পনশীল বস্তু** ঐ শব্দ সৃষ্টি করিতেছে। যেমন ঘণ্টা বাজাইলে আমরা উহার শব্দ শুনি এবং ঘণ্টায় হাত দিলেই বুঝি যে উহা কাঁপিতেছে। কাঁসার পাত্র হাত হইতে মাটিতে পড়িয়া গেলে শব্দ সৃষ্টি হয় এবং ঐ পাত্রে হাত দিলেই বোঝা যায় উহা প্রচণ্ড বেগে কাঁপিতেছে। কম্পন ছাড়া শব্দ সৃষ্টি হইতে পারে না। তাছাড়া আর একটি ব্যাপারও তোমরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করিয়াছ যে, শব্দ শুনিবার জন্য কানকে শব্দের উৎসের সহিত স্পর্শ না করাইলেও চলে। তুমি যেখানে বসিয়া আছ সেখান হইতে কয়েক গজ দূরে একটি ঘণ্টা বাজাইলে তুমি তাহার শব্দ শুনিবে। ঐ শব্দ শুনিবার জন্য ঘণ্টার সহিত কান ঠেকাইবার প্রয়োজন নাই। অর্থাৎ, **কোন কম্পনশীল বস্তু হইতে কোন জড় মাধ্যমকে অবলম্বন করিয়া যে শক্তি আমাদের কানে পৌঁছায় এবং কানে বিশেষ অনুভূতির সৃষ্টি করে, তাহাকেই আমরা শব্দ বলি।**

পরীক্ষাগারে নিম্নলিখিত সহজ পরীক্ষাগুলি করিয়া প্রমাণ করা যায় যে শব্দের উৎপত্তির জন্য কম্পন (vibration) প্রয়োজন।

পরীক্ষা :

(1) **সুরশলাকার** (Tuning fork) **কম্পন :**

সংলগ্ন চিত্রে একটি সুরশলাকা দেখানো হইয়াছে। ইহা একটি U-অক্ষরের মত বাঁকান স্থিতিস্থাপক (elastic) ইস্পাতের দণ্ড। ইহার সহিত একটি হাতল যুক্ত আছে এবং হাতলটি ফাঁপা কাঠের বাক্সের উপর বসানো। সুরশলাকার যে-কোন বাহুকে কাপড় জড়ানো (padded) হাতুড়ী দিয়া আঘাত করিলে উহা কাঁপিতে থাকিবে এবং সঙ্গে সঙ্গে শব্দ সৃষ্টি হইবে। একটি শোলার বলকে সুরশলাকার বাহুর সহিত স্পর্শ করাইয়া ঝুলাইয়া রাখিলে দেখা যাইবে যে বলটি বার বার আঘাত পাইয়া সরিয়া যাইতেছে। ইহা প্রমাণ করে যে সুরশলাকার বাহুটি কাঁপিতেছে।

শোলার বলটি কম্পমান সুর-শলাকার বাহু দ্বারা ঘা খাইয়া বার বার সরিয়া যাইতেছে।

এইবার সুরশলাকার বাহুটি হাত দিয়া চাপিয়া ছাড়িয়া দিলে উহার কম্পন বন্ধ হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে আর শব্দও শোনা যাইবে না।

(2) একটি লোহার গোল প্লেট একটি স্তম্ভের উপর দৃঢ়ভাবে আটকানো। উহার উপর কিছু বালি ছড়াইয়া প্লেটের কিনারায় বেহালার ছড় টানিয়া গেলে শব্দ শোনা যাইবে এবং দেখা যাইবে যে বালুকণাগুলি লাফাইতেছে, অর্থাৎ শব্দ সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে প্লেটের কম্পন হয় এবং তাহার ফলে বালুকণাগুলি লাফায়। এখন প্লেটটি হাত দিয়া চাপিয়া ধরিলে দেখিবে যে বালুকণাগুলি আর লাফাইতেছে না এবং শব্দও বন্ধ হইয়া গিয়াছে। অর্থাৎ কম্পন বন্ধ হইবার সঙ্গে সঙ্গে শব্দও বন্ধ হইয়া যায়।
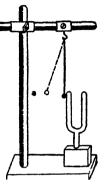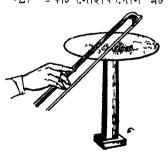
প্লেটের কিনারা বেহালার ছড় দিয়া টানিলে শব্দ হইবে এবং বালুকণাগুলি লাফাইবে

সুতরাং উপরোক্ত পরীক্ষাগুলির দ্বারা আমরা এই সিদ্ধান্ত করিতে পারি যে শব্দ সৃষ্টি করিতে হইলে শব্দ সৃষ্টিকারী বস্তুর কম্পনের প্রয়োজন।

1-2. শব্দ বিস্তারের জন্য জড় মাধ্যমের প্রয়োজন (Material medium is necessary for transmission of sound)

শব্দসৃষ্টিকারী উৎস হইতে শব্দ আমাদের কানে পৌঁছাইলে আমরা তাহা শুনি। আমাদের নিত্য অভিজ্ঞতা হইতে আমরা জানি যে শব্দ শুনিবার জন্য কানকে উৎসের সহিত স্পর্শ না করাইলেও চলে। যখন দুই ব্যক্তি কথা বলে তখন উভয়ের মধ্যে দূরত্ব থাকিলেও কথা শোনা যায়। এই সকল ক্ষেত্রে উৎস হইতে শব্দ কোন জড় মাধ্যমের (কঠিন, তরল অথবা বায়বীয়) ভিতর দিয়া আসিয়া আমাদের কানে পৌঁছায়। সাধারণক্ষেত্রে বায়ুমণ্ডলই মাধ্যমের কাজ করে।

এই মাধ্যম না থাকিলে শব্দ আমাদের কানে পৌঁছিতে পারে না এবং আমরা তাহা শুনিতেও পারি না। নিম্ন বর্ণিত সহজ পরীক্ষা দ্বারা এই তথ্যটির সত্যতা প্রমাণিত হইবে।

পরীক্ষা ঃ

একটি বায়ু নিষ্কাশন পাম্পের আসনের (receiver) উপর একটি বড় কাচপাত্র রাখ। আসনের সহিত পাত্রের মুখের জোড় ভেসলীন দিয়া বায়ু-নিরুদ্ধ (air tight) কর। পাত্রের উপরের খোলা মুখ একটি কর্ক দ্বারা বায়ুনিরুদ্ধভাবে আটকাও। কর্কের ছিদ্র দিয়া কাচ-পাত্রের ভিতর একটি বৈদ্যুতিক ঘণ্টা (ছবিতে যেমন দেখানো হইয়াছে তেমন করিয়া) ঝুলান। ঘণ্টাটিকে বাহির হইতে বাজাইবার ব্যবস্থা আছে অর্থাৎ বাহির হইতে একটি বোতাম টিপিলে বৈদ্যুতিক ঘণ্টাটি বাজিয়া উঠিবে।

কাচপাত্রের বায়ু বাহির করিয়া লইলে বৈদ্যুতিক ঘণ্টার শব্দ শোনা যাইবে না।

যখন কাচ পাত্রটি বায়ুপূর্ণ থাকে তখন বোতাম টিপিলে ঘণ্টার শব্দ শুনিতে পাওয়া যাইবে। এখন বোতামটিকে টিপিয়া ধরিয়া পাম্প চালাও। দেখিবে ঘণ্টার শব্দ আস্তে
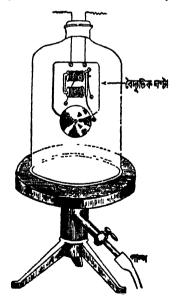
আস্তে ক্ষীণ হইতেছে। অর্থাৎ পাত্র হইতে যত বায়ু বাহির হইয়া যাইবে শব্দও তত ক্ষীণ হইবে। অবশেষে পাত্রটি যখন প্রায় বায়ুশূন্য হইবে তখন শব্দ অত্যন্ত ক্ষীণ হইবে।

আবার যদি পাত্রে আস্তে আস্তে বায়ু প্রবেশ করানো যায় তবে শব্দ আবার আস্তে আস্তে জোর হইবে। সুতরাং এই পরীক্ষা দ্বারা সহজে প্রমাণিত হয় যে, কোন জড় মাধ্যম (উপরোক্ত পরীক্ষায় বায়ু) না থাকিলে শব্দের বিস্তার সম্ভব নয়। এই কারণে চন্দ্রে বা অন্য কোন গ্রহে বিরাট বিস্ফোরণ হইলেও তাহার শব্দ পৃথিবীতে কখন পৌছাইবে না, কারণ, চাঁদ ও পৃথিবীর ভিতর-কার দূরত্বের বেশীর ভাগ শূন্য (vacuum)। তেমনি পৃথিবীর কোন বিরাট্ শব্দও বায়ুমণ্ডল যে পর্যন্ত বিস্তৃত তাহা ছাড়াইয়া কখনও যাইবে না।

উপরোক্ত পরীক্ষায় একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে পাম্প দ্বারা পাত্রটি সম্পূর্ণ বায়ুশূন্য করা যায় না বলিয়া এবং ঘণ্টা ঝুলাইবার সুতা প্রভৃতি দিয়া কিছু শব্দ প্রবাহিত হয় বলিয়া ঘণ্টাটিকে কখনও সম্পূর্ণ শব্দহীন করা যায় না।

এখানে একটি কথা উল্লেখযোগ্য যে, শব্দ শুধু যে বায়ু-মাধ্যমে যাইতে পারে তাহা নয়—কঠিন বা তরল বস্তুর মধ্য দিয়াও শব্দ চলাচল করিতে পারে। রেল লাইনে কান পাতিলে দূরাগত ট্রেনের শব্দ লাইনের ভিতর দিয়া স্পষ্ট শোনা যায়। একটি লম্বা লোহার রড লইয়া একপ্রান্তে কান রাখ এবং অপর প্রান্তে আস্তে একটি শব্দ কর। শব্দ কানে বেশ জোরে শোনা যাইবে। জলে ডুব দিয়া হাততালি দাও। উহার শব্দ স্পষ্ট শুনিতে পাইবে। ছোট ছেলেমেয়েরা দুইটি দেশলাইয়ের বাক্সে সুতা লাগাইয়া যে খেলনা-টেলিফোন তৈয়ারী করে সেখানে শব্দ সুতা অর্থাৎ কঠিন বস্তুর মধ্য দিয়া যাতায়াত করে। এই সব ক্ষেত্রে শব্দ কঠিন এবং তরল পদার্থের ভিতর দিয়া চলাচল করে বলিয়া শব্দ শোনা যায়।

1-3. শব্দের প্রতিফলন (Reflection of sound)

দর্পণের সাহায্যে আলোকের প্রতিফলন তোমরা অনেকেই দেখিয়াছ। প্রতিফলন সম্পর্কে শব্দও আলোকের ন্যায় ব্যবহার করে। অর্থাৎ উপযুক্ত প্রতিফলকের সাহায্যে শব্দের প্রতিফলন সম্ভব। আলোক প্রতিফলনের জন্য খুব মসৃণ প্রতিফলক দরকার। কিন্তু শব্দের প্রতিফলনের জন্য প্রতিফলক

কিছু অমসৃণ হইলেও চলে। ইহার কারণ এই যে আলোর তরঙ্গ শব্দের তরঙ্গ অপেক্ষা খুব ছোট। এইজন্য বাড়ীর দেওয়াল, পর্বত-গাত্র, গাছের সারি প্রভৃতি শব্দের প্রতিফলকের কাজ করে।

শব্দের প্রতিফলন দেখাইবার পরীক্ষা :

(1) সমতল প্রতিফলক দ্বারা :

চিত্রে C একটি সমতল কাঠের বোর্ড শব্দের প্রতিফলক হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। A এবং B দুইটি ফাঁপা নল টেবিলের উপর অনুভূমিক অবস্থায় রাখ। দুই নলের মাঝখানে P একটি কাঠের পার্টিশান। A এবং B নলকে এমনভাবে বসাও যেন উহাদের অক্ষ (axis)-দ্বয় C বিন্দুতে মিশে এবং CP রেখার সহিত সমান সমান কোণ উৎপন্ন করে। অর্থাৎ $\angle PCA = \angle PCB$. এখন A নলের খোলামুখের সামনে একটি ঘড়ি ধরিয়া B নলের মুখে কান রাখিলে স্পষ্ট টিক টিক শব্দ শোনা যাইবে। যদি B নল দক্ষিণে বা বামে ঘুরানো যায় তবে আর শব্দ শোনা যাইবে না। ইহা প্রমাণ করে যে
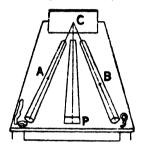
সমতলে শব্দের প্রতিফলন

আলোকরশ্মির ন্যায় শব্দরশ্মিও C বিন্দুতে এমনভাবে প্রতিফলিত হইল যে আপতন কোণ PCA ও প্রতিফলন কোণ PCB সমান হইয়াছে। নল দুইটির মাঝখানে P-কাঠের ফলক রাখিবার জন্য ঘড়ির শব্দ সোজাসুজি কানে পৌছিতে পারে না।

শব্দ প্রতিফলনের ব্যবহারিক প্রয়োগ :

(1) মাইক্রোফোন বা লাউড্‌স্পীকার আবিষ্কারের পূর্বে বড় হল ঘরে বক্তৃতা শুনাইবার জন্য অবতল প্রতিফলক ব্যবহৃত হইত। একটি অবতল প্রতিফলকের ফোকাসে দাঁড়াইয়া বক্তা বক্তৃতা করিলে শব্দরশ্মি প্রতিফলিত হইয়া সমান্তরালভাবে হল-ঘরের শেষপ্রান্তে পৌছায় এবং তথায় বক্তৃতা শোনা যায়। পূর্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট হলে এইরূপ একটি বড় কাঠের অবতল প্রতিফলক ছিল।

(2) বড় মোটরগাড়ীতে আরোহী ও চালকের ভিতর কথাবার্তা বলিবার জন্য একপ্রকার নল ব্যবহৃত হয়। ইহাকে Speaking tube বলে। এই
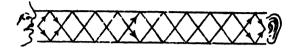
Speaking tube

নলের একদিকে কথা বলিলে শব্দরশ্মি বার বার নলের গায়ে প্রতিফলিত হইয়া অন্য প্রান্তে পৌঁছায় এবং এই প্রান্তে কান রাখিলে ঐ কথা স্পষ্ট শোনা যায়।

(3) ডাক্তারেরা রোগীর বুক পরীক্ষার জন্য যে-যন্ত্র ব্যবহার করেন তাহা উপরোক্ত নলের মত কায করে। এই যন্ত্রকে Stethoscope বলে। ইহাতে দুইটি নল থাকে এবং নল দুইটি এক জায়গায় মিলিত হইয়া একটি পাতলা পর্দাযুক্ত (diaphragm) যন্ত্রের সহিত যুক্ত থাকে। এই যন্ত্র বুকে রাখিলে বুকের শব্দ নলের ভিতর দিয়া বার বার প্রতিফলিত হইয়া কানে পৌঁছায়।

হাতের তালু বাকাইয়া শব্দের প্রতিফলন করা হয়

তোমরা জান যে দূরাগত কোন ক্ষীণ শব্দ স্পষ্ট শুনিবার জন্য আমরা আমাদের হাতের তালু বাঁকাইয়া কানের কাছে ধরি। ঐ ভাবে বাঁকানো হাতের তালু অবতল প্রতিফলকের কাজ করে এবং শব্দরশ্মি প্রতিফলিত হইয়া কানে পৌঁছায়।

গ্রামোফোনের চোঙ, বধিরেরা কথা শুনিবার জন্য যে-যন্ত্র (ear-trumpet) ব্যবহার করে এ সবই শব্দের প্রতিফলনকে কাজে লাগাইয়া তৈয়ারী করা হয়।

1-4. প্রতিধ্বনি (Echo)

রাত্রিবেলা নদীর পাড়ে দাঁড়াইয়া শব্দ করিলে কিছুক্ষণ বাদে সেই শব্দের পুনরাবৃত্তি শোনার অভিজ্ঞতা হয়ত তোমাদের অনেকের আছে। তোমরা হয়ত লক্ষ্য করিয়া থাকিবে যে, বড় খালি ঘরের একপ্রান্তে ধ্বনি করিলে কিছুক্ষণ পরে ঠিক সেই শব্দ শোনা যায়। **ধ্বনির এই পুনরাবৃত্তিকে প্রতিধ্বনি**

বলে। শব্দের প্রতিফলনের দরুন এই প্রতিধ্বনির সৃষ্টি হয়। প্রতিধ্বনি সৃষ্টি করার জন্য গাছের সারি, বড় বাড়ীর দেওয়াল, পাহাড়ের গা ইত্যাদি প্রতিফলক হিসাবে কাজ করিয়া থাকে।

কোন ধ্বনি কানে শুনিলে কানে সেই ধ্বনির রেশ কিছুক্ষণ যাবৎ স্থায়ী হয়। ইহাকে **শব্দ-নির্বন্ধ** (presistence of hearing) বলে। এই সময়ের ব্যবধান $\frac{1}{10}$ সেকেণ্ড। সাধারণ সাইজের ঘরে কথাবার্তা বলিলে দেওয়াল কর্তৃক প্রতিফলিত হইয়া শব্দ $\frac{1}{10}$ সেকেণ্ডের ভিতর কানে পৌঁছায় বলিয়া ধ্বনি ও প্রতিধ্বনির পার্থক্য করা যায় না। কানে উভয়েই এক শব্দ বলিয়া মনে হয়। সুতরাং প্রতিধ্বনি স্পষ্ট করিয়া শুনিতে হইলে শব্দকে প্রতিফলিত হইয়া কানে পৌঁছিবার পূর্বে কমপক্ষে $\frac{1}{10}$ সেকেণ্ড সময় অতিবাহিত করিতে হইবে। সুতরাং সাধারণ ধ্বনি —যেমন বন্দুকের শব্দ, হাততালি ইত্যাদি যাহা খুব অল্প সময়ের ভিতর করা হয়, তাহার প্রতিধ্বনি শুনিতে গেলে প্রতিফলককে এমন দূরে রাখিতে হইবে যে, ধ্বনি প্রতিফলক পর্যন্ত যাইয়া প্রতিফলিত হইয়া পুনরায় শ্রোতার কানে পৌঁছিবার সময় পর্যন্ত অন্তত $\frac{1}{10}$ সেকেণ্ড সময় অতিবাহিত হয়। যদিও শব্দের বেগ প্রতি সেকেণ্ডে 1120 ফুট ধরা হয়, তবে উক্ত $\frac{1}{10}$ সেকেণ্ডে শব্দ মোট 112 ফুট যাইতে পারে। সুতরাং প্রতিফলককে শ্রোতা হইতে অন্ততঃ $\frac{112}{2}=56$ ফুট দূরে রাখিতে হইবে।

পদাংশ (syllable)-বিশিষ্ট কোন বোধগম্য (articulate) শব্দের প্রতিধ্বনি শুনিতে গেলে প্রতিফলককে আরো দূরে রাখিতে হইবে। কারণ দেখা গিয়াছে মানুষ সেকেণ্ডে পাঁচটি পদাংশের বেশী উচ্চারণ করিতে পারে না এবং কানও উহার বেশী শুনিতে পারে না। সুতরাং একমাত্রিক (monosyllabic) শব্দের বেলাতে ধ্বনি ও প্রতিধ্বনির ভিতর ন্যূনতম সময়ের ব্যবধান দিতে হইবে $\frac{1}{5}$ সেকেণ্ড। শব্দের বেগ প্রতি সেকেণ্ডে 1120 ফুট ধরিলে উক্ত সময়ে শব্দ 224 ফুট যায়। সুতরাং একমাত্রিক শব্দের প্রতিধ্বনির বেলাতে প্রতিফলকের দূরত্ব কমপক্ষে $\frac{224}{2}=112$ ফুট হওয়া দরকার। তেমনি দ্বিমাত্রিকের বেলাতে দূরত্ব ইহার দ্বিগুণ অর্থাৎ 224 ফুট, ত্রিমাত্রিকের বেলাতে তিনগুণ ইত্যাদি প্রয়োজন।

কখন কখন ধ্বনির বার বার প্রতিফলনের জন্য একবার শব্দ করিয়া উহার অনেকগুলি প্রতিধ্বনি শোনা যায়। দুইটি সমান্তরাল পাহাড়ের মাঝখানে

দাঁড়াইয়া ধ্বনি করিলে ঐ শব্দ বার বার দুই পাহাড়ের গা হইতে প্রতিফলিত হইয়া শ্রোতার কানে পৌঁছায়। ফলে একাধিক প্রতিধ্বনি শোনা যায়। ফ্রান্সের ভার্ডুন শহরের নিকটে 164 ফুট দূরত্বে দুইটি সমান্তরাল দেওয়াল আছে, যাহার মাঝখানে দাঁড়াইয়া শব্দ করিলে অন্তত 12 বার প্রতিধ্বনি শোনা যায়। মেঘের গুরু গুরু ধ্বনি বিভিন্ন স্তরের মেঘ কর্তৃক শব্দের বার বার প্রতিফলনের জন্যই হয়।

— খালি বড় হল ঘরে শব্দ করিলে দেখা যায়, অনেকক্ষণ ধরিয়া সেই শব্দ ঘরে গমগম করে। এই ধরনের শব্দকে বলা হয় **'অনুরণন'** (reverberation)। ইহা দেওয়াল কর্তৃক পুনঃপুনঃ প্রতিফলনের জন্য হইয়া থাকে। ঘরের জানালায় পর্দা, ফেল্টের আবরণ ইত্যাদি থাকিলে ইহা শব্দকে শোষণ করিয়া লইতে পারে। তাই সাধারণ আসবাবপূর্ণ ঘরে ঐরূপ অনুরণন শোনা যায় না।

শব্দের প্রতিধ্বনির সাহায্যে সমুদ্রের গভীরতা মাপিবার এক সহজ উপায় আছে। কি উপায়ে গভীরতা পরিমাপ করা হয় তাহা বলি শোন।

শব্দের প্রতিফলন দ্বারা সমুদ্রের গভীরতা মাপা হয়

মনে কর সমুদ্রের যে স্থানে গভীরতা মাপিতে হইবে সেখানে একটি জাহাজ দাঁড়াইয়া আছে। জাহাজ হইতে একটি শব্দ করা হইল। এই শব্দ কিন্তু আমাদের কানে শোনা শব্দ নয়। ইহা শ্রুতিপারের শব্দ। ইহার নিয়ম হইল ঋজুরেখায় চলা। সুতরাং এই শ্রুতিপারের শব্দ সোজা সমুদ্রের তলদেশে গিয়া প্রতিফলিত হইয়া আবার সোজা পথে জাহাজে পৌঁছাইবে। একটি বিশেষ যন্ত্রের সাহায্যে—ইহাকে বলা হয় হাইড্রোফোন—এই দুইটি শব্দকে গ্রহণ করা হয় এবং ইহাদের অন্তর্বর্তী সময় সূক্ষ্ম ঘড়ির সাহায্যে মাপা হয়। যদি জলের ভিতর শ্রুতিপারের শব্দের বেগ জানা থাকে, তবে ঐ বেগকে সময় দিয়া গুণ করিলে উহা সমুদ্রের

গভীরতার দ্বিগুণ হইবে ; কারণ, শব্দ একবার উপর হইতে নীচুতে গেল এবং আবার ফিরিয়া নীচু হইতে উপরে আসিল। সুতরাং উহা হইতে সহজেই সমুদ্র-গভীরতা নির্ণয় করা যাইবে।

অনেকটা একই রকম পদ্ধতিতে উড়ন্ত বিমান হইতে নির্ণয় করা যায় যে ভূ-পৃষ্ঠ হইতে বিমানটি কত উঁচু দিয়া উড়িয়া যাইতেছে।

1-5. কানের গঠন ও কার্যপ্রণালী

মানুষ কান দিয়া শব্দ শোনে। সুতরাং কানকে মানুষের শ্রুতিযন্ত্র বলা যাইতে পারে। মানুষের কানের গঠন কিরূপ ও শব্দ কানে পৌঁছাইলে তাহা কিরূপে শ্রুতিগোচর হয় সেই সম্বন্ধে নিম্নে আলোচনা করা হইল :

কানের গঠন ঃ

গঠন-প্রণালীর দিক দিয়া কানকে তিন ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে :

(1) বহিরাংশ (2) মধ্যাংশ ও (3) অন্তরাংশ। চিত্রে কানের গঠন-প্রণালী দেখানো হইল।

কানের বহিরাংশ আকারে প্রায় অবতল এবং ইহাতে একটি ছিদ্র আছে। ইহাকেই সাধারণভাবে আমরা 'কান' বলিয়া থাকি। ইহাকে **কর্ণপত্র**ও

কানের গঠন

(Pinna) বলা হইয়া থাকে। এই কর্ণপত্রের সহিত একটি নল যুক্ত আছে। ইহাকে **কর্ণকুহর** বলে। এই কর্ণকুহরের অপর প্রান্তে একটি স্থিতিস্থাপক পর্দা অবস্থিত। এই পর্দাকে বলা হয় **কর্ণপটহ**। এইখানেই কানের বহিরাংশ শেষ হইয়াছে।

কানের মধ্যাংশ তিনখানি হাড় দ্বারা বেষ্টিত একটি গহ্বর বিশেষ। এই হাড় তিনখানিকে একত্রে বলা হয় **অসিকলস্** (Ossicles)। আকৃতিগত সাদৃশ্যের জন্য এই তিনখানি হাড়কে পৃথক্ পৃথক ভাবে যথাক্রমে **হাতুড়ী** (Hammer), **নেহাই** (Anvil) ও **রেকাবী** (Stirrup) বলা হয়। পূর্ব পৃষ্ঠার চিত্রে ইহাদের আলাদাভাবে বর্ধিত আকারে দেখানো হইয়াছে। কর্ণ-পটহের সহিত হাতুড়ীর সংযোগ আছে এবং রেকাবীর সহিত অপর একটি পর্দা যুক্ত আছে যাহা কানের মধ্যাংশ ও অন্তরাংশের সহিত সংযোগ স্থাপন করে। কর্ণপটহের উভয় পাশে বায়ু-চাপ সমান রাখিবার জন্য **ইউস্টেসিয়ান** (Eustachian) নল বা শ্রুতিনালী দ্বারা কানের মধ্যাংশ কণ্ঠনালীর সহিত সংযুক্ত।

কানের অন্তরাংশের উপর দিকে তিনটি **অর্ধবৃত্তাকার নল** (Semicircular canals) পরস্পরের সহিত সমকোণে অবস্থিত। ইহা ছাড়া কানের অন্তরাংশে **শম্বুকী নল** (Cochlea) অবস্থিত। এই নলটি দেখিতে অনেকটা শামুকের খোলার মত। সমগ্র নলটি একটি পর্দা দ্বারা দুই ভাগে বিভক্ত। এই নলের গা হইতে কতকগুলি **স্নায়ুমণ্ডলী** (Auditory nerves) বাহির হইয়া মস্তিষ্কের সহিত সংযুক্ত থাকে। এই স্নায়ুমণ্ডলীই শ্রবণানুভূতি সৃষ্টি করে।

কার্যপ্রণালী ঃ

যখনই কোন শব্দ কানে পৌঁছায় তখন তাহা কর্ণকুহর বাহিয়া কর্ণপটহে কম্পনের সৃষ্টি করে। কর্ণপটহের এই কম্পন হাতুড়ী, নেহাই ও রেকাবী দ্বারা সংবাহিত হইয়া শম্বুকী নলে পৌঁছায়। শম্বুকী নলে যে স্নায়ুমণ্ডলী আছে, তাহা ঐ শব্দকে মস্তিষ্কে বহন করিয়া আনিলে উক্ত শব্দ আমাদের শ্রুতিগোচর হয়। কানের অন্তরাংশে পরস্পর সমকোণে অবস্থিত যে তিনটি অর্ধবৃত্তাকার নল আছে তাহা দ্বারা আমরা বুঝিতে পারি যে শব্দ উপর, নীচ কিংবা পাশ হইতে আসিতেছে।

অনুশীলনী

1. শব্দের জন্য কম্পমান বস্তুর প্রয়োজন তাঁহা কয়েকটি পরীক্ষা দ্বারা বুঝাইয়া দাও।

2. শব্দ কি শূন্য স্থান দিয়া যাইতে পারে? কি পরীক্ষা দ্বারা তোমার উত্তরের সত্যতা প্রমাণ করিতে পার? পৃথিবীর উপর বোমা বিস্ফোরণের শব্দ কি চাঁদে পৌঁছিতে পারে?

3. আলোকের ন্যায় শব্দের প্রতিফলন হয়, ইহা পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ কর।

4. প্রতিধ্বনি কাহাকে বলে? শব্দের পুনঃপুনঃ প্রতিফলনের কতকগুলি ব্যবহারিক প্রয়োগের বর্ণনা কর।

5. একটি সুন্দর নকশা আঁকিয়া মানুষের কানের বিভিন্ন অংশ বুঝাইয়া দাও ও উহাদের কার্য-প্রণালী বর্ণনা কর?

Objective Test প্রশ্ন

[অধীত বিষয়গুলি সম্বন্ধে ছাত্রছাত্রীগণ কতদূর জ্ঞানলাভে সমর্থ হইল তাহা সম্বন্ধে Objective type প্রশ্নের সাহায্যে পরীক্ষা করা বাঞ্ছনীয়। Objective type-এর প্রশ্ন নানাপ্রকার হইতে পারে। প্রত্যেক পরিচ্ছেদের শেষে কিছু কিছু এই ধরনের প্রশ্নের নমুনা দেওয়া হইল। প্রশ্নগুলির উত্তর করিবার নিয়ম সর্বত্র একরূপ। এইজন্য শুধু প্রথম পরিচ্ছেদের নিয়মগুলি বর্ণনা করা হইল। পরবর্তী পরিচ্ছেদে একটি নিয়ম পালন করিতে হইবে বলিয়া উহার পুনরুক্তি করা হয় নাই।]

(ক) Alternate response type :

(i) *Yes or No type* :—

[নিয়ম—নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির মধ্যে যেটির উত্তর 'হ্যাঁ' হইবে তাহার ডানপাশের—স্থানে Y এবং যেটির উত্তর 'না' হইবে তাহার—স্থানে N লেখ।]

(a) শব্দ কি শূন্যস্থান দিয়া চলাচল করিতে পারে?

(b) শব্দের প্রতিফলনের জন্য প্রতিফলক কি খুব মসৃণ হওয়া প্রয়োজন?

(c) শব্দ কি তরল বা কঠিন পদার্থের ভিতর দিয়া যাইতে পারে?

(d) 'প্রতিধ্বনি' কি শব্দের প্রতিফলনের জন্য হয়?

(e) 'অনুরণন'কে কি প্রতিধ্বনি বলা চলে?

(ii) *True or False type* :—

[নিয়ম—নিম্নলিখিত উক্তিগুলির মধ্যে যেটি তুমি নির্ভুল মনে কর তাহার ডানদিকের—স্থানে T এবং যেটি ভুল মনে কর তাহার—স্থানে F বসাও।]

(a) আলোকের ন্যায় শব্দেরও প্রতিফলন হয়।

(b) শব্দের উৎপত্তির জন্য কম্পনের প্রয়োজন নাই।

(c) শব্দ শূন্যস্থান দিয়া চলাচল করিতে পারে।

(d) সকলপ্রকার কম্পাঙ্কযুক্ত শব্দই আমরা শুনিতে পাই।

(e) মেঘের গুরুগুরু ধ্বনি শব্দের বারবার প্রতিফলনের জন্য হয়।

(খ) Recall type :—

[নিয়ম—নিম্নলিখিত বাক্যগুলির শূন্যস্থান পূরণ কর। প্রত্যেক বাক্যের ডানদিকের—স্থানে শব্দগুলি বসাইতে হইবে।]

(a) শব্দের বিস্তারের জন্য কোন-না-কোন—প্রয়োজন।

(b) শব্দ সৃষ্টির জন্য উৎসের—দায়ী।

( ) শব্দের প্রতিফলনের জন্য—সৃষ্টি হয়।

(গ) Completion type :—

[নিয়ম—নিম্নলিখিত বাক্যে কতগুলি শব্দ নাই। ডানপাশের স্থানে উপযুক্ত শব্দগুলি বসাও।]

ধ্বনির — (a) — (b) বলে এবং শব্দের — (c) দরুন এই — —(a)
(d) সৃষ্টি হয় কিন্তু — (e) স্পষ্ট শুনিতে গেলে প্রতিফলককে একটি —(b)
নির্দিষ্ট (f) রাখিতে হইবে। —(c)
—(d)
—(e)
—(f)

(ঘ) Multiple choice type :—

[নিয়ম—নিম্নলিখিত প্রশ্নের পাশে কয়েকটি সম্ভাব্য উত্তর লেখা আছে। যে উত্তরটি তুমি নির্ভুল মনে কর তাহাতে √ চিহ্ন দাও।]

(a) মেঘের গুরুগুরু ধ্বনি কি জন্য হয়? [উঃ—(a) মেঘের কম্পনের জন্য, (b) শব্দের বার বার প্রতিফলনের জন্য, (c) বহু শব্দ সৃষ্টি হইবার জন্য।

(b) বিদ্যুতের ঝলক দেখিবার পর মেঘগর্জন শোনা যায় কেন? উ। শব্দের গতিবেগ আলোকের গতিবেগ অপেক্ষা কম বলিয়া, ঝলকের পর মেঘগর্জন হয় বলিয়া।

(c) শব্দ সৃষ্টির জন্য মূলত দায়ী কে? ' শব্দের উৎসের কম্পন, শব্দ চলাচলের মাধ্যম।

তড়িৎ-বিজ্ঞান
[Electricity]

সূচনা

আমরা আজ যে যুগে বাস করিতেছি তাহাকে অনায়াসে তড়িতের যুগ বলিতে পারি। প্রত্যুষে শয্যাত্যাগ হইতে রাত্রিতে শয্যাগ্রহণ পর্যন্ত দৈনিক জীবনযাত্রায় বহুবার আমরা তড়িতের সাহায্য লইয়া থাকি। আলো বা পাখা চালাইবার জন্য ইলেকট্রিক লাইট ও ফ্যান, স্নানের জল তুলিবার জন্য ইলেকট্রিক পাম্প, যাতায়াতের জন্য ইলেকট্রিক ট্রাম, তিনতলা চারতলায় উঠিবার জন্য ইলেকট্রিক লিফ্‌ট্, গান-বাজনা, আমোদ-প্রমোদের জন্য রেডিও বা সিনেমা সব কিছুই তড়িতের উপর নির্ভরশীল। তাছাড়া দেশের অর্থ নৈতিক উন্নয়নের জন্য যে সমস্ত শিল্প-প্রতিষ্ঠান প্রয়োজন তাহা একান্তভাবে তড়িতের নিকট ঋণী। সুতরাং একথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে মানুষের জীবনের সুখ-সুবিধা, আমোদ-প্রমোদ প্রভৃতি উপকরণ চালু রাখিয়া এবং দেশের সামগ্রিক শিল্পোন্নয়নের ব্যবস্থা করিয়া তড়িৎ আজ সাধারণ মানুষের জীবনের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিয়া গিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে, কোন্ রাষ্ট্র শিল্পক্ষেত্রে কতখানি অগ্রসর তাহা পরিমাপ করা হয় তাহার তড়িৎ-শক্তি ব্যয়ের পরিমাণ দ্বারা।

2-1. তড়িৎ বিভব (Electric Potential)

প্রবাহী-তড়িৎ-বিজ্ঞান আলোচনায় '**বিভব**' কথাটি খুবই প্রয়োজনীয়। এই 'তড়িৎ-বিভব' সম্বন্ধে ধারণা খুব স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন।

তোমরা জান যে জল গড়াইয়া সর্বদা উঁচু হইতে নীচুতে যায়। পাহাড়ের গা হইতে জল গড়াইয়া সমতল ভূমিতে নামিয়া নদীতে মিশিয়া যায়। জলপ্রপাতের জল পাহাড়ের উঁচু জায়গা হইতে সবেগে নীচু জায়গায় পড়ে। কখনও এমন দেখা যায় না যে নীচু তল (level) হইতে জল আপনা হইতে উঁচু তলে যাইতেছে। অর্থাৎ জলের প্রবাহ সর্বদা উঁচু তল হইতে নীচু তলের দিকে হয়। পর পৃষ্ঠায় বর্ণিত পরীক্ষাটি ভালভাবে লক্ষ্য কর।

পরীক্ষা :

দুইটি পাত্র A এবং B একটি পাইপ C দ্বারা সংযুক্ত করা হইল। পাইপে একটি কল লাগান আছে। কল বন্ধ করিয়া পাত্র দুইটিতে এমনভাবে জল ঢালা হইল যে A পাত্রে জলের উচ্চতা B পাত্র হইতে বেশী। এইবার কল খুলিয়া দিলে দেখা যাইবে যে A পাত্র হইতে জল C পাইপ বাহিয়া B পাত্রে যাইতেছে। যতক্ষণ পর্যন্ত না A এবং B পাত্রে জলের তল এক হইবে ততক্ষণ এই জলপ্রবাহ চলিবে। জলের তল এক হওয়া মাত্র জলপ্রবাহ বন্ধ হইবে।
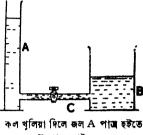
কল খুলিয়া দিলে জল A পাত্র হইতে B পাত্রে যাইবে

সুতরাং জলের তল দেখিয়া আমরা বুঝিতে পারি যে কোন দিকে জলের প্রবাহ হইবে।

তড়িতের বেলায়ও এইরূপ ঘটে। **যখনই কোন বস্তুকে তড়িতাহিত (electrified) করা হয় তখনই তাহার এমন একটি তড়িতাবস্থার সৃষ্টি হয় যাহা দ্বারা বোঝা যায় যে উক্ত বস্তুটি অন্য বস্তুকে তড়িৎ দিবে কিংবা অন্য বস্তু হইতে তড়িৎ গ্রহণ করিবে।**

বস্তুর এই তড়িতাবস্থাকে উহার 'তড়িৎ-বিভব' বলে। সুতরাং তড়িৎ-বিভবকে জলের তলের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে।

দুইটি তড়িৎগ্রস্ত বস্তুর ভিতর সংযোগ স্থাপন করিলে সর্বদা উচ্চবিভব-বিশিষ্ট বস্তু হইতে নিম্নবিভব-বিশিষ্ট বস্তুতে তড়িতের প্রবাহ হয় এবং যতক্ষণ পর্যন্ত দুই বস্তুর বিভব সমান না হইবে ততক্ষণ পর্যন্ত এই তড়িৎপ্রবাহ চলিবে।

আবার, একটি তড়িৎবিহীন বস্তুর সহিত একটি তড়িৎগ্রস্ত বস্তুর সংযোগ ঘটাইলে দেখা যাইবে যে তড়িৎবিহীন বস্তু তড়িৎগ্রস্ত বস্তু হইতে তড়িৎ লইতেছে, যেমন, একটি জলশূন্য পাত্র ও একটি জলপূর্ণ পাত্রের ভিতর সংযোগ ঘটাইলে সর্বদা জলপূর্ণ পাত্র হইতে শূন্য পাত্রে জল প্রবাহিত হয়।

সুতরাং একথা মনে রাখিতে হইবে যে দুই স্থানের তলের পার্থক্য থাকিলে যেমন একটি **চাপের** (pressure) উদ্ভব হয় যাহা তরল পদার্থকে উঁচু হইতে নীচুতে ঠেলিয়া দেয়, তেমনি দুইটি পদার্থের ভিতর বিভব-প্রভেদ **(potential**

difference) থাকিলে একটি **তড়িৎ-চাপের** (electric pressure) সৃষ্টি হয় যাহা তড়িৎকে উচ্চবিভবযুক্ত পদার্থ হইতে নিম্নবিভবযুক্ত পদার্থে প্রবাহিত করে।

বিভব-প্রভেদকে সাধারণত **'ভোল্ট'** (Volt) এই একক দ্বারা প্রকাশিত করা হয়।

22. তড়িৎ প্রবাহ (Electric Current)

আমরা দেখিলাম যে দুইটি অসমবিভবযুক্ত তড়িতাহিত বস্তুর ভিতর সংযোগ স্থাপন করিলে তড়িৎ উচ্চবিভব হইতে নিম্নবিভবযুক্ত বস্তুতে প্রবাহিত হয় এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না বস্তু দুইটির বিভব সমান হয় ততক্ষণ পর্যন্ত এই প্রবাহ চলিতে থাকে। তড়িতের এই প্রবাহকে **তড়িৎপ্রবাহ** (electric current) বলে। এই প্রবাহ যদি সর্বদা একই দিকে হয় তবে তাহাকে **সম-প্রবাহ** (Direct Current or D. C.) বলে। আর যদি প্রবাহের অভিমুখে একটি নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে এদিক ওদিক পরিবর্তিত হয় তবে তাহাকে **পরিবর্তী প্রবাহ** (Alternating Current or A. C.) বলে।

পূর্বেই বলিয়াছি আধুনিক সভ্য জগৎ পরিপূর্ণভাবে এই তড়িৎশক্তির উপর নির্ভরশীল। তড়িৎপ্রবাহ ঘর বাড়ী, কলকারখানা আলোকিত করিতেছে। টেলিগ্রাম, টেলিফোন ও বেতার প্রভৃতি দ্বারা দূরতম প্রান্তের সহিত মুহূর্তের ভিতর সংযোগ স্থাপন করিতেছে। শিল্প বাণিজ্য সংক্রান্ত বহুবিধ যন্ত্রপাতি, আরাম ও সুখ-সুবিধার নানারকম উপকরণ প্রভৃতি চালু রাখিতেছে। তাই আজ মানুষের দৈনন্দিন জীবনে তড়িৎ একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। সেই কারণে প্রবাহী তড়িৎ-বিজ্ঞান সম্বন্ধে কৌতূহল আজ সর্বসাধারণের।

সাধারণভাবে দুইটি বিভিন্ন বিভবযুক্ত তড়িৎগ্রস্ত বস্তুকে তার দিয়া সংযোগ করিলে যে তড়িৎপ্রবাহ পাওয়া যায় তাহা খুবই ক্ষণস্থায়ী, কারণ মুহূর্তের মধ্যেই বস্তু দুইটির বিভব সমান হইয়া যায় এবং প্রবাহ বন্ধ হইয়া যায়। সুতরাং এই প্রবাহকে স্থায়ী করিতে গেলে বস্তু দুইটির বিভব-প্রভেদকে স্থায়ী করা প্রয়োজন।

2-3. স্থায়ী তড়িৎপ্রবাহ কিরূপে সৃষ্টি হয়?

আমরা দেখিলাম যে কোন পরিবাহীতে স্থায়ী তড়িৎপ্রবাহ সৃষ্টি করিতে হইলে পরিবাহীর দুই প্রান্তে বিভব-বৈষম্য স্থায়িভাবে বজায় রাখিতে হইবে। কিরূপে তাহা সম্ভব বুঝিবার জন্য পুনরায় এক পাত্র হইতে অন্য পাত্রে জল-প্রবাহের কথা আলোচনা করা যাউক।

কল খুলিয়া দিলে জল A-পাত্র হইতে B পাত্রে যাইবে, কিন্তু এই প্রবাহ ক্ষণস্থায়ী

ধরা যাউক A এবং B দুইটি পাত্র C পাইপ দ্বারা যুক্ত। L_1 এবং L_2 দুই পাত্রের জলের তল। T একটি প্যাঁচকল যাহা দ্বারা জলপ্রবাহ বন্ধ করা বা খোলা রাখিতে পারে। T খুলিয়া দিলে A পাত্র হইতে B পাত্রে জল প্রবাহ হইবে। কিন্তু এই প্রবাহ ক্ষণস্থায়ী হইবে, কারণ খুব শীঘ্রই দুই পাত্রের জলের তল সমান হইয়া প্রবাহ বন্ধ করিয়া দিবে। এখন যদি একটি পাম্প দিয়া B পাত্র হইতে জল A পাত্রে আনিবার ব্যবস্থা করা হয় এবং যে হারে জল A পাত্র হইতে C পাইপ দিয়া B পাত্রে প্রবেশ করে ঠিক সেই হারে পাম্প আবার A পাত্রে জল প্রবেশ করায় তবে L_1 এবং L_2 এর পার্থক্য ঠিক থাকিবে। ফলে C পাইপ দিয়া সর্বদা জলপ্রবাহ চলিতে থাকিবে।
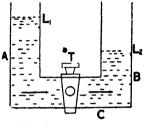
পাম্প দ্বারা জল B-পাত্র হইতে A-পাত্রে পাঠানো হইতেছে

এইবার পরিবাহী দিয়া তড়িৎস্রোতের কথায় আসা যাউক। মনে কর, AB একটি পরিবাহী। ঐ পরিবাহী দিয়া তড়িৎপ্রবাহ পাঠাইতে গেলে A এবং B প্রান্তের বিভব পার্থক্য থাকা প্রয়োজন। এই পার্থক্য স্থায়ী হইলে তড়িৎপ্রবাহও স্থায়ীভাবে AB পরিবাহীতে চালু হইবে। কিন্তু প্রশ্ন হইল, কিরূপে এই বিভব-পার্থক্য স্থায়ী করা যায়? জলপ্রবাহের সাদৃশ্য হইতে প্রশ্ন তোলা যায় যে পাম্পের মত কোন ব্যবস্থা করিয়া A ও B প্রান্তদ্বয়ের বিভব-বৈষম্য বজায় রাখা যায়

কি-না? অর্থাৎ তড়িতের ক্ষেত্রে এইরূপ শক্তিসৃষ্টিকারী পাম্প আছে কি-না? বিজ্ঞানীগণ দেখিয়াছেন যে রাসায়নিক শক্তিকে কাজে লাগাইয়া এই ধরনের 'তড়িৎ-পাম্প' সৃষ্টি করা যায়। ইহার নাম **তড়িৎ-কোষ** (electric cell)।

2-4. তড়িৎকোষ আবিষ্কারের গোড়ার কথা

তড়িৎ-কোষ প্রথম উদ্ভাবন করেন ইতালীয় বিজ্ঞানী ভোল্টা। কিন্তু ইহার জন্য দায়ী গ্যাল্‌ভানির বিখ্যাত ব্যাঙের পরীক্ষা ও ভোল্টা কর্তৃক ইহার ব্যাখ্যা এবং এই ব্যাখ্যানুসারে **ভোল্টার স্তূপ** (Voltaic pile) নির্মাণ। তড়িৎ-কোষ আবিষ্কারের এই ইতিহাস গল্পের মতন চিত্তাকর্ষক।

1786 খ্রীষ্টাব্দ—অর্থাৎ 176 বছর আগেকার কথা। ইতালীর অন্তর্গত বোলোগনা বিশ্ববিদ্যালয়ে **লুইগি গ্যালভানি** অ্যানাটমির বিখ্যাত অধ্যাপক। নানারকম কাটা জীব-জন্তুর দেহ লইয়া তিনি অ্যানাটমির মজার মজার পরীক্ষা করেন। একদিন এই রকম এক পরীক্ষার জন্য একটি সদ্যকাটা ব্যাঙের পা লবণ-জলে ভিজাইয়া পিতলের হুক হইতে ঝুলাইয়া রাখিয়াছিলেন। ঝুলন্ত ব্যাঙের পায়ের তলায় ছিল বারান্দার লোহার রেলিঙ্‌। হঠাৎ গ্যালভানি লক্ষ্য করেন যে, যতবার হাওয়ায় আন্দোলিত হইয়া ব্যাঙের পা লোহার রেলিঙ্‌ স্পর্শ করিতেছিল ততবারই মাংসপেশী হঠাৎ সংকুচিত হইয়া পা ছিট্‌কাইয়া আসিতেছিল। এই অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ্য করিয়া গ্যালভানি বিস্মিত হইলেন। অতঃপর ইহা ভালভাবে পরীক্ষা করিবার জন্য তিনি আর একটি কাটা ব্যাঙের পা তামার হুক হইতে ঝুলাইয়া দস্তার দণ্ড দিয়া স্পর্শ করিলেন। এবারও তিনি একই রকম ফল পাইলেন। ইহা হইতে তাহার
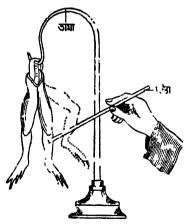
দস্তার দণ্ড দ্বারা ব্যাঙের পা স্পর্শ করিলেই পা ছিটকাইয়া যায়

ধারণা হইল যে, ব্যাঙের দেহে আপনা হইতেই তড়িৎ বর্তমান, কারণ ইহার পূর্বে তড়িদযন্ত্র হইতে তড়িৎ পাঠাইয়া মৃত ব্যাঙের শরীরে ঐরূপ স্পন্দন তিনি লক্ষ্য করিয়াছিলেন। ধাতবদণ্ড তড়িতের পরিবাহী; সুতরাং ধাতবদণ্ড স্পর্শ করাইলে ব্যাঙের দেহস্থিত তড়িতের প্রবাহ হয় এবং মাংসপেশীর সংকোচন হয়। ফলে ব্যাঙের পা ছিটকাইয়া যায়। ইহাই ছিল গ্যালভানির ধারণা। গ্যালভানির এই পরীক্ষা তখনকার দিনে বহু লোক দেখিয়াছিল এবং তাহাকে ঠাট্টা করিয়া 'ব্যাঙ নাচানো অধ্যাপক' বলিত।

এ ভোল্টা [1745-1827]

ব্যাঙের শরীরে আপনা হইতে তড়িৎ বর্তমান—গ্যালভানির এই মত সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেন প্যাভিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক **আলেজান্দ্রো ভোল্টা**। তিনি বলিলেন ব্যাঙের শরীরে তড়িৎ নাই। তড়িপ্রবাহের সৃষ্টি হইয়াছে পিতল ও লোহা অথবা তামা ও দস্তা এই দুইটি বিভিন্ন ধাতুর সংস্পর্শের জন্য। ব্যাঙের দেহ তড়িৎ পরিবাহী। সুতরাং যখনই দুইটি বিভিন্ন ধাতু ব্যাঙের শরীরের মাধ্যমে সংযোজিত হইতেছে তখনই তড়িৎপ্রবাহ সৃষ্টি হইতেছে।
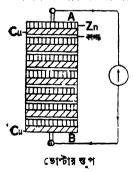
তিনি অতঃপর 1800 খ্রীষ্টাব্দে তাহার বিখ্যাত স্তূপ (Pile) তৈয়ারী করিয়া তাহার মতবাদকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিলেন। এই স্তূপ কতকগুলি দস্তা ও তামার পাত পর পর রাখিয়া তৈয়ারী করা। প্রত্যেক দুইটি পাতের পর Sulphuric acid-এ সিক্ত এক টুকরা কাপড় রাখা আছে। সর্বপ্রথম দস্তার পাত এবং সর্বশেষ তামার পাতকে কোন পরিবাহী (AB) তার দিয়া যোগ করিলে তড়িৎ-প্রবাহের সৃষ্টি হয়।

ভোল্টার স্তূপ

ভোল্টার মতবাদ অনুযায়ী দুইটি বিভিন্ন ধাতুকে স্পর্শ করাইলে বিভব-প্রভেদের সৃষ্টি হয় এবং তাহার

ফলে তড়িৎপ্রবাহ উৎপন্ন হয়। কিন্তু ভোল্টার এই মতবাদে কিছু ত্রুটি আছে। ভোল্টার স্তূপ পরীক্ষা করিয়া দেখা যায় যে, দস্তা ও সালফিউরিক অ্যাসিডের সংস্পর্শে কিছু রাসায়নিক ক্রিয়া সংঘটিত হয় অর্থাৎ রাসায়নিক শক্তির ব্যয় হয়। ইহা হইতে ডেভী, ডিলারিভ্, ফেবরনী প্রভৃতি বিজ্ঞানীরা স্থির করেন যে, তড়িৎপ্রবাহের মূল কারণ দুইটি বিভিন্ন ধাতুর সংস্পর্শ নয়— মূল কারণ হইতেছে রাসায়নিক ক্রিয়া।

এইভাবে নানা ঘটনার ভিতর দিয়া বিজ্ঞানীরা তড়িৎ-কোষের মূল কথা উপলব্ধি করিতে পারিলেন।

2-5. সরল ভোল্টীয় কোষ (Simple Voltaic Cell)

ভোল্টার স্তূপ হইতে প্রমাণিত হয় যে, তড়িৎপ্রবাহ সৃষ্টির জন্য রাসায়নিক শক্তির প্রয়োজন। **যে-ব্যবস্থার দ্বারা রাসায়নিক শক্তির বদলে স্থায়ী তড়িৎপ্রবাহ সৃষ্টি করা যায় তাহাকে তড়িৎকোষ বলে।** ভোল্টা সর্বপ্রথম এই ধরনের কোষ নির্মাণ করেন বলিয়া ইহাকে ভোল্টীয় কোষ বলে।

বিবরণ : একটি কাচের পাত্রে লঘু সালফিউরিক অ্যাসিড রাখিয়া উহার ভিতরে একটি দস্তার (Zn) পাত ও একটি তামার (Cu) পাত ডুবানো আছে। পাত দুইটির সহিত দুইটি বন্ধনী (terminal) লাগানো থাকে। একটি তামার তার বন্ধনী দুইটির সহিত লাগাইলে পাত দুইটির ভিতর সংযোগ স্থাপিত হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে রাসায়নিক ক্রিয়া শুরু হইবে। দস্তা ও সালফিউরিক অ্যাসিড রাসায়নিক ক্রিয়া করিয়া জিঙ্ক সালফেট নামক যৌগিক ও হাইড্রোজেন (Hydrogen) গ্যাস তৈয়ার করিবে। তামার পাত বাহিয়া এই হাইড্রোজেন গ্যাসের বুদ্‌বুদ্ উঠিবে। ইহা ছাড়া তামার পাত হইতে দস্তার পাতের দিকে তার বাহিয়া তড়িৎপ্রবাহেরও সৃষ্টি হইবে। কারণ, রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে তামা ও দস্তার পাতে একটি বিভব-পার্থক্য উৎপন্ন হইবে।
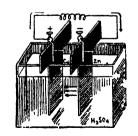
ভোল্টীয় কোষ

যদি বন্ধনী হইতে তার খুলিয়া ফেলা যায় তবে কোন রাসায়নিক ক্রিয়া হইবে না বা কোন তড়িৎপ্রবাহও দেখা যাইবে না। কিন্তু তামা ও দস্তার পাতের ভিতর বিভব পার্থক্য থাকিয়া যাইবে। তামার পাতকে **উচ্চ** অথবা **ধনাত্মক বিভব** ও দস্তার পাতকে **নিম্ন** অথবা **ঋণাত্মক বিভবযুক্ত পাত** বলা হয়। ইহাদের ধনাত্মক মেরু (Positive Pole) ও ঋণাত্মক মেরু (Negative Pole)-ও বলা হয়।

যখন বন্ধনীদ্বয় তামার তার দিয়া যোগ করা হয় তখন তার বাহিয়া তামার পাত হইতে দস্তার পাতে তড়িৎপ্রবাহের ফলে পাত দুইটির বিভব প্রভেদ ক্রমশ লোপ পাইতে চেষ্টা করে। কিন্তু কোষের ভিতর দস্তা ও সালফিউরিক অ্যাসিডের আবার রাসায়নিক ক্রিয়া হইবার ফলে বিভব প্রভেদ বজায় থাকে। কাজেই এই কোষ 2.3 অনুচ্ছেদে বর্ণিত পাম্পের মত কাজ করে।

2.6. তড়িৎপ্রবাহের ফল

(Effects of electric current)

যখন কোন পরিবাহীর ভিতর দিয়া তড়িৎপ্রবাহ হয় তখন নিম্নলিখিত তিনটি ফল (effect) দেখিতে পাওয়া যায়।

(1) **তাপীয় ফল** (Heating effect) : যখন কোন তারের মধ্য দিয়া তড়িৎপ্রবাহ ঘটে তখন তারটি গরম হইয়া পড়ে। দৈনন্দিন বহুরকম ঘটনার মধ্য দিয়া তড়িৎপ্রবাহের এই ফলের সহিত আমরা পরিচিত। বিজলী বাতির সরু ফিলামেন্টের ভিতর দিয়া যখন তড়িৎপ্রবাহ চলে তখন ফিলামেন্ট এত গরম হইয়া পড়ে যে তাহা হইতে উজ্জ্বল আলোর সৃষ্টি হয়। তড়িৎপ্রবাহের এই তাপীয় ফলের ব্যবহারিক প্রয়োগের দ্বারা বহু প্রয়োজনীয় জিনিসের উদ্ভাবন সম্ভব হইয়াছে। এই সম্বন্ধে 2.16 অনুচ্ছেদে আলোচনা করা হইয়াছে।

(2) **চুম্বকীয় ফল** (Magnetic effect) : যখন কোন তারের মধ্য দিয়া তড়িৎ প্রবাহিত হয় তখন তারের চতুর্দিকে একটি চৌম্বক-ক্ষেত্রের (magnetic field) সৃষ্টি হয়। একটি চুম্বক শলাকা উক্ত তড়িৎ-বাহী তারের কাছে আনিলে শলাকার বিক্ষেপ (deflection) উপরোক্ত তথ্য প্রমাণ করিবে। ইহাকে তড়িৎপ্রবাহের চুম্বকীয় ফল বলা হয়। এই সম্বন্ধে 2-8 অনুচ্ছেদে আলোচনা করা হইয়াছে।

(3) **রাসায়নিক ফল** (Chemical effect) :

পরীক্ষা : একটি কাচের পাত্রে খানিকটা copper sulphate দ্রবণ লও এবং উহাতে কয়েক ফোঁটা sulphuric acid মিশাও। দ্রবণের ভিতর দুইটি তামার পাত ডুবাইয়া পাত দুইটির সহিত একটি তড়িৎকোষ যুক্ত কর। A হইল anode এবং C হইল cathode। C পাতটি ডুবাইয়া আগে ভাল ভাবে পরিষ্কার করিয়া ওজন লও। এইবার তড়িৎকোষ হইতে কিছুক্ষণ ধরিয়া দ্রবণের ভিতর তড়িৎ-প্রবাহ পাঠাও। পরে C-পাতটি ওজন কর। দেখিবে যে উহার ওজন কিছু বাড়িয়াছে।
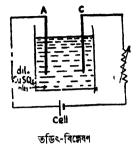
তড়িৎ-বিশ্লেষণ

অর্থাৎ, তড়িৎ প্রবাহের ফলে copper sulphate-এর অণুগুলি বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়িয়াছে এবং copper-এর অণুগুলি C-প্লেটে জমা হইয়াছে। ইহাকে তড়িৎপ্রবাহের রাসায়নিক ফল বা তড়িৎবিশ্লেষণ (electrolysis) বলা হয়। ইলেকট্রোপ্লেটিং তড়িৎ-বিশ্লেষণের ব্যবহারিক প্রয়োগ। ইলেকট্রোপ্লেটিং পদ্ধতিতে চামচ, কাঁটা প্রভৃতির উপর রূপার প্রলেপ দিয়া ঐগুলিকে চকচকে করা হয়।

2-7. প্রবাহ-মাত্রা ও রোধ

(Current strength and Resistance)

কোন পরিবাহী তারকে তড়িৎকোষের সহিত যুক্ত করিলে তার দিয়া স্থায়ী তড়িৎপ্রবাহ চলিতে থাকে। তড়িতের এই স্থায়ী প্রবাহের সহিত কোন নলের ভিতর দিয়া জলপ্রবাহের যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে পূর্বেই বলা হইয়াছে। নলের দুই মুখে যদি চাপের পার্থক্য সর্বদা বজায় রাখা যায় তবে নল দিয়া জলপ্রবাহ হইবে (চিত্র দেখ)। নল দিয়া প্রতি সেকেণ্ডে কতখানি জল বাহির হইয়া আসিতেছে
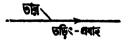
তড়িৎপ্রবাহ ও জলপ্রবাহের সাদৃশ্য

তাহা দ্বারা আমরা উক্ত জলপ্রবাহের মাত্রা মাপিতে পারি। যদি 10 সেকেণ্ডে 50 গ্রাম জল নল দিয়া বাহির হয় তবে জলের প্রবাহ-মাত্রা $\frac{50}{10}=5$ গ্রাম প্রতি সেকেণ্ডে। ঠিক একই ভাবে কোন তার দিয়া যখন তড়িৎপ্রবাহ হয় তখন ঐ

তারের কোন বিন্দু দিয়া প্রতি সেকেণ্ডে কতখানি তড়িৎ অতিক্রম করে তাহা দ্বারা তড়িৎ-প্রবাহ-মাত্রা মাপা হয়। (যদি 't' সেকেণ্ডে 'Q' পরিমাণ তড়িৎ তারের কোন বিন্দু অতিক্রম করে তবে উক্ত তারে তড়িতের প্রবাহ-মাত্রা

(current strength) $I = \frac{Q}{t}$)

তড়িতের প্রবাহ মাত্রা সাধারণত **'অ্যাম্পীয়ার'** (ampere) এককে প্রকাশ করা হয়।

তড়িৎ বিজ্ঞানে **'রোধ'** কথাটি খুবই প্রয়োজনীয় পূর্ববর্ণিত কোন নল দিয়া জলপ্রবাহের তুলনা দ্বারা 'রোধ' কথাটির তাৎপর্য খুব সহজে বোঝা যাইবে।

আমরা দেখিয়াছি যে, কোন নলের দুই মুখে চাপের পার্থক্য থাকিলে নল দিয়া জলপ্রবাহ হয়। এখন চাপের পার্থক্য ঠিক রাখিয়া যদি নলটি মোটা বা সরু অথবা বেশী লম্বা বা কম লম্বা করা যায় তবে কি প্রবাহ-মাত্রা ঠিক থাকিবে? না -প্রবাহ মাত্রার পরিবর্তন হইবে কারণ একথা সহজেই বোঝা যায় যে, প্রবাহ-মাত্রা নলটির প্রস্থচ্ছেদ (cross-section) এবং দৈর্ঘ্যের উপর নির্ভর করে। প্রস্থচ্ছেদ বেশী হইলে অর্থাৎ মোটা হইলে প্রবাহ-মাত্রা বৃদ্ধি পাইবে কিন্তু নলটি দীর্ঘ হইলে প্রবাহ-মাত্রা হ্রাস পাইবে। অর্থাৎ, আমরা বলিতে পারি যে মোটা নলে জলপ্রবাহ কম বাধা পায় কিন্তু নল দীর্ঘ হইলে বাধা বৃদ্ধি পায়।

কোন তার দিয়া তড়িৎ-প্রবাহ হইলে ঠিক একই ঘটনা ঘটে। অর্থাৎ, তড়িতের প্রবাহ-মাত্রা তারের প্রস্থচ্ছেদ ও দৈর্ঘ্যের উপর নির্ভর করে। প্রস্থচ্ছেদ বাড়িলে প্রবাহ-মাত্রা বৃদ্ধি পায় এবং দৈর্ঘ্য বেশী হইলে প্রবাহ-মাত্রা কমিয়া যায়। সুতরাং আমরা বলিতে পারি যে, মোটা তারে তড়িৎ-প্রবাহ কম বাধা পায় এবং তারের দৈর্ঘ্য বাড়িলে বাধাও বৃদ্ধি পায়। তড়িৎ-প্রবাহের বিরুদ্ধে এই বাধাকে **'রোধ'** (resistance) বলা হয়। কোন পরিবাহীর রোধ উক্ত পরিবাহীর প্রস্থচ্ছেদ, দৈর্ঘ্য ও উপাদানের উপর নির্ভর করে।

'রোধ'কে সাধারণত **'ওহ্‌ম্'** (Ohm), এই এককে প্রকাশ করা হয়।

কোন পরিবাহীর দুই প্রান্তের বিভব-প্রভেদ, উহার রোধ ও প্রবাহমাত্রা —এই তিনটি জিনিসকে সংযুক্ত করিয়া একটি বিখ্যাত সূত্র আছে। এই সূত্রটি আবিষ্কার করেন ব্যাভেরিয়ার বিজ্ঞানী জি. এল্. ওহ্‌ম্ 1826 খ্রীষ্টাব্দে। এই

কারণে সূত্রটিকে **ওহ্মের সূত্র** বলা হয় এবং এই সূত্র প্রবাহী-তড়িৎ বিজ্ঞানের মূল কথা। সূত্রটি নিম্নরূপ :

পরিবাহীর তাপমাত্রা পরিবর্তিত না হইলে, উহার দুই প্রান্তের বিভব-প্রভেদ উহার প্রবাহ-মাত্রার সমানুপাতিক। অর্থাৎ,

বিভব-প্রভেদ $\propto$ প্রবাহমাত্রা

অথবা, বিভব-প্রভেদ = ধ্রুবক $\times$ প্রবাহমাত্রা

এই ধ্রুবককে পরিবাহীর 'রোধ' বলা হয়। সুতরাং ওহ্মের সূত্র হইতে আমরা নিম্নলিখিত প্রয়োজনীয় সমীকরণ পাই :

বিভেদ প্রভেদ = রোধ $\times$ প্রবাহ-মাত্রা

অনুশীলনী

1. পরিবাহীর 'বিভব' বলিতে কি বুঝায়? ইহার সহিত তরলের কি সাদৃশ্য আছে?
2. তড়িৎপ্রবাহ কাহাকে বলে? স্থায়ী তড়িৎপ্রবাহ সৃষ্টির জন্য কি করা প্রয়োজন?
3. তড়িৎকোষ কি? সরল ভোল্টীয় কোষের বিবরণ দাও।
4. তড়িৎপ্রবাহের ফল কি? ইহাদের সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা কর।
5. তড়িৎপ্রবাহ-মাত্রা কাহাকে বলে? পরিবাহীর 'রোধ' সম্বন্ধে বুঝাইয়া বল। ইহা পরিবাহীর কি কি বিশেষত্বের উপর নির্ভর করে?
6. ওহমের সূত্র কাহাকে বলে?

Objective Type প্রশ্ন

(ক) Alternate response type :—

(i) *Yes or No type :—*

(a) তড়িৎ-কোষ হইতে আমরা যাহা পাই তাহা কি স্থির তড়িৎ?

(b) সকল বস্তুকেই কি তড়িতের পরিবাহী বলা যাইবে?

(c) পরিবাহীর রোধ কি উহার উপাদানের উপর নির্ভর করে?

(d) স্থির-তড়িৎ ও প্রবাহী-তড়িৎ কি একই বস্তু?

(e) বিভবকে কি জলের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে?

(f) সরল ভোল্টীয় কোষ কি ভোল্টার আবিষ্কার?

(ii) *True or False type :—*

a) নিম্নবিভবযুক্ত বস্তু হইতে তড়িৎ উচ্চ বিভবযুক্ত বস্তুতে প্রবাহিত হয়।

(b) প্রবাহ যদি সর্বদা একই দিকে হয় তবে তাহাকে সমপ্রবাহ বলে।

(c) পরিবাহীর বিভব প্রভেদ উহার তড়িৎ-প্রবাহের সমানুপাতিক।

(খ) Recall type :—

(a) প্রবাহের অভিমুখ যদি একটি নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে এদিক-ওদিক পরিবর্তিত হয় তবে তাহাকে — প্রবাহ বলে।

(b) যে-ব্যবস্থা দ্বারা রাসায়নিক শক্তির বদলে স্থায়ী তড়িৎ-প্রবাহ সৃষ্টি করা যায় তাহাকে — বলে।

(c) তড়িৎ — ভিতর দিয়া সহজে চলাচল করিতে পারে।

(গ) Completion type :—

যখন কোন বস্তুকে — (a) করা হয় তখন তাহার এমন একটি — (b) সৃষ্টি হয় যাহা দ্বারা বোঝা যায় যে উক্ত বস্তুটি অন্য বস্তুকে তড়িৎ — (c) কিংবা অন্য বস্তু হইতে তড়িৎ — (d) করিবে।

—(a)
—(b)
—(c)
—(d)

(ঘ) Multiple choice type :—

(a) কোন তারের ভিতর দিয়া প্রবাহ-মাত্রা কাহার উপর নির্ভর করে ?

উ। বিভব-প্রভেদ, তারের উপাদান, তারের ব্যাস।

(b) বৈদ্যুতিক আলো উৎপাদন প্রবাহের কোন্ ফলের উপর নির্ভর করে ?

উ। রাসায়নিক ফল, তাপীয় ফল।

(c) প্রবাহ-মাত্রা কোন্ এককে প্রকাশ করা হয় ?

উ। ওহম্, অ্যামপীয়ার, ভোল্ট।

(d) সরল ভোল্টীয় কোষে কোন্ পাতটি ধনাত্মক ?

উ। জিঙ্ক পাত ; তামার পাত।

(e) তড়িৎ প্রবাহের দরুন চুম্বকশলাকার বিক্ষেপকে কি ভাবে গণ্য করা যাইবে ?

উ। তড়িৎ প্রবাহের চুম্বকীয় ফল, তাপীয় ফল, রাসায়নিক ফল।

(f) পরিবাহীর রোধ পরিবাহীর কোন্ বিষয়ের উপর নির্ভর করে ?

উ। পরিবাহীর উপাদান, দৈর্ঘ্য, প্রস্থচ্ছেদ ?

2-8. তড়িৎ ও চুম্বকের ভিতর পারস্পরিক ক্রিয়া

(Interaction of Electricity & Magnetism)

(1) **চুম্বকের উপর তড়িৎপ্রবাহের ক্রিয়া** (Action of electric current on magnet) :

Oersted-**এর পরীক্ষা :** তড়িৎপ্রবাহের বিভিন্ন ফল আলোচনা করিবার সময় তড়িৎপ্রবাহের চুম্বকীয় ফল সম্বন্ধে বলা হইয়াছে। চুম্বকের উপর তড়িৎপ্রবাহের এই ফল সর্বপ্রথম Oersted লক্ষ্য করেন 1820 খ্রীষ্টাব্দে। নিম্নে Oersted-এর পরীক্ষা বর্ণনা করা হইল :

AB একটি পরিবাহী তার যাহার ভিতর দিয়া তড়িৎপ্রবাহ চলিতে পারে। তারের নীচে একটি চুম্বক-শলাকা (magnetic needle) রাখা আছে। যখন তারের ভিতর দিয়া কোন তড়িৎপ্রবাহ চলে না তখন চুম্বক-শলাকাটি
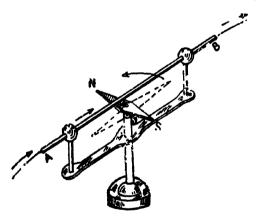
AB তারে তড়িৎপ্রবাহ থাকিলে চুম্বক-শলাকা সমান্তরাল থাকে ;
তড়িৎপ্রবাহ চলিলে শলাকার বিক্ষেপ হয়।

তারের সমান্তরালভাবে উত্তর-দক্ষিণমুখী হইয়া অবস্থান করে। চিত্রে কাটা কাটা রেখা (dotted lines) দ্বারা ঐ অবস্থানকে দেখানো হইয়াছে। কিন্তু যেই তারের ভিতর দিয়া তড়িৎপ্রবাহ পাঠানো হয় সঙ্গে সঙ্গে চুম্বক-শলাকার বিক্ষেপ (deflection) হইবে এবং শলাকা তারের সহিত লম্বভাবে অবস্থান করিবে। যদি তারটি শলাকার নীচু দিয়া যায় তবে শলাকার বিক্ষেপ উল্টা

দিকে হয়। অথবা তড়িৎপ্রবাহের অভিমুখ A হইতে B-এর দিকে না করিয়া উল্টাইয়া B হইতে A-এর দিকে করিলে শলাকার বিক্ষেপ উল্টা দিকে হইবে।

এই পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ হয় যে, তড়িৎপ্রবাহ চৌম্বকক্ষেত্র (magnetic field) সৃষ্টি করিতে পারে। কারণ চৌম্বকক্ষেত্রের প্রভাব ছাড়া চুম্বক-শলাকার বিক্ষেপ হইতে পারে না। এইভাবে সর্বপ্রথম তড়িৎ ও চুম্বকের ভিতর যে পারস্পরিক ক্রিয়া আছে তাহা আবিষ্কৃত হইল।

Oersted-এর এই আবিষ্কার তড়িৎ-বিজ্ঞানে এক নূতন যুগের সূচনা করিল, কারণ বহু প্রয়োজনীয় তড়িৎ-যন্ত্র তড়িৎ ও চুম্বকের পারস্পরিক ক্রিয়ার ফলে তৈয়ারী হইয়াছে।)

চুম্বক বিক্ষেপের দিক্ নির্ণয়ের নিয়ম: পূর্ববর্ণিত পরীক্ষায় দেখিয়াছি যে, চুম্বক-শলাকা তারের উপরে রাখিলে যেদিকে বিক্ষেপ হয় নীচে রাখিলে বিক্ষেপ উল্টা দিকে হয়। অথবা প্রবাহের অভিমুখ উল্টাইয়া দিলেও বিক্ষেপ উল্টা দিকে হয়। তড়িৎপ্রবাহের ফলে চুম্বক শলাকার বিক্ষেপ কোন দিকে হইবে তাহা নিম্নলিখিত তিনটি নিয়মের দ্বারা নির্ণয় করা যায়:—

(1) **অ্যামপীয়ারের নিয়ম** (Ampere's rule): মনে কর, কোন মানুষ তড়িৎবাহী তার বরাবর প্রবাহের অভিমুখে এমনভাবে হাত ছড়াইয়া সাঁতরাইতেছে যে তাহার মুখ সর্বদা চুম্বকের দিকে থাকে। এই

অ্যামপীয়ারের নিয়ম

অবস্থায় মানুষটির বাম হাতের দিকে চুম্বকের উত্তর-মেরু (N Pole) বিক্ষিপ্ত হইবে। সুতরাং দক্ষিণ-মেরু মানুষটির ডান হাতের অভিমুখে বিক্ষিপ্ত হইবে।

(2) **ম্যাক্সওয়েলের কর্ক-স্ক্রু নিয়ম** (Maxwell's cork-screw rule): পরিবাহী তার দিয়া যে-দিকে তড়িৎপ্রবাহ হইতেছে, মনে করে, একটি ডান পাকের কর্ক-স্ক্রুকে (right-hand screw) পরিবাহী তার বরাবর সেই দিকে চালনা করা হইতেছে। এই অবস্থায় বৃদ্ধাঙ্গুলী যেদিকে ঘুরিবে চুম্বক শলাকার উত্তর-মেরু সেই দিকে বিক্ষিপ্ত হইবে।

কর্ক-স্ক্রু নিয়ম

(3) **ফ্লেমিং-এর ডান-হাত নিয়ম** (Fleming's right-hand rule): ডান-হাতের প্রথম তিনটি আঙ্গুল এমনভাবে প্রসারিত কর যে উহারা পরস্পরের সহিত লম্বভাবে অবস্থান করে। তর্জনী (fore finger) তার বরাবর প্রবাহের অভিমুখী হইলে এবং মধ্যমা (middle finger) চুম্বক-শলাকার দিকে মুখ করিয়া থাকিলে, বৃদ্ধাঙ্গুলী যে দিকে থাকিবে চুম্বক শলাকার উত্তর-মেরু সেইদিকে বিক্ষিপ্ত হইবে।
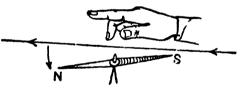
ফ্লেমিং-এর ডান হাত নিয়ম

2-9. তড়িৎপ্রবাহের চুম্বকীয় ফলের ব্যবহারিক প্রয়োগ

(1) **তড়িৎ চুম্বক** (Electro-magnet): তড়িৎপ্রবাহের সাহায্যে কোন বস্তুকে চুম্বকে পরিণত করা হইলে তাহাকে তড়িৎ-চুম্বক বলে। খুব বড় বড় শক্তিশালী তড়িৎ-চুম্বক কারখানাতে ব্যবহৃত হয়। তোমরা যদি কেহ জামসেদপুরে টাটার কারখানা দেখিয়া থাক তবে ঐরূপ তড়িৎ-চুম্বক নিশ্চয়ই দেখিয়াছ। কিরূপে ঐ তড়িৎ-চুম্বক তৈয়ারী হয়, এইবার সেই কথা বলিতেছি।

একটি দীর্ঘ অন্তরিত (insulated) তারকে একটি চোঙের গায়ে জড়াইয়া যে কুণ্ডলী তৈয়ারী করা যায় তাহাকে **সলিনয়েড** (solenoid) বলে। এইরূপ সলিনয়েডের ভিতর দিয়া তড়িৎপ্রবাহ পাঠাইলে দেখা যায় যে সলিনয়েডের দুই মুখে চুম্বকের ন্যায় দুই মেরুর উদ্ভব হইয়াছে। সলিনয়েড ঐ অবস্থায় একটি চুম্বক দণ্ডের ন্যায় ব্যবহার করে। তড়িৎপ্রবাহের চুম্বকীয় ফলের জন্যই এইরূপ হয়।

সলিনয়েড
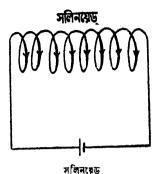
এখন যদি একটি কাঁচা লোহার দণ্ডকে ঐ কুণ্ডলীর ভিতর ঢুকানো যায় এবং কুণ্ডলী দিয়া তড়িৎপ্রবাহ পাঠানো যায় তবে দেখা যায় যে দণ্ডটি শক্তিশালী চুম্বকে পরিণত হইয়াছে। ইহার কারণ এই যে কুণ্ডলীর ভিতর তড়িৎ-প্রবাহ যাইবার ফলে যে চৌম্বকক্ষেত্রের সৃষ্টি হয় তাহা ঐ লৌহ-দণ্ডকে শক্তিশালী চুম্বকে পরিণত করে। ইহাই **তড়িৎচুম্বক** (electro-magnet)।

তড়িৎ চুম্বকের সুবিধা এই যে তড়িৎপ্রবাহ যতক্ষণ চলিবে ততক্ষণ ইহার চুম্বকত্ব থাকিবে এবং তড়িৎপ্রবাহ বন্ধ হইলেই ইহার চুম্বকত্ব অন্তর্হিত হইবে। তা'ছাড়া তারের পাকের (turn) সংখ্যা বাড়াইয়া অথবা তড়িৎপ্রবাহের মাত্রা বাড়াইয়া চুম্বকের শক্তি বৃদ্ধি করা যায়।

ব্যবহারিক ক্ষেত্রে যে-সমস্ত তড়িৎ-চুম্বক কাজে লাগানো হয় তাহা অশ্বখুরের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট। ইহার গায়ে অন্তরিত তার জড়ানো থাকে। অশ্ব-খুরাকৃতি হওয়ায় চুম্বকের শক্তি আরো বৃদ্ধি পায়।

শক্তিশালী তড়িৎ-চুম্বক

নিম্নে তড়িৎ চুম্বকের কয়েকটি প্রয়োজনীয় ব্যবহার উল্লেখ করা হইল।

(1) বৈদ্যুতিক ঘণ্টা, বৈদ্যুতিক পাখা, রিলে (Relay) প্রণালী মোটর, ডায়নামো প্রভৃতি বৈদ্যুতিক যন্ত্রে ইহার ব্যবহার আছে।
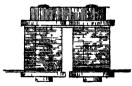
(2) কারখানায় খুব ভারী জিনিস তুলিতে বা সরাইতে অথবা বৃহৎ লৌহ-খণ্ডকে উঁচুতে তুলিয়া পরে মাটিতে ফেলিয়া ভাঙ্গিবার জন্য তড়িৎ-চুম্বক ব্যবহার করা হয়।
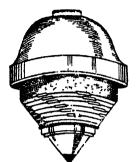
চিকিৎসকগণ এই তড়িৎ-চুম্বক ব্যবহার করেন

(3) কতগুলি অচৌম্বক পদার্থের সহিত লোহা মিশানো থাকিলে লোহাকে পৃথক্ করিবার জন্য তড়িৎ-চুম্বক ব্যবহৃত হয়।

(4) চোখে লোহার কুঁচি পড়িলে চিকিৎসকগণ তড়িৎ-চুম্বকের সাহায্যে উহা চোখ হইতে বাহির করিয়া ফেলেন।

বৈদ্যুতিক ঘণ্টা (Electric bell) **:** বৈদ্যুতিক ঘণ্টা বা 'কলিং বেল' তোমরা নিশ্চয়ই দেখিয়াছ। অনেক অফিসে বা অনেক বাড়িতে 'কলিং বেল' থাকে। এই বেলের বোতাম টিপিলেই ক্রিং ক্রিং করিয়া আওয়াজ হয়। এই ঘণ্টায় তড়িৎ-চুম্বক ব্যবহার করা হয়।

বিবরণ : M একটি অশ্বখুরাকৃতি তড়িৎ-চুম্বক। চুম্বকের মেরুদ্বয়ের সম্মুখে A একটি কাঁচা লোহার তৈয়ারী আর্মেচার (armature)। আর্মেচারের উপর প্রান্ত একটি স্প্রীং S-এর সহিত এবং নিম্নপ্রান্ত একটি হাতুড়ি H-এর সহিত যুক্ত। সাধারণ অবস্থায় আর্মেচার A একটি স্ক্রু-K স্পর্শ করিয়া থাকে। একটি তড়িৎকোষের একপ্রান্ত এই স্ক্রু K-র সহিত যুক্ত এবং অপর প্রান্ত একটি ঠেলা চাবির (bell push) ভিতর দিয়া তড়িৎ-চুম্বকের সহিত যুক্ত। ঠেলা-চাবি চাপিয়া ধরিলে বর্তনী (circuit) সংহত (closed) হইবে। চিত্রে বৈদ্যুতিক ঘণ্টার তড়িৎ সংযোগ (electric connection) দেখান হইল।
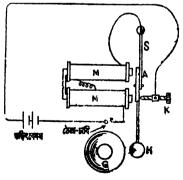
বৈদ্যুতিক ঘণ্টা

কার্যপ্রণালী : ঠেলা-চাবি চাপিয়া ধরিলে তড়িৎ-কোষ হইতে তড়িৎ-প্রবাহ স্ক্রু K, আর্মেচার A এবং স্প্রীং S বাহিয়া তড়িৎ-চুম্বকে

প্রবেশ করিবে এবং পুনরায় তড়িৎ-কোষে ফিরিয়া আসিবে। ফলে তড়িৎ চুম্বক চুম্বকীয় আকর্ষণ গুণ পাইবে এবং কাঁচা লোহার তৈয়ারী আর্মেচার A-কে নিজের দিকে আকর্ষণ করিবে। ফলে হাতুড়ি ঘণ্টার (G-এর) উপর আঘাত করিয়া শব্দ সৃষ্টি করিবে। কিন্তু যেই A-আর্মেচার টান খাইয়া তড়িৎ-চুম্বকের দিকে সরিয়া যাইবে সঙ্গে সঙ্গে স্ক্রু-র সহিত ইহার সংযোগ বিচ্ছিন্ন হইবে। ফলে বর্তনী ছিন্ন হইয়া তড়িৎপ্রবাহ বন্ধ হইবে। ইহার দরুন তড়িৎ-চুম্বকের আকর্ষণী শক্তি অন্তর্হিত হইবে এবং স্প্রীং S পুনরায় A-আর্মেচারকে ঠেলিয়া স্ক্রু K-র সহিত সংযোগ ঘটাইবে।

এইভাবে যতক্ষণ চাবিটি টিপিয়া রাখা হইবে ততক্ষণ পর্যায়ক্রমে বর্তনী একবার ছিন্ন হইবে এবং পুনরায় সংযুক্ত হইবে। ইহার ফলে হাতুড়ি বারবার ঘণ্টাকে আঘাত করিবে এবং ক্রিং ক্রিং শব্দ করিবে।

2-10. তড়িৎ প্রবাহের উপর চুম্বকের ক্রিয়া
(Action of magnet on current)

আমরা Oersted-এর পরীক্ষা হইতে জানিয়াছি যে, তড়িৎপ্রবাহযুক্ত কোন তার উহার চতুর্দিকে একটি চৌম্বকক্ষেত্র সৃষ্টি করে। ঐ চৌম্বকক্ষেত্রের ভিতর কোন চুম্বক মেরু থাকিলে তাহার উপর একটি আকর্ষণ বা বিকর্ষণজনিত বল ক্রিয়া করিবে এবং উহা বিক্ষিপ্ত হইবে। আমরা জানি যে, প্রত্যেক ক্রিয়ারই একটি সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া (reaction) থাকে। একটি চলন্ত বল যদি অপর একটি বলকে ধাক্কা দেয় তবে দ্বিতীয় বলটি চলিতে শুরু করে, কিন্তু বিপরীত প্রতিক্রিয়ার ফলে প্রথমটির গতিবেগ কমিয়া যায়। এই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার নিয়মানুযায়ী উক্ত চুম্বক মেরুও তারের উপর একটি বল প্রয়োগ করিবে যাহার ফলে তারটি মেরুর প্রতি আকৃষ্ট বা বিকৃষ্ট হইবে। ইহাই তড়িৎপ্রবাহের উপর চুম্বকের ক্রিয়া।

ধরা যাউক, AB একটি ঋজু (straight) পরিবাহী যাহার ভিতর দিয়া নিম্নাভিমুখী তড়িৎপ্রবাহ চলিতেছে। ইহার ফলে যে চৌম্বক বলরেখার (lines of force) সৃষ্টি হইবে তাহা দিকনির্দেশ ছবিতে তীর-চিহ্নযুক্ত
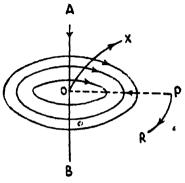
বৃত্তাকার রেখাদ্বারা দেখানো হইল। সুতরাং P বিন্দুতে রক্ষিত একটি N-মেরু PR অভিমুখে চালিত হইবে। যেহেতু প্রতিক্রিয়া ক্রিয়ার বিপরীত সুতরাং N-মেরু যদি P বিন্দুতে স্থির থাকে এবং AB তারটি সঞ্চরণশীল (movable) হয় তবে উক্ত তারটি OX-এর দিকে বিক্ষিপ্ত হইবে। যদি তড়িৎপ্রবাহের অভিমুখ উল্টাইয়া দেওয়া যায় তবে তারটিও বিপরীত দিকে বিক্ষিপ্ত হইবে। সুতরাং ইহা হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে, কোন

P-বিন্দুতে রক্ষিত N-মেরু PR অভিমুখে বল অনুভব করে, প্রতিক্রিয়া স্বরূপ AB তার OX অভিমুখে বল অনুভব করিবে

স্থির চুম্বকের চৌম্বকক্ষেত্রে যদি তড়িৎবাহী কোন তার বা পরিবাহী রাখা যায় তবে উহা একটি বল অনুভব করিবে।

তারের গতির অভিমুখ নির্ণয়ঃ ফ্লেমিং-এর বাম হস্ত নিয়ম (Fleming's left-hand rule): তড়িৎপ্রবাহের দিক ও চৌম্বকক্ষেত্রের দিক অনুযায়ী পরিবাহী তার কোন দিকে বিক্ষিপ্ত হইবে তাহা ফ্লেমিং-এর বাম-হস্ত নিয়ম হইতে বোঝা যায়। নিয়মটি নিম্নরূপ:

বাম-হস্তের তিনটি আঙ্গুল পরস্পরের সহিত সমকোণে রাখিয়া প্রসারিত কর। যদি তর্জনী (fore finger) চৌম্বকক্ষেত্রের দিক নির্দেশ করে এবং মধ্যমা (middle finger) তড়িৎপ্রবাহের দিক নির্দেশ করে তবে বৃদ্ধাঙ্গুলী তারের গতির অভিমুখ নির্দেশ করিবে।

ফ্লেমিং এর বাম হস্ত নিয়ম

2-11. তড়িৎপ্রবাহের উপর চুম্বকের ক্রিয়া প্রদর্শনের পরীক্ষা

(1) **ফ্যারাডের পরীক্ষা:** C একটি কাচের চোঙ্। ইহার দুই মুখ কর্ক দ্বারা বন্ধ। AB একটি তামার তার। তারটির উপর প্রান্ত (A) একটি হুকের সঙ্গে আট্‌কানো এবং নিম্নপ্রান্ত (B) খানিকটা পারদের ভিতরে ডুবানো। NS একটি চুম্বক। ইহার N-মেরু ঊর্ধ্বমুখী এবং পারদের মধ্য দিয়া চোঙের ভিতর ঢুকানো। দুইটি বন্ধনীর (D ও E) সাহায্যে তড়িৎকোষ হইতে AB তারের ভিতর দিয়া তড়িৎপ্রবাহ পাঠাইবার ব্যবস্থা আছে। তড়িৎ-প্রবাহ কোষ হইতে D বন্ধনীতে আসিয়া AB তারের মধ্য দিয়া পারদ হইয়া E বন্ধনীতে পৌঁছায় এবং পুনরায় কোষে ফিরিয়া যায়। যখন AB তার দিয়া কোন তড়িৎপ্রবাহ হয় না, তখন তারটি স্থির হইয়া থাকিবে। কিন্তু তার দিয়া যেই তড়িৎপ্রবাহ পাঠানো হইবে তখন দেখা যাইবে যে তারটি N-মেরুর চতুর্দিকে বৃত্তাকারে ঘুরিতেছে। এস্থলে N-মেরু কর্তৃক সৃষ্ট চৌম্বকক্ষেত্র সর্বদা তারের সহিত অভিলম্ব হওয়ায় তড়িৎবাহী তারটি যে-বল অনুভব করে তাহা সর্বদা তারটিকে বৃত্তাকার পথে চালিত করে। তারটির গতির অভিমুখ ফ্লেমিং-এর বাম-হস্ত নিয়ম হইতে নির্ণয় করা যায়।
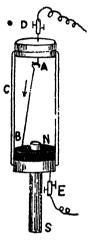
ফ্যারাডের সূত্র

(2) **বার্লো চক্র** (Barlow's wheel): ইহা কয়েকটি দাঁতবিশিষ্ট তারকাকৃতি পাতলা তামার চক্র। একটি অনুভূমিক অক্ষের চতুর্দিকে চক্রটি ঘুরিতে পারে। যন্ত্রটির কাঠের পাটাতনের উপর একটি লম্বা সরু গর্তের ভিতর কিছু পারদ রাখা থাকে। চক্রটি ঘুরিবার সময় পর্যায়ক্রমে এক একটি দাঁত এই পারদ স্পর্শ করে। এই গর্তটি শক্তিশালী অশ্বখুরাকৃতি চুম্বকের মেরুদ্বয়ের মধ্যে অবস্থিত। দুইটি বন্ধনীর সাহায্যে তড়িৎ-প্রবাহ চক্র ও পারদের ভিতর দিয়া তড়িৎ-কোষে ফিরিয়া যাইতে পারে।
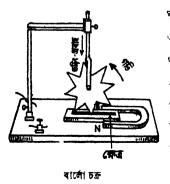
বার্লো চক্র

যদি চক্র দিয়া তড়িৎ-প্রবাহ উপর হইতে নীচু দিকে যায় তবে চিত্রে প্রদর্শিত তীর-চিহ্নের দিকে চক্রটি ঘুরিতে সুরু করিবে। এই দিকনির্ণয় ফ্লেমিং-এর বামহস্ত নিয়ম হইতে করা যায়। একটি দাঁত যেই পারদ হইতে উঠিয়া আসিবে গতির জন্য পরবর্তী দাঁত আসিয়া পারদ স্পর্শ করিবে এবং তড়িৎপ্রবাহ বজায় রাখিবে। যতক্ষণ পর্যন্ত তড়িৎপ্রবাহ চলিবে ততক্ষণ পর্যন্ত চক্রটি প্রবলবেগে ঘুরিতে থাকিবে। যদি চক্র দিয়া তড়িৎপ্রবাহের অভিমুখ উল্টা হয় তবে চক্রটি উল্টাদিকে ঘুরিবে।

2-12. তড়িৎ-চুম্বকীয় আবেশ

[Electro-magnetic Induction]

1820 খ্রীষ্টাব্দে যখন Oersted আবিষ্কার করেন যে তড়িৎ-প্রবাহ চৌম্বক-ক্ষেত্র সৃষ্টি করিতে পারে তখন বিজ্ঞানীদের মনে কৌতূহল হইল যে, চৌম্বক-ক্ষেত্র তড়িৎ-প্রবাহ সৃষ্টি করিতে পারে কি-না? বিজ্ঞানীদের এই কৌতূহলের নিরসন করেন বিখ্যাত আবিষ্কারক মাইকেল ফ্যারাডে।

1831 খ্রীষ্টাব্দে **মাইকেল ফ্যারাডে** তড়িৎ চুম্বকীয় আবেশ আবিষ্কার করেন। তিনি দেখিতে পান যে **একটি চুম্বক বা তড়িৎবাহী বর্তনীর সাহায্যে অন্য একটি সংহত বর্তনীতে** (closed circuit) **ক্ষণস্থায়ী তড়িচ্চালক বল** (electromotive force) **সৃষ্টি করা যায়।** এই ক্ষণস্থায়ী তড়িচ্চালক বলকে আবিষ্ট (induced) তড়িচ্চালক বল এবং এই ঘটনাকে **তড়িৎ চুম্বকীয় আবেশ** বলা হয়। ফ্যারাডের এই আবিষ্কার তড়িৎ-বিজ্ঞানের সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন আনিয়াছে, কারণ এই আবিষ্কারের ফলে Generator, Transformers এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় তড়িৎ-যন্ত্রের উদ্ভব হইয়াছে।

মাইকেল ফ্যারাডে (1791—1867)

ফ্যারাডের এই আবিষ্কার কত গুরুত্বপূর্ণ তাহা একটি ঘটনা হইতে জানিতে পারিবে। 1931 খ্রীষ্টাব্দে—অর্থাৎ তড়িৎ-চুম্বকীয় আবেশ আবিষ্কারের শত-বার্ষিকী দিনে—ফ্যারাডের সম্মানে লণ্ডনে একটি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে পৃথিবীর সকল দেশ হইতে বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ও ইলেক্‌ট্রিক্যাল এঞ্জিনীয়ারগণ যোগ দিয়াছিলেন। এই সঙ্গে লণ্ডনের অ্যালবার্ট হলে ফ্যারাডে যে-সব আবিষ্কার করিয়াছিলেন তাহা হইতে যে সমস্ত বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি তৈয়ারী হইয়াছে তাহার একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হইয়াছিল। এই প্রদর্শনীতে ফ্যারাডে একশত বৎসর পূর্বে যে পুরাতন এক টুকরা তার জড়ানো লোহা ও অন্যান্য স্থূল যন্ত্রপাতি দ্বারা তড়িৎ-চুম্বকীয় আবেশ আবিষ্কার করেন তাহা অত্যন্ত সম্মানজনক স্থান লাভ করিয়াছিল।

2-13 তড়িৎ-চুম্বকীয় আবেশ সম্পর্কিত পরীক্ষা

(ক) **চুম্বক কর্তৃক আবিষ্ট প্রবাহ** (Current induced by a magnet):

কয়েক ইঞ্চি লম্বা ও প্রায় এক ইঞ্চি ব্যাসযুক্ত একটি কার্ডবোর্ডের চোঙের উপর 150 কি 200 পাক (turn) তামার তার চড়াও। চোঙটিকে খাড়াভাবে রাখিয়া তারটির দুই প্রান্ত একটি সুবেদী (sensitive) গ্যালভানোমিটার যন্ত্রের
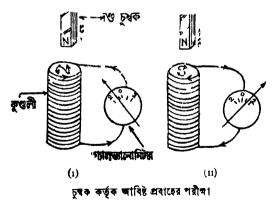
চুম্বক কর্তৃক আবিষ্ট প্রবাহের পরীক্ষা

সহিত যুক্ত কর। এই যন্ত্রটির দ্বারা কোন বর্তনীতে তড়িৎপ্রবাহের অস্তিত্ব বোঝা যায়, কারণ বর্তনীতে তড়িৎপ্রবাহ হইলে গ্যালভানোমিটারে কাঁটার বিক্ষেপ হয়।

এইবার একটি দণ্ড-চুম্বক লইয়া উহার N-মেরু নিম্নাভিমুখী করিয়া তাড়াতাড়ি চোঙের ভিতরে ঢুকাও। দেখিবে যে গ্যালভানোমিটারের কাঁটার ক্ষণিক বিক্ষেপ (sudden deflection) হইল [(i) নং চিত্র]। চুম্বককে এইবার তাড়াতাড়ি চোঙ হইতে বাহির করিয়া লও। দেখিবে আবার কাঁটার ক্ষণিক বিক্ষেপ হইল—কিন্তু উল্টা দিকে [(ii) নং চিত্র]। ইহাও লক্ষ্য করিবে যে যতক্ষণ চুম্বকটি চোঙের ভিতর স্থির থাকে ততক্ষণ কাঁটার কোন বিক্ষেপ হয় না। চুম্বকটি গতিশীল হইলেই কাঁটার বিক্ষেপ হয়।

ইহা হইতে আমরা সিদ্ধান্ত করিতে পারি যে চুম্বকের এই প্রকার গতির দ্বারা কোন সংহত বর্তনীতে তড়িৎপ্রবাহ আবিষ্ট করা যায়। গতি না থাকিলে তড়িৎ-প্রবাহ আবিষ্ট হয় না। ইহার অর্থ এই যে কুণ্ডলী যে চৌম্বকক্ষেত্রে অবস্থিত (অর্থাৎ এখানে দণ্ড-চুম্বক কর্তৃক সৃষ্ট চৌম্বকক্ষেত্র) সেই চৌম্বকক্ষেত্রের কোন পরিবর্তন হইলেই কুণ্ডলীতে তড়িৎপ্রবাহ আবিষ্ট হইবে। অথবা, যে চৌম্বক বলরেখাগুলি কুণ্ডলীকে ছেদ করে তাহার কোন পরিবর্তন হইলেই কুণ্ডলীতে তড়িৎ-প্রবাহ আবিষ্ট হইবে।

আমরা দেখিয়াছি যে সলিনয়েড্ কুণ্ডলীতে তড়িৎপ্রবাহ হইলে সলিনয়েড্‌টি চুম্বকের ন্যায় ব্যবহার করে এবং উহার দুই মুখে মেরুর উদ্ভব হয়। উপরোক্ত পরীক্ষায় দণ্ড-চুম্বকটি কুণ্ডলীতে ঢুকাইবার এবং বাহির করিবার সময় কুণ্ডলীতে যে দিকে তড়িৎপ্রবাহ হয় তাহা লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে কুণ্ডলীর উপরের মুখে পূর্ব পৃষ্ঠার (i) এবং (ii) নং চিত্রে যেমন দেখানো হইয়াছে ঐরূপ মেরুর উদ্ভব হয়। অর্থাৎ, দণ্ড চুম্বকের N-মেরু ঢুকাইবার সময় তড়িৎপ্রবাহের দরুন কুণ্ডলীর উপরের মুখে N-মেরুর উদ্ভব হইবে এবং বাহির করিয়া লইবার সময় S-মেরুর উদ্ভব হইবে। যদি দণ্ডচুম্বকের N-মেরু না ঢুকাইয়া S-মেরু ঢুকানো হয় তবে ঢুকাইবার সময় কুণ্ডলীর মুখে S-মেরু এবং বাহির করিয়া লইবার সময় N-মেরুর উদ্ভব হয়।

এই ব্যাপারকে বিজ্ঞানী লেঞ্জ একটি সূত্রের আকারে উপস্থাপিত করিয়াছেন এবং তাঁহার নামানুসারে ইহাকে **লেঞ্জের সূত্র** বলে। সূত্রটি নিম্নরূপ :

যে কোন তড়িৎ-চুম্বকীয় আবেশের বেলায় আবিষ্ট তড়িৎ-প্রবাহের অভিমুখ এমন হইবে যে, যে-কারণে প্রবাহের সৃষ্টি হয় প্রবাহ সর্বদা সেই কারণকে বাধা দিবে।

এই সূত্র হইতে একটি বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে যে দণ্ড-চুম্বকের গতি বজায় রাখিবার জন্য সর্বদা যান্ত্রিক-শক্তি ব্যয় করিতে হয়, কারণ দণ্ড-চুম্বক ঢুকাইবার সময় দুই সম-মেরুর ভিতর বিকর্ষণজনিত বলের বিরুদ্ধে ঢুকাইতে হইবে এবং বাহির করিবার সময় দুই বিষম-মেরুর ভিতর আকর্ষণজনিত বলের বিরুদ্ধে দণ্ড-চুম্বককে সরাইয়া আনিতে হইবে। এই যান্ত্রিক শক্তিই তড়িৎ-শক্তিতে রূপান্তরিত হইয়া কুণ্ডলীতে তড়িৎপ্রবাহের সৃষ্টি করে।

যদি বেশী সংখ্যার পাকের কুণ্ডলী লইয়া অথবা আরো শক্তিশালী দণ্ড চুম্বক লইয়া কিংবা দণ্ড-চুম্বকটি আরো দ্রুত গতিতে নাড়াইয়া উপরোক্ত পরীক্ষাগুলি করা যায় তবে দেখা যাইবে প্রত্যেক ক্ষেত্রেই আবিষ্ট তড়িৎ প্রবাহের মাত্রা বৃদ্ধি পাইবে। আমরা যে কোন চৌম্বক ক্ষেত্রকে কতকগুলি চৌম্বক-বলরেখা (lines of force) দ্বারা প্রকাশ করিতে পারি। সুতরাং দণ্ড-চুম্বক কুণ্ডলীর নিকটে অগ্রসর হওয়ার অর্থ বেশী সংখ্যক বলরেখা কুণ্ডলীকে অতিক্রম করা এবং দণ্ড চুম্বকে সরাইয়া লওয়ার অর্থ কম সংখ্যক বলরেখা কুণ্ডলীকে অতিক্রম করা। ইহা হইতে বোঝা যায় যে বলরেখা কুণ্ডলীকে অতিক্রম করিবার পরিবর্তনের উপর আবিষ্ট ফল (inductive effect) নির্ভর করে। ফ্যারাডে প্রমাণ করিয়াছেন যে, **যে-হারে কুণ্ডলীর ভিতর দিয়া অতিক্রান্ত বলরেখা পরিবর্তন করে আবিষ্ট তড়িচ্চালক বল তাহার সমানুপাতিক।** ইহাকে **ফ্যারাডের সূত্র** বলে।

(খ) **প্রবাহ কর্তৃক আবিষ্ট প্রবাহ** (Current induced by current) :

আমরা জানি যে কোন কুণ্ডলী দিয়া তড়িৎপ্রবাহ গেলে কুণ্ডলী একটি চৌম্বক ক্ষেত্র সৃষ্টি করে। সুতরাং কোন কুণ্ডলীতে তড়িৎপ্রবাহের পরিবর্তন হইলে উহার চৌম্বক বলরেখার পরিবর্তন হইবে এবং পরিবর্তন অন্য একটি নিকটবর্তী কুণ্ডলীতে আরোপিত হইলে ফ্যারাডের নিয়মানুযায়ী দ্বিতীয় কুণ্ডলীতে একটি তড়িচ্চালক বল আবিষ্ট হইবে।

এই ঘটনা পর পৃষ্ঠার চিত্রে প্রদর্শিত ব্যবস্থা দ্বারা দেখানো যাইতে পারে।

P একটি সলিনয়েড। ইহার সহিত একটি ব্যাটারী B এবং একটি রিওস্ট্যাট R ও একটি টেপা চাবি K যুক্ত আছে। (ছবি দেখ)।

S আর একটি সলিনয়েড—আকারে P হইতে বড় এবং উহাতে অনেকগুলি তারের পাক আছে। ইহার সহিত একটি সুবেদী গ্যালভানোমিটার-G যুক্ত আছে। P-সলিনয়েডকে বলা হয় মুখ্য-কুণ্ডলী এবং S-সলিনয়েডকে বলা হয় গৌণ-কুণ্ডলী। প্রথমে S-গৌণ-কুণ্ডলীর বর্তনীতে একটি রিওস্ট্যাট ও কোষ যুক্ত করিয়া কুণ্ডলীতে প্রবাহের অভিমুখ নির্ণয় করিতে হইবে। মনে কর, প্রবাহ বামাবর্তে (anti-clockwise) চলিতেছে। এখন
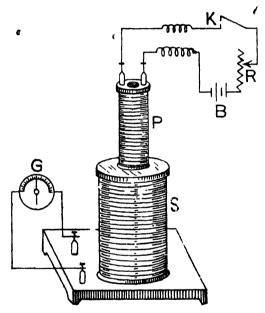
প্রবাহ কর্তৃক আবিষ্ট প্রবাহের ব্যবস্থা

গ্যালভানোমিটারে কাঁটার বিক্ষেপের অভিমুখ লক্ষ্য কর। নিম্নের পরীক্ষাতে এই অভিমুখে কাটা বিক্ষিপ্ত হইতে S-কুণ্ডলীতে প্রবাহ সমমুখী (direct) এবং বিপরীত দিকে বিক্ষিপ্ত হইলে বিপরীতমুখী (inverse) ধরা হইবে। এখন S-কুণ্ডলীর বর্তনী হইতে কোষ ও রিওস্টাট খুলিয়া লও।

(1) মুখ্য-কুণ্ডলী P-তে তড়িৎ-কোষের সাহায্যে বামাবর্তী তড়িৎ-প্রবাহ চালাইয়া দ্রুত উহাকে S-কুণ্ডলীর ভিতর প্রবেশ করাও। দেখিবে যে গ্যালভানোমিটারে ক্ষণিক বিক্ষেপ সৃষ্টি হইল। বিক্ষেপের অভিমুখ লক্ষ্য কর। এই অভিমুখ হইতে বোঝা যায় যে গৌণ-কুণ্ডলী S-এ বিপরীতমুখী ক্ষণিক

তড়িৎপ্রবাহ আবিষ্ট হইল। এখন মুখ্য-কুণ্ডলীকে দ্রুত গৌণ-কুণ্ডলীর ভিতর হইতে বাহির করিয়া আনিলে ক্ষণস্থায়ী বিপরীত বিক্ষেপ দেখা যাইবে অর্থাৎ এইবার ক্ষণস্থায়ী সমমুখী প্রবাহ আবিষ্ট হইল।

(ii) মুখ্য-কুণ্ডলীর চাবি-K ছাড়িয়া দিয়া—অর্থাৎ কুণ্ডলীতে কোন প্রবাহ হইতে না দিয়া—উহাকে গৌণ-কুণ্ডলীর মধ্যে বসাও। এইবার চাবি টিপিয়া মুখ্য-কুণ্ডলীতে প্রবাহ চালাও। গ্যালভানোমিটারের বিক্ষেপ হইবে এবং দেখিবে যে গৌণ-কুণ্ডলীতে ক্ষণস্থায়ী বিপরীতমুখী তড়িৎপ্রবাহ আবিষ্ট হইল। যদি রিওস্ট্যাট পরিবর্তন করিয়া মুখ্য-কুণ্ডলীতে প্রবাহের মাত্রা বাড়ানো যায় তবে গৌণ-কুণ্ডলীতে একই ধরনের প্রবাহ আবিষ্ট হইবে। এইবার মুখ্য-কুণ্ডলীর চাবি-K ছাড়িয়া দিয়া প্রবাহ বন্ধ কর। সঙ্গে সঙ্গে গৌণ-কুণ্ডলীতে আবার ক্ষণস্থায়ী তড়িৎপ্রবাহ যাইবে—কিন্তু এই প্রবাহ সমমুখী হইবে। যদি মুখ্যকুণ্ডলীর প্রবাহ-মাত্রা রিওস্ট্যাটের সাহায্যে কমানো যায় তবে একই ব্যাপার দেখা যাইবে।

2-14. তড়িৎ-চুম্বকীয় আবেশের সূত্র
(Laws of electromagnetic induction)

ফ্যারাডে এবং লেঞ্জের সূত্রকে তড়িৎ-চুম্বকীয় আবেশের সূত্র বলা হয়। ফ্যারাডের সূত্রদ্বারা আবেশের কারণ ও আবিষ্ট তড়িচ্চালক বলের পরিমাণ এবং লেঞ্জের সূত্রদ্বারা আবিষ্ট তড়িচ্চালক বলের অভিমুখ পাওয়া যায়। এই সূত্রগুলিকে পুনরায় একস্থানে বলা হইল।

ফ্যারাডের সূত্র :

(i) কোন কুণ্ডলী বা সংহত বর্তনীর সহিত যুক্ত চৌম্বক বলরেখার যদি কোন পরিবর্তন হয় তবে ঐ কুণ্ডলী বা বর্তনীতে তড়িচ্চালক বল আবিষ্ট হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত পরিবর্তন সংঘটিত হয় ততক্ষণ পর্যন্ত ঐ বল কার্য করে।

(ii) যে হারে কুণ্ডলীর ভিতর দিয়া অতিক্রান্ত বলরেখা পরিবর্তন করে আবিষ্ট তড়িচ্চালক বল উহার সমানুপাতিক।

লেঞ্জের সূত্র :

যে কোন তড়িৎ-চুম্বকীয় আবেশে আবিষ্ট তড়িৎপ্রবাহের অভিমুখ এমন হইবে যে, যে-কারণে প্রবাহের সৃষ্টি হয়, প্রবাহ সর্বদা সেই কারণকে বাধা দিবে।

অনুশীলনী

1. একটি ছোট চুম্বক-শলাকা একটি খাড়া স্তম্ভের উপর রাখা আছে। একটি তড়িৎবাহী তার যদি শলাকা বরাবর রাখা যায় তবে শলাকা কোন্ অবস্থানে থাকিবে?

নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে শলাকার অবস্থানের কি পরিবর্তন দেখা যাইবে:

(i) তারটি শলাকার উপরে, (ii) তারটি শলাকার নীচে, (iii) তড়িৎ-প্রবাহের অভিমুখ উল্টা করা হইলে।

2. চুম্বকের উপর তড়িৎ-প্রবাহের ক্রিয়া পরীক্ষামূলকভাবে কিরূপে প্রমাণ করিবে? চুম্বক বিক্ষেপের নিয়মগুলি ব্যাখ্যা কর।

3. তড়িৎ-চুম্বক কাহাকে বলে? তড়িৎ-চুম্বক বর্ণনা কর। প্রাকৃতিক চুম্বক বা কৃত্রিম চুম্বকের সহিত তড়িৎ-চুম্বকের পার্থক্য কি?

4. বৈদ্যুতিক ঘণ্টার বিবরণ ও কার্যপ্রণালী ব্যাখ্যা কর।

5. তড়িৎ প্রবাহের উপর চুম্বকের ক্রিয়া সংক্রান্ত কয়েকটি পরীক্ষা বর্ণনা কর।

6. ফ্লেমিং-এর বামহস্ত নিয়ম কি? এই নিয়ম কি সংক্রান্তে ব্যবহৃত হয়?

7. আবিষ্ট তড়িৎপ্রবাহ কাহাকে বলে? একটি চুম্বক ও একটি তড়িৎবাহী বর্তনী দ্বারা আবিষ্ট তড়িৎ-প্রবাহ উৎপন্ন করিবার পরীক্ষা বর্ণনা কর।

8. সংক্ষেপে তড়িৎ-চুম্বকীয় আবেশ সম্পর্কিত পরীক্ষাগুলির বিবরণ দাও।

9. তড়িৎ-চুম্বকীয় আবেশ সংক্রান্ত সূত্রগুলি কি কি? উপযুক্ত পরীক্ষা দ্বারা উহাদের ব্যাখ্যা কর।

10. তোমাকে একটি কুণ্ডলী, একটি চুম্বক ও একটি গ্যালভানোমিটার দেওয়া হইল। উহাদ্বারা কিরূপে তড়িৎ-চুম্বকীয় আবেশ সংক্রান্ত ঘটনাগুলি পরীক্ষামূলকভাবে দেখাইবে তাহার বিবরণ দাও।

Objective Test প্রশ্ন

(ক) Alternate response type :—

(i) *Yes or No type :—*

(a) তড়িৎ-প্রবাহ চৌম্বকক্ষেত্র সৃষ্টি করিতে সক্ষম কি? Y

(b) তড়িৎ-চুম্বকীয় আবেশে তড়িৎ সৃষ্টি হয় কি?

(c) তড়িৎ-চুম্বক কি তড়িৎ-চুম্বকীয় আবেশের উদাহরণ?

(d) চুম্বক কি তড়িৎ-প্রবাহের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে সক্ষম?

(ii) *True or False type :—*

(a) তড়িৎ-চুম্বকীয় আবেশে যে তড়িৎ-শক্তি উৎপন্ন হয় তাহার জন্য অন্য কোন প্রকার শক্তির ব্যয় নিষ্প্রয়োজন।

(b) তড়িৎ-প্রবাহের ফলে যে চৌম্বকক্ষেত্র সৃষ্টি হয় উহার অভিমুখ তড়িৎ-প্রবাহের অভিমুখের উপর নির্ভরশীল। —

(c) বার্লোচক্র তড়িৎ-প্রবাহের উপর চুম্বকের ক্রিয়ার উদাহরণ। —

(d) সলিনয়েডে যখন তড়িৎ-প্রবাহ ঘটে তখন উহা চুম্বকের ন্যায় আচরণ করে। —

(খ) **Recall type :—**

(i) তড়িৎ-প্রবাহের দ্বারা কোন বস্তুকে চুম্বকে পরিণত করিলে উহাকে—বলে। —

(ii) চৌম্বকক্ষেত্রে কোন তড়িৎবাহী পরিবাহী থাকিলে ঐ পরিবাহী এক—অনুভব করে। —

(iii) চুম্বকের সাহায্যে সংহত বর্তনীতে ক্ষণস্থায়ী তড়িচ্চালক বল—করাকে তড়িৎ-চুম্বকীয় আবেশ বলা হয়। —

(iv) তড়িৎ-চুম্বকীয় আবেশে আবিষ্ট তড়িচ্চালক বল যে-হারে—পরিবর্তন করে উহার সমানুপাতিক। —

(গ) **Completion type :—**

যে-কোনো তড়িৎ-চুম্বকীয়—(a) আবিষ্ট—(b) প্রবাহের—(c) এমন হইবে যে, যে-কারণে প্রবাহের সৃষ্টি হয়,—(d) সর্বদা সেই কারণকে—(e) দিবে।

—(a)
—(b)
—(c)
—(d)
—(e)

(ঘ) **Multiple choice type :—**

(i) চুম্বকের উপর তড়িৎ-প্রবাহের ক্রিয়া কাহার আবিষ্কার ?

উ। ফ্যারাডে, Oersted অ্যাম্পীয়ার।

(ii) তড়িৎ-প্রবাহের উপর চুম্বকের ক্রিয়া প্রদর্শনের পরীক্ষা কি ?

উ। ফ্যারাডের পরীক্ষা, Oersted-এর পরীক্ষা, বার্লো চক্র।

(iii) তড়িৎ-চুম্বকীয় আবেশ কাহার আবিষ্কার ?

উ। ম্যাক্সওয়েল, ফ্যারাডে, লেঞ্জ।

2-15. তড়িৎপ্রবাহের উৎস
[Sources of electric current]

স্থায়ী তড়িৎপ্রবাহ সৃষ্টি করিতে হইলে সাধারণত দুইটি উপায়ে উহা করা যাইতে পারে। (1) তড়িৎকোষের সাহায্যে ও (2) ডায়নামো বা তড়িতোৎপাদক যন্ত্রের সাহায্যে।

প্রথমোক্ত উপায়ে খুব ছোটখাটো কাজের জন্য তড়িৎপ্রবাহ সৃষ্টি করা সুবিধাজনক। সেইজন্য পরীক্ষাগারে বা গবেষণাগারে নানারকম কাজের জন্য তড়িৎকোষের বহুল ব্যবহার আছে। কিন্তু আলো জ্বালানো, পাখা চালানো, ফ্যাক্টরী বা কলকারখানার জন্য বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রভৃতি বড় বড় কাজের জন্য ডায়নামো খুব সুবিধাজনক। নিম্নে তড়িৎপ্রবাহ উৎপাদন করিবার পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা করা হইবে।

(1) **তড়িৎকোষ :**

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, যে-ব্যবস্থার দ্বারা রাসায়নিক শক্তির পরিবর্তে তড়িৎ শক্তির উৎপত্তি হয় এবং তাহা হইতে কোন বর্তনীতে স্থায়ী তড়িৎপ্রবাহ উৎপন্ন করা যায় তাহাকে তড়িৎকোষ বলে। সরল ভোল্টীয় কোষ সম্বন্ধে পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে। এইবার অন্যান্য কয়েকটি প্রয়োজনীয় তড়িৎ-কোষ সম্বন্ধে আলোচনা করা হইল।

(ক) **লেক্ল্যান্স কোষ** (Leclanche cell)

চিত্রে লেক্ল্যান্স কোষের আকৃতি দেখানো হইল। একটি কাচ পাত্রে জলে দ্রবীভূত নিশাদল বা অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড (NH_4Cl) রাখা হয় এবং তাহার ভিতর পারদের প্রলেপযুক্ত একটি দস্তার দণ্ড (Z) আংশিক ডুবানো থাকে। কাচপাত্রের মাঝখানে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড দ্রবণের (solution) ভিতর আর একটি সচ্ছিদ্র পাত্র রাখা আছে। ঐ পাত্র ম্যাংগানিজ ডাই-অক্সাইড (MnO_2) ও কাঠকয়লার গুঁড়া দিয়া ভরতি এবং ইহার ভিতর একটি কার্বন দণ্ড (C) ঢুকানো। এই
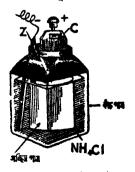
লেক্ল্যান্স কোষ

কোষে দস্তার দণ্ড নিম্নবিভব অর্থাৎ ঋণাত্মক মেরু (pole) ও কার্বনদণ্ড

উচ্চবিভব অর্থাৎ ধনাত্মক মেরু গঠন করে এবং দস্তা ও অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইডের ভিতর রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে তড়িৎপ্রবাহের উৎপত্তি হয়। দস্তা ও কার্বনদণ্ড একটি তার দ্বারা যুক্ত করিলে তার দিয়া ঐ প্রবাহ চলিবে। যেখানে বিরতিযুক্ত (intermittent) তড়িৎপ্রবাহ দরকার—যেমন বৈদ্যুতিক ঘণ্টা, টেলিফোন, টেলিগ্রাফ, ইত্যাদি—সেইখানে এই কোষ খুব সুবিধাজনক। একটানা অনেকক্ষণ তড়িৎপ্রবাহ প্রয়োজন হইলে লেকল্যান্স কোষ কখনও ব্যবহৃত হয় না, কারণ একটানা তড়িৎপ্রবাহ লইলে দেখা যায় যে আস্তে আস্তে প্রবাহের মাত্রা কমিয়া আসিতেছে।

(খ) নির্জল কোষ (Dry cell) :

ইহা লেকল্যান্স কোষেরই মত, শুধু লেকল্যান্স কোষের তরলের পরিবর্তে এখানে একটি লেই (paste) ব্যবহার করা হয়। এই কারণে ইহাকে নির্জল কোষ বলা হয়—যদিও প্রকৃতপক্ষে ইহা নির্জল নয়। এই কোষ টর্চ লাইট, সাইকেলের আলো, বেতার প্রভৃতি যন্ত্রে তড়িৎপ্রবাহ পাঠাইবার জন্য বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়।

নির্জল কোষ

চিত্রে একটি নির্জল কোষের নকশা দেখানো হইল। এই কোষে একটি দস্তার চোঙকে ধারকপাত্র ও কোষের ঋণাত্মক মেরুহিসাবে ব্যবহার করা হয়। এই পাত্রের মাঝখানে একটি কার্বন দণ্ড আছে। এই কার্বন দণ্ড কোষের ধনাত্মক মেরু। কার্বন দণ্ড ও দস্তার চোঙের ভিতরকার জায়গা একটি লেই দ্বারা পূর্ণ। এই লেই তৈয়ারী করা হয় NH_4Cl দ্রবণ, MnO_2, কার্বন অথবা গ্রাফাইট্ এবং কিছু জল দ্বারা। একটুকরা কাপড় অথবা ব্লটিং কাগজ দ্বারা দস্তার চোঙ্ ও লেইকে পৃথক্ করিয়া রাখা হয়। ব্লটিং কাগজ বা কাপড়ের ছিদ্র দিয়া NH_4Cl দস্তার সহিত রাসায়নিক ক্রিয়া করে। ব্লটিং কাগজ বা কাপড়ের বাহিরের চতুষ্পার্শ্বে করাতের গুড়া, NH_4Cl ও সামান্য $ZnCl_2$ থাকে। কোষের উপরিভাগ
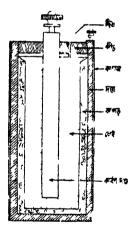
বালি, পিচ প্রভৃতি দ্বারা বন্ধ করা থাকে। গ্যাস বাহির হইবার জন্য পিচের মধ্যে একটি ছিদ্র রাখা হয়। অতঃপর সমস্ত জিনিসটাকে কাগজে মুড়িয়া বাজারে বিক্রীর জন্য দেওয়া হয়।

(গ) **ড্যানিয়েল কোষ** (Daniell cell) :

একটি তামার পাত্রে $CuSO_4$ (তুঁতের) টুক্‌রা জলে দ্রবীভূত করিয়া রাখা হয় এবং তামার পাত্রই কোষের ধনাত্মক মেরু হিসাবে ব্যবহৃত হয়। তামার পাত্রের উপরের দিকে তুইটি সচ্ছিদ্র তাকে (shelf) কিছু $CuSO_4$ টুক্‌রা রাখা থাকে। ছিদ্রের ভিতর দিয়া এই টুক্‌রাগুলি $CuSO_4$ দ্রবণের সহিত যুক্ত থাকায় $CuSO_4$ দ্রবণ সংপৃক্ত (saturated) থাকে। এই দ্রবণের ভিতর একটি সচ্ছিদ্র চিনামাটির পাত্রে লঘু সালফিউরিক অ্যাসিড রাখিয়া ঐ অ্যাসিডের ভিতর পারদের প্রলেপযুক্ত একটি দস্তার দণ্ড রাখা হয়। এই দস্তার দণ্ডটি কোষের ঋণাত্মক মেরু।
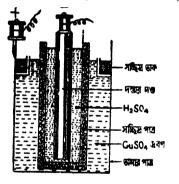
ড্যানিয়েল কোষ

এই কোষে দস্তার সহিত সালফিউরিক অ্যাসিডের ভিতর রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে তড়িৎপ্রবাহ উৎপন্ন হয়। কিছুক্ষণের জন্য অপরিবর্তিত (constant) তড়িৎপ্রবাহ পাইতে গেলে এই কোষ খুব সুবিধাজনক।

(ঘ) **সঞ্চয়ক** (Accumulator) বা **সঞ্চয়ক-কোষ** (Storage cell)

লেক্‌ল্যান্স বা ড্যানিয়েল কোষে রাসায়নিক পদার্থগুলির ভিতর যে রাসায়নিক ক্রিয়া হয় তাহাই তড়িৎপ্রবাহ উৎপন্ন করে। যখন এই রাসায়নিক পদার্থগুলির ক্রিয়া শেষ হইয়া যায় তখন ইহারা আর প্রবাহ উৎপন্ন করিতে পারে না। তখন ইহাদের ফেলিয়া দিয়া নতুন করিয়া কোষটি তৈরী করিতে হয়। এইজন্য এই কোষকে **প্রাথমিক** (primary) **কোষ** বলা হয়।

সঞ্চয়ক কোষের কার্যপ্রণালী একটু অন্যরকম। এই কোষে কতকগুলি রাসায়নিক পদার্থের ভিতর ক্রিয়া হইবার ফলে তড়িৎপ্রবাহ উৎপন্ন হয়

বটে, কিন্তু উক্ত রাসায়নিক পদার্থগুলিকে কার্যক্ষম করিবার জন্য বাহিরের কোন উৎস হইতে কোষের ভিতর তড়িৎপ্রবাহ পাঠানো হয়। ইহাকে কোষের আহিতকরণ (charging) বলে। এইরূপে কোষ সম্পূর্ণ আহিত হইবার পর তাহার ভিতর শক্তি সঞ্চিত হয় ও তাহার ফলে এই কোষ হইতে নানাবিধ কার্যের জন্য তড়িৎপ্রবাহ পাওয়া যায়। একই রাসায়নিক পদার্থকে বার বার ব্যবহার করা চলে। এই কারণে ইহাকে সঞ্চয়ক-কোষ বা সঞ্চয়ক বলে। জাহাজে, ট্রেনে, মোটরগাড়ীতে আলো জ্বালিবার জন্য, পরীক্ষাগারে নানাবিধ কার্যের জন্য, পেট্রল এঞ্জিনে সঞ্চয়ক-কোষের প্রচুর ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়।

কোষের বিবরণ :

1859 খ্রীষ্টাব্দে Planté এই কোষ উদ্ভাবন করেন। চিত্রে এই কোষের আকৃতি দেখানো হইল। ইহা একটি পুরু কাচের তৈয়ারী পাত্র। এই পাত্রে

সঞ্চয়ক কোষ সীসার জালি
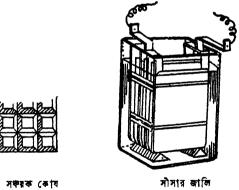
লঘু H_2SO_4 অ্যাসিড থাকে। এই অ্যাসিডের ভিতর কয়েকটি সীসার পাত সমান্তরালভাবে ডুবানো থাকে এবং পাতগুলি পর্যায়ক্রমে (alternately) দুইটি তড়িৎ-দ্বারের সহিত যুক্ত থাকে। পাতগুলি নিরেট (solid) না করিয়া ঝাঁঝরার মত জালি (grid) করা থাকে (পার্শ্বের চিত্র দ্রষ্টব্য)। ঝাঁঝরার ফাঁকগুলি লিথার্জ (PbO) কিংবা রেড্‌লেড্ (Pb_3O_4) দ্বারা ভরতি করা থাকে।

যখন এই কোষ সম্পূর্ণ আহিত হইয়া তড়িৎ-প্রবাহ সরবরাহ করিবার জন্য প্রস্তুত হয় তখন ইহার অভ্যন্তরস্থ সালফিউরিক অ্যাসিডের আপেক্ষিক ঘনত্ব 1·2 হয়। কোষটি যে সম্পূর্ণরূপে কার্যক্ষম হইল—ঐ আপেক্ষিক ঘনত্বই হইবে তাহা বুঝিবার একমাত্র উপায়। অতঃপর কোষ হইতে তড়িৎপ্রবাহ লইলে উহার ভিতরে যে-রাসায়নিক ক্রিয়া সংঘটিত হয় তাহার ফলে সালফিউরিক অ্যাসিড ক্রমশ লঘু হইতে সুরু করে এবং উহার তড়িচ্চালক বল পূর্ণ-মান 2 volts হইতে কমিয়া যায়। যখন অ্যাসিডের আপেক্ষিক ঘনত্ব কমিয়া 1·14-এ দাঁড়ায় এবং তড়িচ্চালক বল 1·7-1·8 volts হয় তখন বুঝিতে হইবে যে কোষটি তড়িৎপ্রবাহ দিতে আর সক্ষম নয়। তখন বলা হয় যে কোষটি সম্পূর্ণরূপে discharged হইয়াছে। ঐ অবস্থায় উহাকে পুনরায় আহিত করিয়া কার্যক্ষম করিতে হয়।

এই কোষটি ব্যবহার করিবার সময় একটি কথা সর্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে। কখনও তার দিয়া সরাসরি কোষের দুই মেরু যুক্ত করিবে না—অর্থাৎ short circuit করিবে না। তাহাতে কোষটি নষ্ট হইয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকে।

2-16. শক্তির উৎসরূপে তড়িৎ
(Electricity as Energy)

তড়িৎপ্রবাহের তাপীয় ফল দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবনে বা শিল্পকার্যে নানাভাবে প্রযুক্ত হয়। বাতি জ্বালানো, পাখা চালানো প্রভৃতি গৃহের দৈনন্দিন কার্যে, শিল্পপ্রতিষ্ঠানে নানাপ্রকার ভারী যন্ত্রপাতি চালানো প্রভৃতি কার্যে তড়িৎকে শক্তির-উৎস হিসাবে ব্যবহার করা হইয়া থাকে। শক্তির উৎসরূপে তড়িতের নানাপ্রকার ব্যবহারিক প্রয়োগ সম্বন্ধে নিম্নে আলোচনা করা হইল।

(1) বৈদ্যুতিক আলো :

তড়িৎপ্রবাহের তাপীয় ফলের সর্বপ্রধান প্রয়োগ হইতেছে আলোর সৃষ্টি। বহুপূর্ব হইতে আজ পর্যন্ত বিদ্যুৎশক্তি প্রয়োগে বৈদ্যুতিক আর্ক, বায়ুশূন্য বিজলী বাল্‌ব, গ্যাস-ভরতি বিজলী বাল্‌ব, ফ্লুরেসেন্ট বাল্‌ব প্রভৃতি নানাপ্রকার আলোক সৃষ্টিকারী উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে।

একটি বায়ুশূন্য কাচের গোলকের ভিতর কার্বন ফিলামেণ্ট ঢুকাইয়া সর্বপ্রথম বৈদ্যুতিক বাল্ব্ তৈয়ার করা হয়। ইহা 1880 খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকার বিখ্যাত আবিষ্কারক এডিসন ও ইংরাজ বিজ্ঞানী সোয়ান কর্তৃক আবিষ্কৃত হয়। এইজন্য
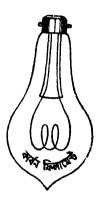
কার্বন ফিলামেণ্ট বাতি

টাংস্টেন ফিলামেণ্ট বাতি

ইহাকে Ediswan ল্যাম্প বলা হইত। কিন্তু এই বাতির একটি ত্রুটি এই যে, ইহার আলো ঠিক সাদা নয়—একটু হল্‌দে ধরনের। তাছাড়া এই বাতি হইতে যে আলো নির্গত হয় তাহা সর্বদা কাঁপে এবং উহার উজ্জ্বলতাও খুব বেশী নয়।

এই সব অসুবিধা দূর করিবার চেষ্টা করিয়া পরবর্তী যে বাতির উদ্ভাবন করা হইল তাহাকে টাংস্টেন ফিলামেণ্ট বাতি বলা হয়। এই বাতিতেও একটি বায়ুশূন্য কাচের গোলক লইয়া উহার ভিতর সরু টাংস্টেনের লম্বা তার ঢুকানো থাকে। ইহাই বাতির ফিলামেণ্ট। এই বাতির উজ্জ্বলতাও পূর্বের বাতি অপেক্ষা অনেক বেশী এবং আলোও কম্পমান নয়—কিন্তু তা' সত্ত্বেও ইহার কয়েকটি ত্রুটি আছে। প্রথমত উত্তপ্ত হইয়া টাংস্টেন বাষ্পীভূত হয় এবং গোলকের গায়ে জমিয়া কাচে কালো দাগ ফেলে। ইহাতে বাতির উজ্জ্বলতা ক্রমশ কমিয়া আসে। দ্বিতীয়ত বাষ্পীভূত হইবার ফলে টাংস্টেন ফিলামেণ্ট ক্রমশ সরু হইয়া যায় বলিয়া ইহা বেশী দিন টেকে না।
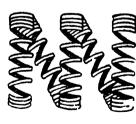
কুণ্ডলীত তার
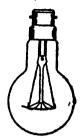
সর্বাধুনিক বিজলী বাতিতে কাচের গোলকটি বায়ুশূন্য করা হয় না। ইহাতে নিষ্ক্রিয় (inert) গ্যাস, যেমন—আরগন ইত্যাদি ভর্তি থাকে। গোলকের ভিতর একটি কুণ্ডলীত টাংস্টেনের তার (coiled coil) ফিলামেণ্ট হিসাবে ব্যবহৃত হয় (পূর্ব পৃষ্ঠার চিত্র)। এই ফিলামেণ্টের ভিতর দিয়া তড়িৎপ্রবাহ গেলে ইহার তাপমাত্রা প্রায় 2700 সেণ্টিগ্রেড হয় এবং ইহার ফলে উজ্জ্বল আলোর সৃষ্টি হয়। পার্শ্বের চিত্রে এইরূপ একটি আধুনিক বাল্‌ব্‌-এর ছবি দেখানো হইল।

আধুনিক বিজলী বাতি

(2) **বৈদ্যুতিক স্টোভ, হিটার, কেট্‌লী প্রভৃতি :**

পরিবাহীতে তড়িৎপ্রবাহের ফলে উদ্ভূত তাপ দ্বারা বৈদ্যুতিক হিটার, কেট্‌লী, ইস্তিরী প্রভৃতি নানারকম নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি নির্মিত হয়। এই যন্ত্রগুলি সাধারণতঃ কোন তাপ-সহ দ্রব্য, যেমন—Fireclay ইত্যাদির একটি ফ্রেমের উপর নাইক্রোম (ইহা নিকেল, লোহা ও ক্রোমিয়াম-মিশ্রিত সংকর ধাতু) নামক তার জড়াইয়া তৈয়ারী করা হয়। যখন এই যন্ত্রটি বৈদ্যুতিক প্লাগের সহিত যুক্ত করা হয় তখন পরিবাহী কুণ্ডলীর ভিতর দিয়া তড়িৎপ্রবাহ চলে এবং উত্তপ্ত হইয়া পড়ে। এই উত্তাপ রান্না বা জল গরম করা ইত্যাদি কাজে প্রয়োগ করা হয়।

বৈদ্যুতিক ইস্তিরী তৈরী করিবার সময় পরিবাহী কুণ্ডলীকে একটি লোহার আবরণের মধ্যে রাখা হয়। যখন কুণ্ডলী উত্তপ্ত হইয়া উঠে তখন লোহার

বৈদ্যুতিক ইস্তিরী
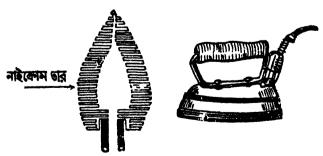
আবরণটি উত্তপ্ত হয় এবং তাহা দিয়া কাপড়, জামা ইত্যাদি ইস্তিরী করা হয়। পরিবাহীর সহিত লোহার সংযোগ ঘটিলে 'শক' লাগিবার সম্ভাবনা থাকে।

ইহা নিবারণ করিবার জন্য কুণ্ডলীটি দুইটি অভ্রের চাদর-দিয়া জড়ানো থাকে। অভ্রের চাদর লোহার সহিত কুণ্ডলীর বৈদ্যুতিক সংযোগ হইতে দেয় না। কোন কারণে ঐ চাদরটি কাটিয়া গেলে তখন 'শক' লাগিতে পারে এবং সে অবস্থায় ইস্তিরী তৈরী করা নিরাপদ নয়।

পূর্ব পৃষ্ঠার চিত্রে একটি বৈদ্যাতিক ইস্তিরীর ছবি দেখানো হইল।

(৩) **বৈদ্যুতিক ফিউজ্** (Electric Fuse) :

বৈদ্যাতিক ব্যবস্থা-সমন্বিত প্রত্যেক বাড়ীতেই 'ফিউজ্ বাক্স' থাকে। এই 'ফিউজ্' বাড়ীর বৈদ্যুতিক লাইনকে বিপদ বা দুর্ঘটনা হইতে রক্ষা করে। সাধারণত যখনই বাড়ীতে সুইচ টেপা হয় তখন তড়িৎ-প্রবাহ বাতি, পাখা ইত্যাদি বহুরকম বোধের ভিতর দিয়া যায় বলিয়া প্রবাহ-মাত্রা কম থাকে। কিন্তু কোন কারণে যদি দুইটি তার এক সঙ্গে ঠেকিয়া যায় বা কোন সংযোগ ঘটে যাহাতে লাইনের বোধ খুব কম হইয়া পড়ে (অর্থাৎ যাহাকে বলা হয় 'short circuit' তাহা হয়) তখন লাইন দিয়া প্রবল তড়িৎ-প্রবাহ যায় এবং তাহাতে যে তাপ সৃষ্টি হয় তাহা অগ্নিকাণ্ডের সৃষ্টি করিতে পারে।

এই বিপদ এড়াইবার জন্য 'ফিউজ্' তার ব্যবহার করা হয়। টিন ও সীসা মিশ্রিত একপ্রকার সংকর ধাতু দিয়া এই তার তৈরী করা হয়। ইহার

ফিউজ তার ব্যবস্থা ফিউজ তার পরাইবার ব্যবস্থা

গলনাঙ্ক খুব কম। এই তার এমনভাবে বাছিয়া লওয়া হয় যে লাইন তার সর্বাপেক্ষা বেশী যে প্রবাহ-মাত্রা সহ্য করিতে পারে এই তার তাহার কম

প্রবাহ-মাত্রাতে উত্তপ্ত হইয়া গলিয়া যায়; অথচ আলো, পাখা ইত্যাদির জন্য যে প্রবাহ-মাত্রার দরকার তাহা অপেক্ষা বেশী প্রবাহ-মাত্রা সহ্য করিতে পারে। যেমন, সাধারণত আলো, পাখা ইত্যাদির জন্য 3 amps. প্রবাহ-মাত্রা দরকার। বাড়ীতে লাইন-তার এমন দেওয়া থাকে যে উহা 6 amps. পর্যন্ত প্রবাহ-মাত্রা সহ্য করিতে পারে। এক্ষেত্রে ফিউজ্ তার লওয়া হয় যে উহা 5 amps. পর্যন্ত সহ্য করিতে সক্ষম। ইহাকে সাধারণত 5 amps.-ফিউজ বলা হয়। যদি কখনও লাইনে short circuit হয় কিংবা কোন কারণে লাইন দিয়া 5 amps.-এর বেশী প্রবাহ মাত্রা চলে তাহা হইলে ফিউজ্ তার গলিয়া বর্তনী ছিন্ন করে এবং সঙ্গে সঙ্গে আলো নিবিয়া যায়. কিন্তু লাইন নষ্ট হইতে পারে না। আলো নিবিয়া গেলেই বুঝিতে হইবে লাইনে কোথাও কোন দোষ হইয়াছে। কাজেই ফিউজ্ তারকে আমরা বলিতে পারি লাইনের ইচ্ছাকৃত এক স্থান যাহা আসল লাইন ভাঙ্গিয়া পড়িবার পূর্বে নিজেই ভাঙ্গিয়া যায়।

ফিউজ্ তার একটি চিনামাটির (porcelain) বাক্সে আটকানো থাকে। তারের একপ্রান্ত একটি স্ক্রুর সহিত আট্‌কাইয়া উহার নিকটবর্তী একটি ছিদ্রের ভিতর দিয়া গলাইয়া অপর প্রান্তের একটি ছিদ্র দিয়া বাহির করিয়া লইতে হয়। অতঃপর তারের ঐ প্রান্ত অপর একটি স্ক্রুর সহিত যুক্ত করিলে ফিউজ্ তার পরানো হইল। তারপর উহাকে একটি হোল্ডারের ভিতর চাপিয়া ঢুকাইয়া দিলেই ফিউজ্ তার আসল লাইনের সহিত যুক্ত হইয়া বর্তনী সংহত (closed) করিবে। তখন সুইচ টিপিলে লাইন দিয়া তড়িৎ-প্রবাহ চলিবে।

মোটর (Motor)

তড়িৎ শক্তির পরিবর্তে যান্ত্রিক শক্তি উৎপাদনের প্রকৃষ্ট উদাহরণ হইল বৈদ্যুতিক মোটর। 2·14 অনুচ্ছেদে যে বার্লো চক্রের বর্ণনা করা হইয়াছে তাহাকে ক্ষুদ্রাকৃতি মোটর বলা যাইতে পারে কারণ বার্লো চক্রের ঘূর্ণনের নীতির উপরই বৈদ্যুতিক মোটরের কার্যপ্রণালী নির্ভর করে।

একটি নরম লোহার চোঙের উপর কয়েক পাক তামার তার জড়াইয়া **আর্মেচার'** (armature) তৈয়ারী করা হয়। এই আর্মেচার একটি

শক্তিশালী চুম্বকের মেরুদ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থানে অনবরত ঘুরিতে পারে। আর্মেচার কুণ্ডলীর দুই প্রান্ত দুইটি অর্ধবৃত্তাকার তামার পাতের সহিত যুক্ত। এই দুইটি তামার পাতকে (P, Q) একত্রে 'commutator' বলা হয়। ইহারা আর্মেচারের সহিত একসঙ্গে ঘুরিতে পারে। তড়িৎ প্রবাহের কোন উৎসকে—যেমন, তড়িৎকোষের দুই মেরুকে—দুইটি ব্রাশের সাহায্যে commutator-এর সহিত যুক্ত করা যায়।

নিম্নের (i) ও (ii) নং চিত্রে মোটরের কার্যপ্রণালী বুঝানো হইল। ABCD আর্মেচার কুণ্ডলী। কুণ্ডলীটি একটি অনুভূমিক অক্ষ LL-এর চতুর্দিকে
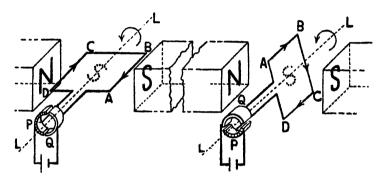
মোটরের কার্যপ্রণালী

ঘুরিতে পারে। উহার সহিত একটি তড়িৎকোষ যুক্ত। ধর, তড়িৎপ্রবাহ DCBA অভিমুখে যাইতেছে এবং কুণ্ডলীটি অনুভূমিক অবস্থায় আছে। এই অবস্থায় তড়িৎকোষের ধনাত্মক মেরু commutator-এর P-পাতের সহিত এবং ঋণাত্মক মেরু Q-পাতের সহিত যুক্ত [চিত্র (i)]। তোমরা জান যে, তড়িৎবাহী সঞ্চরণশীল তার চৌম্বক ক্ষেত্রে রাখিলে তারটি বল অনুভব করে এবং বিক্ষিপ্ত হয়। বিক্ষেপের দিক্ ফ্লেমিং-এর বামহস্ত নিয়ম দ্বারা নির্ণয় করা যায়। এস্থলে AB এবং CD বাহুতে তড়িৎপ্রবাহ আছে এবং উহারা N-S চুম্বকের চৌম্বক-ক্ষেত্রে অবস্থিত। সুতরাং উহারা প্রত্যেকে একই বল অনুভব করিবে। ফ্লেমিং-এর বাম-হস্ত নিয়ম প্রয়োগ করিলে দেখা যাইবে যে, AB তার উর্ধ্বমুখী এবং CD তার নিম্নমুখী বল অনুভব করে, কারণ, ঐ দুই বাহুতে তড়িৎ-প্রবাহের অভিমুখ উল্টা। CB এবং BD বাহু কোন বল

অনুভব করে না কারণ উহাদের তড়িৎপ্রবাহের অভিমুক চৌম্বক-ক্ষেত্রের অভিমুখের দিকে। ইহার ফলে সমগ্র কুণ্ডলীটি LL রেখাকে অক্ষ করিয়া ঘুরিয়া যাইবে। উহার ঘুরিবাঁর অভিমুখ তীরচিহ্ন দ্বারা দেখানো হইয়াছে। [(i) চিত্র]। কুণ্ডলীটি ঘুরিয়া যখন খাড়া (vertical) অবস্থায় আসিবে তখন [(ii) চিত্র] P-Q commutator-এর সাহায্যে কুণ্ডলীতে তড়িৎ-প্রবাহের অভিমুখ উল্টাইয়া দেওয়া হয়। কোষের ধনাত্মক মেরু Q পাতের সহিত এবং ঋণাত্মক মেরু P পাতের সহিত যুক্ত হয়। অর্থাৎ কুণ্ডলীতে এখন তড়িৎপ্রবাহ ABCD অভিমুখে প্রবাহিত হয় [(ii) নং চিত্র]। পুনরায় AB এবং CD তারে ফ্লেমিং-এর বাম-হস্ত নিয়ম প্রয়োগ করিলে দেখিবে যে, উহাদের উপর বলের অভিমুখ উল্টাইয়া গিয়াছে—অর্থাৎ CD তার ঊর্ধ্বমুখী ও AB তার নিম্নমুখী বল অনুভব করিতেছে। ফলে কুণ্ডলী আবার একই দিকে ঘুরিয়া যাইবে। এইরূপ যখনই কুণ্ডলী খাড়া অবস্থায় আসে তখনই commutator-এর সাহায্যে তড়িৎপ্রবাহের অভিমুখ বদলাইয়া কুণ্ডলীকে সর্বদা একই দিকে ঘুরানো হয়। তড়িৎপ্রবাহের মাত্রা বাড়াইয়া এবং শক্তিশালী চুম্বক ব্যবহার করিয়া কুণ্ডলীকে প্রবলবেগে ঘুরানো যাইতে পারে এবং কুণ্ডলীর এই আবর্তনকে নানাভাবে অন্য কার্যে প্রয়োগ করা যাইতে পারে। ইহাই হইল D. C. মোটরের নীতি।

বৈদ্যুতিক পাখা, ট্রামগাড়ী, পাম্প, রোলিং মিল প্রভৃতিতে মোটরের ব্যবহারিক প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়।

তোমরা যাহারা কলিকাতায় বসবাস কর তাহারা সকলেই ট্রামগাড়ী দেখিয়াছ। পূর্ববর্ণিত বৈদ্যুতিক মোটর দ্বারা কিভাবে ট্রাম চলাচল করে তাহা সংক্ষেপে বলিতেছি।

AB একটি তার (পর পৃষ্ঠার চিত্র), উহা ট্রামের উপর দিয়া টানানো থাকে। এই তারটি বেশ মোটা এবং তামার তৈরী। এই তারটি তড়িৎ উৎপাদক কেন্দ্রে স্থাপিত তড়িৎযন্ত্রের বা ডায়নামোর ধনাত্মক মেরুর সহিত যুক্ত। T একটি ট্রলী-চক্র, ইহা AB তার বরাবর গড়াইয়া যাইতে পারে। একটি দণ্ডের সাহায্যে ইহাকে ট্রামগাড়ীর সহিত যুক্ত রাখা হয় যাহাতে ট্রামগাড়ী চলিলে ট্রলী-চক্র AB তার বরাবর গড়াইতে পারে। একটি বৈদ্যুতিক মোটর M গাড়ীর তলায় বসানো থাকে এবং একটি তার W দ্বারা মোটরের সহিত

ট্রলী-চক্রের সংযোগ করা থাকে। মোটরটির সহিত আবার ট্রামের চাকা এমনভাবে যুক্ত থাকে যে মোটর ঘুরিলে চাকাও ঘুরিতে সুরু করে।
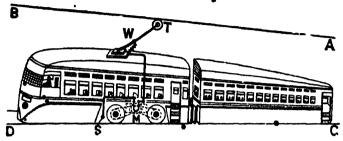
ট্রাম গাড়ীতে বৈদ্যুতিক মোটর ব্যবহৃত হয়

রাস্তায় যে ট্রাম লাইন CD পাতা থাকে তাহার সহিত ডায়নামোর ঋণাত্মক মেরু যুক্ত এবং একটি ব্রাস S দ্বারা মোটরের সহিত লাইনের যোগাযোগ রাখা হয়। ইহার ফলে ডায়নামো হইতে তড়িৎ-প্রবাহ AB তার দিয়া আসিয়া ট্রলী-চক্র T এবং তার W দ্বারা বাহিত হইয়া মোটরে উপস্থিত হয় এবং পরে ব্রাস S এবং লাইন CD দ্বারা পুনরায় ডায়নামোতে ফিরিয়া যায়। তখন মোটরটি ঘুরিতে সুরু করে এবং ট্রামের চাকাও ঘুরিতে থাকে এবং গাড়ী অগ্রসর হয়।

আজকাল হাওড়া স্টেশন হইতে বর্ধমান পর্যন্ত বৈদ্যুতিক ট্রেন চলাচল করিতেছে, তাহা তোমরা জান। এই ট্রেন ট্রামের পদ্ধতিতে চলাচল করে। তবে ট্রাম অপেক্ষা বৈদ্যুতিক ট্রেনের মোটরের শক্তি অনেক বেশী।

2-17. সংবাদ প্রেরণে বিদ্যুৎ
(Electricity for communication)

সংবাদ আদান-প্রদান ব্যাপারে বিদ্যুৎ-শক্তিকে কাজে লাগাইয়া বিজ্ঞান এক নূতন যুগের সূচনা করিয়াছে। টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, টেলিপ্রিণ্টার প্রভৃতির সাহায্যে মানুষ আজ পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে নিমেষে সংযোগ স্থাপন করিতেছে। বেতার, টেলিভিশন, রেডিও ফোটো প্রভৃতির সাহায্যে শুধু সংবাদ আদান-প্রদান নয়, বক্তা, সংবাদদাতা বা কোন ঘটনার ছবিও সঙ্গে সঙ্গে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। এই সবই সম্পন্ন হইতেছে বিদ্যুৎ-শক্তির সাহায্যে। সংবাদ আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন

আজকাল সাধারণ মানুষের আয়ত্তের ভিতর। নিম্নে এই দুই পদ্ধতির কার্যপ্রণালী ব্যাখ্যা করা হইল।

(ক) **টেলিগ্রাফ পদ্ধতি :**

টেলিগ্রাফ দ্বারা সংবাদ আদান-প্রদানে মুখ্যতঃ দুইটি যন্ত্র ব্যবহার করা হয়। একটিকে বলা হয় **প্রেরক-যন্ত্র** (transmitter) ও অপরটিকে বলা হয় **গ্রাহক যন্ত্র** বা **মর্স সাউণ্ডার** (Receiver or Morse sounder)। যে
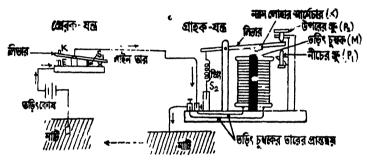
টেলিগ্রাফ সংযোগ ব্যবস্থা

স্থান সংবাদ প্রেরণ করিবে সেখানে প্রেরকযন্ত্র এবং যে স্থান সংবাদ গ্রহণ করিবে সেখানে গ্রাহকযন্ত্র বসানো থাকে। এই দুই যন্ত্রকে তার দ্বারা সংযুক্ত করা হয়। ইহাকে বলা হয় লাইন-তার। 1844 খ্রীষ্টাব্দে স্যামুয়েল মর্স এই টেলিগ্রাফ পদ্ধতি আবিষ্কার করেন।

উপরের চিত্রে টেলিগ্রাফ যন্ত্রের সংযোগ ব্যবস্থা দেখানো হইয়াছে। প্রেরক যন্ত্র দেখিতে অনেকটা ছোট ঢেঁকির মত। প্রকৃতপক্ষে ইহা একটি লিভার যন্ত্র। এই লিভারের পাটাতনের উপর E একটি বন্ধনী-স্ক্রু। কতকগুলি তড়িৎকোষের একটি ব্যাটারীর এক প্রান্ত E-এর সহিত যুক্ত এবং অপর প্রান্ত মাটিতে পোতা। S-স্প্রীং-এর সাহায্যে সাধারণ অবস্থায় লিভারের K-বর্তুল (knob) E-স্ক্রু হইতে পৃথক্ হইয়া থাকে। লিভারটির আলম্ব (fulcrum) বিন্দুর সহিত লাইন তারের একপ্রান্ত যুক্ত থাকে এবং অপর প্রান্ত গ্রাহকযন্ত্রের তড়িৎ-চুম্বক M-এর গায়ে জড়ানো তারের একপ্রান্তের সহিত যুক্ত। তড়িৎ চুম্বকের তারের অপর প্রান্ত মাটিতে প্রোথিত। গ্রাহকযন্ত্রের তড়িৎ-চুম্বকের উপরে একটি নরম

লোহার আর্মেচার-X অবস্থিত। এই আর্মেচারটি আবার একটি লিভার-দণ্ডের সহিত যুক্ত। সাধারণ অবস্থায় এই দণ্ডটি S_2 স্প্রীং কর্তৃক টান খাইয়া উপরের স্ক্রু P_2-কে স্পর্শ করিয়া থাকে। অর্থাৎ আর্মেচার-X তড়িৎ-চুম্বক-M হইতে পৃথক হইয়া থাকে।

এখন যদি প্রেরকযন্ত্রের K-এর বর্তুল চাপিয়া ধরা যায় তবে উহা E বন্ধনী-স্ক্রু-কে স্পর্শ করিবে ; ফলে ব্যাটারী হইতে তড়িৎপ্রবাহ লিভার-দণ্ড বাহিয়া লাইন তার দিয়া গ্রাহকযন্ত্রের তড়িৎ-চুম্বকে পৌঁছাইবে এবং তড়িৎ-চুম্বকের তার বাহিয়া মাটি দিয়া পুনরায় ব্যাটারীতে ফিরিয়া আসিবে।

সুতরাং মাটি একটি তারের কাজ করে। অন্য তারটি লম্বা লম্বা পোস্টের সাহায্যে বা জলের তলা দিয়া (Submarine cables) দূরবর্তী স্থানে লইয়া যাওয়া হয়। এইভাবে তড়িৎ-বর্তনী সংহত (closed) হইলে তড়িৎ-চুম্বক আকর্ষণী শক্তি পাইবে এবং X-কে টানিয়া ধরিবে। ফলে লিভারটি P_2 স্ক্রুকে ছাড়িয়া নীচের স্ক্রু P_1-কে আঘাত করিবে এবং একটি শব্দ সৃষ্টি করিবে। আবার প্রেরকযন্ত্রের K-বর্তুল ছাড়িয়া দিলে S_1 স্প্রীং লিভারকে উপরের দিকে ঠেলিয়া দিবে এবং পূর্ববর্ণিত তড়িৎ-বর্তনী ছিন্ন হইবে। ফলে গ্রাহক-যন্ত্রের তড়িৎ-চুম্বক আর X-কে আকর্ষণ করিবে না। সুতরাং স্প্রীং-S_2 পুনরায় লিভারটিকে টানিয়া উঠাইবে এবং লিভার উপরের স্ক্রু P_2-কে আঘাত করিয়া শব্দ সৃষ্টি করিবে। কাজেই প্রেরকযন্ত্রের লিভারটি কম-বেশী টিপিয়া যেমন খট্‌খট্ শব্দ উৎপন্ন করা হয় ঠিক সেই প্রকার শব্দই গ্রাহকযন্ত্রের লিভারেও হইয়া থাকে। দুই শব্দের ভিতর সময়ের পার্থক্য অনুযায়ী কথার সংকেত নির্ভর করে। এই শব্দগুলিকে সাংকেতিক নিয়মানুযায়ী 'টরে' 'টক্কা' বলে। ইহা দ্বারা একস্থান হইতে অন্যস্থানে সংবাদ প্রেরণ করা হয়।

(খ) টেলিফোন পদ্ধতি :

টেলিগ্রাফে সাংকেতিক শব্দের সাহায্যে একস্থান হইতে অন্যস্থানে সংবাদ আদান-প্রদান করা হয়। কিন্তু 1876 খ্রীষ্টাব্দে আলেকজাণ্ডার গ্রাহাম বেল কর্তৃক আবিষ্কৃত টেলিফোন সংবাদ প্রেরণের ক্ষেত্রে এক অভূতপূর্ব

পরিবর্তন আনিল। এই টেলিফোনের সাহায্যে দূরবর্তী লোকের সঙ্গে কথাবার্তা বলা সম্ভব।

পূর্বে টেলিফোন পদ্ধতিতে একই ধরনের যন্ত্র গ্রাহক ও প্রেরকরূপে ব্যবহৃত হইত। নিম্নের চিত্রে ঐরূপ একটি যন্ত্র দেখানো হইল।

টেলিফোন গ্রাহক বা প্রেরকযন্ত্র
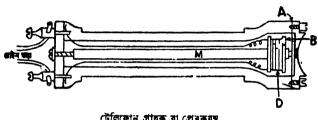
M একটি স্থায়ী চুম্বক। ইহার একপ্রান্তে B একটি ববিন (bobbin) যাহার গায়ে অন্তরিত (insulated) কুণ্ডলী D জড়ানো আছে। এই তারের দুই প্রান্ত লাইন-তারের সহিত যুক্ত। চুম্বকের B-প্রান্তের কাছে একটি নরম লোহার গোল পাতলা পর্দা (diaphragm) A আটকানো আছে। যখন এই পর্দার সামনে মুখ রাখিয়া কথা বলা হয় তখন এই পর্দাতে কম্পন সৃষ্টি হয়। ফলে চুম্বক হইতে যে বলরেখা বাহির হইয়া কুণ্ডলী D-কে ছেদ করে তাহার সংখ্যার পরিবর্তন হয়। তড়িৎচুম্বকীয় আবেশ অনুযায়ী ইহা D-কুণ্ডলীতে সংখ্যার পরিবর্তন হয়। তড়িৎ-চুম্বকীয় আবেশ অনুযায়ী ইহা D-কুণ্ডলীতে তড়িৎপ্রবাহ আবিষ্ট করে। এই তড়িৎপ্রবাহ লাইন-তার বরাবর গ্রাহকযন্ত্রে চুম্বক-মেরু ও পর্দার মধ্যে বিচলিত (fluctuating) চৌম্বক-ক্ষেত্রের সৃষ্টি করে। এই চৌম্বক-ক্ষেত্র দ্বারা গ্রাহকযন্ত্রের নরম-লোহার তৈরী পর্দা পর্যায়ক্রমে টান খাইয়া আগাইয়া আসে এবং পরক্ষণেই পিছাইয়া যায়; অর্থাৎ প্রেরকযন্ত্রের পর্দা যেভাবে আন্দোলিত হয় গ্রাহকযন্ত্রের পর্দাও ঠিক সেই ভাবে আন্দোলিত হয়। গ্রাহকযন্ত্রের পর্দার এই আন্দোলনের ফলে বায়ুতে তরঙ্গের সৃষ্টি হয় এবং গ্রাহকযন্ত্রে কান রাখিলে প্রেরকযন্ত্রে যে কথা বলা হয় হুবহু তাহা শোনা যায়।

টেলিফোন লাইনের তারগুলি একটি কেন্দ্রীয় অফিসের সহিত যুক্ত থাকে। ইহাকে 'Exchange' বলে। এই **Exchange** অফিসে একজন লোক—

যাহাকে 'অপারেটার' বলা হয়—দুই ব্যক্তির টেলিফোনের ভিতর যোগাযোগ করিয়া দিলে ঐ দুই ব্যক্তি কথা বলিতে পারে। আধুনিক স্বয়ংক্রিয় টেলিফোন-পদ্ধতিতে এই যোগাযোগ আপনা হইতে সম্পাদিত হয়।

আধুনিক টেলিফোন

আজকাল টেলিফোন প্রেরক-যন্ত্রের অনেক উন্নতিসাধন করা হইয়াছে। টমাস আল্‌ভা এডিসন কর্তৃক আবিষ্কৃত **কার্বন মাইক্রোফোন** (Carbon mircrophone) আধুনিক টেলিফোনে প্রেরকযন্ত্ররূপে কাজ করে।

কার্বন মাইক্রোফোন (Carbon microphone):

বেল টেলিফোনকে প্রেরকযন্ত্ররূপে ব্যবহার করিলে যে শব্দ সৃষ্টি হয় তাহা খুব জোরালো নয় বলিয়া দূরবর্তী স্থানের সহিত কথাবার্তা বলিবার জন্য আজকাল কার্বন মাইক্রোফোনকে প্রেরক-যন্ত্ররূপে ব্যবহার করা হয়। বিখ্যাত আবিষ্কারক টমাস আল্‌ভা এডিসন এই মাইক্রোফোন আবিষ্কার করেন।
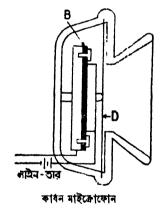
কার্বন মাইক্রোফোন

সংলগ্ন চিত্রে এই মাইক্রোফোনের নক্‌শা দেখানো হইল। D লোহার খুব পাতলা একটি পর্দা (diaphragm) এবং B একটি কার্বন ব্লক। D এবং B-এর মধ্যবর্তী স্থান কার্বন দানা (granules) দ্বারা ভরতি। B এবং D এর সহিত লাইন-তার আটকানো। এই তারের অপর প্রান্তদ্বয় গ্রাহকযন্ত্রের সহিত যুক্ত। গ্রাহক ও প্রেরকযন্ত্রের মধ্যে এবং লাইন-তারের সহিত একটি তড়িৎকোষ যুক্ত থাকে।

D-পর্দার সম্মুখভাগে যন্ত্রটির আকার অনেকটা ফানেলের মত। ইহাকে Mouth-piece বলে। যখন Mouth-piece-এর সম্মুখে মুখ রাখিয়া কথা বলা হয় তখন D-পর্দাটি নড়িতে থাকে। পর্দাটি ভিতরের দিকে সরিয়া গেলে কার্বন দানাগুলির চাপ খায়। ফলে কার্বন দানাগুলির রোধ (resistance)

কমিয়া যায়। আবার পর্দাটি বাহিরের দিকে সরিয়া গেলে এই চাপ কমিয়া যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে দানাগুলির রোধ বৃদ্ধি পায়। চাপ পরিবর্তনের ফলে রোধের পরিবর্তন কার্বনের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। এই কারণেই মাইক্রোফোনে কার্বন ব্যবহার করা হয়। রোধের হ্রাস-বৃদ্ধির ফলে তড়িৎকোষ হইতে উৎপন্ন তড়িৎপ্রবাহেরও হ্রাস-বৃদ্ধি হয় এবং একটি বিচলিত (fluctuating) তড়িৎ-স্রোত লাইন-তার বরাবর গ্রাহকযন্ত্রে উপস্থিত হয়। এই বিচলিত তড়িৎ-স্রোত গ্রাহক-যন্ত্রের পর্দাটিকে প্রেরকযন্ত্রের পর্দার মত নাড়াইতে থাকে এবং তাহার ফলে বায়ুমণ্ডলে শব্দ-তরঙ্গের সৃষ্টি হইয়া গ্রাহকযন্ত্রে শব্দের সৃষ্টি করে।

টেলিফোনের সরল সংযোগ ব্যবস্থা সংলগ্ন চিত্রে দেখানো হইয়াছে। এই চিত্রে গ্রাহকযন্ত্রটি হইতেছে বেল টেলিফোন এবং প্রেরকযন্ত্রটি কার্বন

টেলিফোন সংযোগ ব্যবস্থা
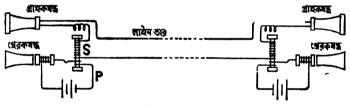
মাইক্রোফোন। যে-কোন স্থানের প্রেরকযন্ত্রে কথা বলিলে লাইন-তার বরাবর তড়িৎপ্রবাহ গিয়া অপর স্থানের গ্রাহকযন্ত্রে উপস্থিত হইবে এবং ঐ যন্ত্রে কান রাখিলে কথা শোনা যাইবে। অনুরূপভাবে দ্বিতীয় স্থানে কথা বলিলে প্রথমোক্ত স্থানে তাহা শোনা যাইবে। কার্বন মাইক্রোফোনকে সক্রিয় করিবার জন্য চিত্রে একটি ব্যাটারী দেখানো হইয়াছে। আধুনিক টেলিফোন যন্ত্রে গ্রাহক এবং প্রেরকযন্ত্র উভয়কে একটি আধারে এমনভাবে রাখা হয় যে প্রেরকযন্ত্র মুখের সামনে থাকে এবং গ্রাহকযন্ত্র কানের কাছে থাকে।

অনুশীলনী

1. **নিম্নলিখিত তড়িৎকোষগুলির বিবরণ দাও :**

(ক) লেক্‌ল্যান্স কোষ ; **(খ)** নির্জল কোষ ; **(গ)** ড্যানিয়েল কোষ।

2. **সঞ্চয়ক কোষ কাহাকে বলে ? ইহার সহিত উপরোক্ত কোষগুলির পার্থক্য কি ? সঞ্চয়ক-কোষ বর্ণনা কর।**

3. নিম্নলিখিত কার্যের জন্য কোন্ কোষ উপযোগী :

(ক) ঘর আলোকিত করার জন্য ; (খ) বৈদ্যুতিক ঘণ্টা বাজাইবার জন্য। (গ) সাইকেলের আলো জ্বালিবার জন্য।

4. শক্তি-উৎসরূপে তড়িতের কয়েকটি ব্যবহারিক প্রয়োগ বর্ণনা কর।

5. নিম্নলিখিত যন্ত্রগুলির সম্বন্ধে টীকা লিখ :

(ক) বৈদ্যুতি বাতি, (খ) বৈদ্যুতিক স্টোভ, (গ) ফিউজ তার, (ঘ) মোটর।

6. টেলিগ্রাফ-পদ্ধতির নীতি কি? একটি পরিষ্কার নক্সা আঁকিয়া টেলিগ্রাফ-পদ্ধতি বর্ণনা কর।

7. টেলিফোন কাহাকে বলে? একটি টেলিফোন গ্রাহক বা প্রেরকযন্ত্র বর্ণনা কর। কার্বন মাইক্রোফোন কি কার্যে ব্যবহৃত হয়?

8. নিম্নলিখিত কার্যগুলির জন্য কোন্ যন্ত্র ব্যবহার করিবে :—

(i) তড়িৎপ্রবাহের সাহায্যে প্রবলবেগে যান্ত্রিক আবর্তন সৃষ্টি করিবার জন্য,

(ii) দূরবর্তী স্থানের সহিত সাংকেতিক ভাষায় সংবাদ আদান-প্রদানের জন্য,

(ii) দূরবর্তী স্থানের সহিত কথাবার্তা বলিবার জন্য।

Objective Type প্রশ্ন

(ক) Alternate response type :

(i) *Yes or No type :*

(a) সঞ্চয়ক কোষের কার্যপ্রণালী ও প্রাথমিক কোষের কার্যপ্রণালীর ভিতর পার্থক্য আছে কি?

(b) মোটর কি তড়িৎ উৎপাদন করে?

(c) বার্লো চক্রকে কি বৈদ্যুতিক মোটর বলা চলে?

(ii) *True or False type :*

(a) তড়িৎকোষ রাসায়নিক শক্তির পরিবর্তে তড়িৎ শক্তি উৎপাদন করে। —

(b) লেক্লান্স কোষের সহিত নির্জল কোষের মূলত কোন সাদৃশ্য নাই। —

(c) বৈদ্যুতিক মোটরে বৈদ্যুতিক শক্তির পরিবর্তে যান্ত্রিক শক্তি পাওয়া যায়। —

(d) টেলিফোন-পদ্ধতিতে তড়িৎ-চুম্বকীয় আবেশকে কাজে লাগানো হয়। —

(e) বৈদ্যুতিক বাতি তড়িৎপ্রবাহের তাপীয় ফলের ব্যবহারিক প্রয়োগ। —

(খ) Recall type :

(i) লেক্ল্যান্স, ড্যানিয়েল প্রভৃতি কোষকে—কোষ বলা হয়। —

(ii) বৈদ্যুতিক ফিউজ তড়িৎপ্রবাহের—ফলের উদাহরণ। —

(iii) বৈদ্যুতিক—বাড়ীর বৈদ্যুতিক লাইকে দুর্ঘটনার হাত হইতে রক্ষা করে। —

(গ) Completion type :

ফ্লেমিং-এর বামহাত—(a) নিয়মরূপ : বামহাতের প্রথম তিনটি আঙুল পরস্পরের সহিত — (b) প্রসারিত অবস্থায় যদি তর্জনী — (c) — অভিমুখী হয় এবং মধ্যমা তড়িৎপ্রবাহের — (d) অভিমুখী হয় তবে বৃদ্ধাঙ্গুলি তারের — (e) অভিমুখ নির্দেশ করিবে।

—(a)

—(b)

—(c)

—(d)

—(e)

(ঙ) Multiple choice type :

(i) বিরতিযুক্ত তড়িৎপ্রবাহ দরকার হইলে কোন্ কোষ সর্বাপেক্ষা উপযোগী ?

উঃ। সঞ্চয়ক, ড্যানিয়েল, লেক্ল্যান্স।

(ii) দূরবর্তী স্থানের সহিত কথাবার্তা বলিবার জন্য কোন্ যন্ত্র উপযোগী ?

উঃ। মোটর, টেলিফোন, টেলিগ্রাফ।

(iii) তড়িৎপ্রবাহের তাপীয় ফলের প্রয়োগ কোন্‌টি ?

উঃ। কার্বন মাইক্রোফোন, হিটার, ফিউজ তার, নির্জল কোষ।

ধাতু

[Metals]

কয়েকটি ধাতুর অবস্থান, ধর্ম ও ব্যবহার

(Natural occurance, properties & uses of some metals)

লোহা, তামা, অ্যালুমিনিয়াম প্রভৃতি যে-সকল সাধারণ ধাতু আমরা সর্বদা ব্যবহার করি, উহার কোনটিই ধাতু হিসাবে খনিতে পাওয়া যায় না। সকল দেশেরই কোন বিশেষ অঞ্চলে হয়তো বা ভূ-পৃষ্ঠে, অথবা হয়তো মাটির অনেক নীচে ভূ-গর্ভে, ঐ সকল ধাতুর খনিজ (mineral) পাওয়া যায় এবং ঐ খনিজে উপযুক্ত পরিমাণ ধাতু থাকিলে কোন বিশেষ পদ্ধতিতে সেই ধাতু নিষ্কাশন করা হয়। পৃথিবীর সাধারণ মাটিতেও নানাপ্রকার ধাতু বর্তমান, কিন্তু তাই বলিয়া মাটি সাধারণত কোন ধাতু নিষ্কাশনের পক্ষে উপযোগী নহে। যদি কোন খনিজ কোন বিশেষ ধাতু নিষ্কাশনের পক্ষে আর্থিক হিসাবে উপযোগী বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহা হইলেই সেই খনিজকে সেই বিশেষ ধাতুর **আকরিক** বা **ওর** (ore) বলে। কোন্ আকরিকে শতকরা কত ভাগ ধাতু থাকা উচিত, তাহা ঐ ধাতুর বাজার-মূল্যের উপর নির্ভর করে। আমাদের দেশে লোহার যে আকরিক (হিমাটাইট, hematite) লোহা নিষ্কাশনের জন্য ব্যবহৃত হইতেছে ও হইবে, তাহাতে প্রায় 60-65% লৌহ বর্তমান, অথচ ঘাটশিলায় তামার যে আকরিক তামা নিষ্কাশনের জন্য ব্যবহৃত হয়, তাহাতে মাত্র 2-3% তামা থাকে। তামা অধিকতর মূল্যবান বলিয়াই এই পার্থক্য স্বীকৃত হইয়াছে। সোনা এত মূল্যবান যে প্রতি এক লক্ষ ভাগ বালিতে মাত্র এক ভাগ অথবা তারও কম সোনা থাকিলে সে সোনা নিষ্কাশন করা হয় এবং তাহাতে আর্থিক লাভ হয়। বালি অথবা বালিজাতীয় পাথরের (quartz) সহিত অতি সূক্ষ্ম কণার আকারে সোনা থাকে। সোনার আপেক্ষিক গুরুত্ব প্রায় 19 এবং বালির আ. গু. মাত্র প্রায় 2·5 ; কাজেই জলের মধ্যে থিতাইয়া উহাদিগকে অনেকটা পৃথক করিয়া ফেলা যায়। সোনা ছাড়া অন্যান্য ধাতুগুলি অক্সাইড, সালফাইড প্রভৃতি যৌগিকরূপে থাকে ;

সুতরাং উহাদিগকে প্রস্তুত করিতে হইলে কোন রাসায়নিক পদ্ধতির সাহায্য লইতে হয়। কোন ধাতু অক্সাইড রূপে পাওয়া গেলে উহা কয়লা অথবা ঐরূপ কোন বিজারক (reductant) দ্বারা বিজারিত করিয়া লইতে হয়। যথা, খানিকটা লোহার অক্সাইডের (যেমন মরিচা) সহিত কিছু কয়লার গুঁড়া মিশাইয়া খুব-উত্তপ্ত করিলে লোহা উৎপন্ন হইবে।

লোহার অক্সাইড + কয়লা = লোহা + কার্বন ডাই-অক্সাইড

কোন ধাতু সালফাইড রূপে পাওয়া গেলে উহা প্রথমে বায়ুর সাহায্যে জারিত করিয়া (oxidation) অক্সাইডে পরিণত করিয়া পরে সেই অক্সাইডকে কয়লা দ্বারা বিজারিত করা যায়। দস্তার সাল্‌ফাইড বায়ুর মধ্যে জারিত করিলে উহা অক্সাইডে পরিণত হয়। সেই অক্সাইডের সহিত কয়লা মিশাইয়া উত্তপ্ত করিলে দস্তা ধাতু বাষ্পাকারে বাহির হইয়া আসে। ঠাণ্ডা করিলে ধাতু পাওয়া যায়।

দস্তার সালফাইড + অক্সিজেন = দস্তার অক্সাইড + সালফার ডাই-অক্সাইড
দস্তার অক্সাইড + কয়লা = দস্তা + কার্বন মনক্সাইড

অ্যালুমিনিয়াম ধাতুর প্রাকৃতিক স্থিতি অক্সাইডরূপে, কিন্তু কয়লা দ্বারা সেই অক্সাইড বিজারিত করা যায় না। বিশুদ্ধ অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড তড়িদ্‌-বিশ্লেষণ করিলে অ্যালুমিনিয়াম ক্যাথোডে (নেগেটিভ) উৎপন্ন হয় এবং অক্সিজেন অ্যানোডে (পজিটিভ) উৎপন্ন হয়। তাপের প্রয়োগে ধাতু নিষ্কাশনের উপায়গুলিকে তাপ-পদ্ধতি (pyrometallurgy) এবং তড়িতের সাহায্যে ধাতু নিষ্কাশনের উপায়গুলিকে তড়িৎ-পদ্ধতি (electrometallurgy) বলে।

1. লোহা (Iron)

অবস্থান : এই পৃথিবী যে সকল পদার্থ দ্বারা গঠিত তন্মধ্যে লোহার পরিমাণ খুবই বেশী। ভূ-ত্বকে শতকরা প্রায় 4·5 ভাগ লোহা আছে। পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে প্রায় সবটাই লোহা। আকাশ হইতে যে সকল উল্কাপিণ্ড পৃথিবীতে নামিয়া আসে, তাহা প্রায়ই লৌহ-প্রধান এবং সংকরধাতু হিসাবে উহার মধ্যে বেশ খানিকটা নিকেল থাকে। লোহার প্রধান আকরিক (ore) **হিমাটাইট** এবং প্রধানত এই আকরিক হইতেই পৃথিবীর সব দেশে

লোহা প্রস্তুত হয়। লোহার **ম্যাগনেটাইট** নামক আকরিক চুম্বকধর্মী, ইহা লোহা আকর্ষণ করে। হিমাটাইট ও ম্যাগনেটাইট উভয়েই লোহার অক্সাইড। লোহার সালফাইড **পাইরাইট** নামে পরিচিত, ইহা প্রকৃতিতে যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া গেলেও লোহা প্রস্তুতির পক্ষে ইহা উপযোগী নহে। আমাদের রক্তে **হিমোগ্লোবিন** নামক যে পদার্থ আছে তাহাতে লোহা বর্তমান।

(2) **প্রস্তুত পদ্ধতি:** মানব সভ্যতায় লোহার ব্যবহার সোনা, রূপা ও তামার অনেক পরে আসিয়াছে, ইহা বুঝিতে পারা যায়। ইহার কারণ, লোহার খনিজ (ore) হইতে লোহার নিষ্কাশন রূপা অথবা তামার নিষ্কাশন অপেক্ষা কঠিন। আমাদের দেশে লোহার ব্যবহার প্রাচীনকাল হইতেই জানা ছিল। দিল্লীতে কুতুবমিনারের নিকট 22 ফুট উঁচু একটি লৌহস্তম্ভ আছে। উহার ওজন প্রায় 300 মণ। প্রায় হাজার বৎসর পূর্বে অত বড় একখণ্ড খুব ভাল লোহা কি উপায়ে প্রস্তুত হইয়াছিল, ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়।

যে আকরিক বা ওর হইতে লোহা নিষ্কাশিত হয়, তাহার নাম হিমাটাইট (hematite)। গভীর বাদামী অথবা প্রায় কালো রংয়ের এই আকরিক ভারতবর্ষের নানা স্থানে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। ভারতবর্ষে লোহার প্রধান উৎপাদক ছিল জামসেদপুরের টাটা কোম্পানীর কারখানা, বার্নপুরের ইণ্ডিয়ান আয়রন কোম্পানীর কারখানা এবং মহীশূরের ভদ্রাবতী লৌহ কারখানা। বর্তমানে উড়িষ্যার রাউরকেল্লায়, মধ্যপ্রদেশের ভিলাই-এ ও পশ্চিম বাংলার দুর্গাপুরে যে-সকল লৌহকারখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহাতে ভারতে লৌহ উৎপাদন অনেক বাড়িয়া গিয়াছে।

লোহার আকরিক (ore) হিমাটাইট বস্তুতপক্ষে লোহার অক্সাইড হইলেও উহার মধ্যে অল্পপরিমাণে বালি, ফস্‌ফরাস, ম্যাঙ্গানিজ প্রভৃতি পদার্থ থাকে। উহা হইতে লোহা নিষ্কাশন একটি সুবৃহৎ শিল্প। প্রায় এক শত ফুট উঁচু **ব্লাস্ট-ফারনেস** নামক এক প্রকার চুল্লী হিমাটাইট হইতে লোহা নিষ্কাশনের জন্য ব্যবহৃত হয়। চুল্লীটি একবার ধরাইলে একাধিক্রমে 15—20 বৎসরও চলিতে পারে এবং একটি চুল্লী হইতে প্রতি 24 ঘণ্টায় 1000 টনেরও বেশী লোহা গলিত অবস্থায় পাওয়া যাইতে পারে। (হিমাটাইটের সহিত চুনা পাথর ও কোক (কয়লা) মিশাইয়া উহা ব্লাস্ট-ফারনেসের উপরে ঢালিয়া

দেওয়া হয়। কারনেসের উষ্ণতা উপর হইতে নীচের দিকে ক্রমেই বাড়িতে থাকে এবং চুল্লীব তলদেশে উষ্ণতা এত প্রচণ্ড হয় (উপবে আনুমানিক 300° সে. হইতে নীচে আ. 1500 সে.) যে লোহা গলিত অবস্থায় তলায় জমে এবং ঐ গলিত লোহার ঠিক উপবে আকরিকেব অকেজো পদার্থগুলি চুনা-

ব্লাস্ট-ফারনেস
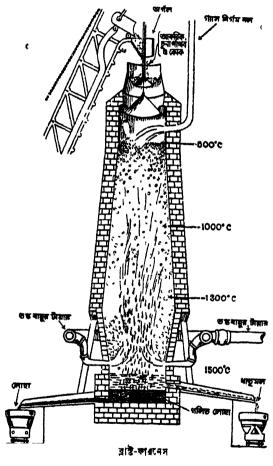
পাথরের চুনের সহিত বাসায়নিক মিলনে গলিত গাদরূপে জমে। এই গাদকে **স্ল্যাগ** (slag) বা **ধাতুমল** বলে। খানিকটা জমিলে উহা চুল্লীর গাত্রের ছিদ্র (tap hole) দিয়া বড় বড় কড়াইয়ে (ladle) ঢালিয়া লওয়া হয়। লোহার তলায় যথেষ্ট পরিমাণে জমিলে উহা অন্য ছিদ্র দিয়া বাহির করিয়া লওয়া হয়।

চুল্লীর নীচের দিকে প্রচুর পরিমাণে গরম বাতাস টুইয়ার্স (tuyeres) নামক ছোট ছোট ছিদ্র দিয়া চুল্লীব ভিতরে প্রবেশ কবানো হয়। চুল্লীর ভিতরে ঝড়ের বেগে বাতাস প্রবাহিত হইতে থাকে বলিয়া উহাকে ব্লাস্ট-ফারনেস (ব্লাস্ট = ঝড) বলে। চুল্লীব ভিতরে লোহার অক্সাইড কার্বন এবং কার্বন হইতে উৎপন্ন কার্বন মনক্সাইড নামক গ্যাস দ্বাবা বিজারিত (reduced) হইয়া লোহায় পবিণত হয় এব আকরিকেব অকেজো অংশগুলি চুনের সহিত সক্রিয় হইয়া ক্যাল্‌সিয়াম সিলিকেট প্রভৃতি পদার্থে পরিণত হয়। এই শেষোক্ত বস্তুটিই স্ল্যাগেব প্রধান উপাদান। চুল্লীর উপবের দিকে গ্যাস বাহিব হইবার নির্গম পথ (outlet) থাকে, যে গ্যাস ঐ পথে বাহিব হইয়া যায় তাহার মধ্যে যথেষ্ট কার্বন মনক্সাইড থাকে। কার্বন মনকসাইড দাহ্য গ্যাস, ব্লাস্ট-ফাবনেসেব ঐ দাহ্য গ্যাস কাউপাব স্টোভেব (Cowper stoves) মধ্যে
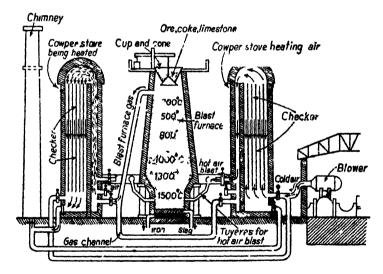
কাউপার স্টোভসহ ব্লাস্ট-ফারনেসের পূর্ণাঙ্গ চিত্র

জ্বালানো হয়। ইহার মধ্যে ইটের (fire brick) পাঁজার মত চেকার (checker) থাকে। গ্যাস দহনের ফলে কাউপার স্টোভ অত্যন্ত গরম (প্রায় 700°—800° সে.) হইয়া পড়ে। তখন সেই স্টোভের মধ্য দিয়া ঠাণ্ডা বাতাস চালিত কবিলে বাতাসও খুব গবম হয়, এই বাতাসই ব্লাস্ট-ফাবনেসের তলায়

টুইয়ার্স দিয়া প্রবেশ করানো হয়। ব্লাস্ট-ফারনেস হইতে যে-লোহা পাওয়া যায়, তাহাকে **ঢালাই লোহা** বা **কাস্ট আয়রন** বলে। এই কাস্ট আয়রন হইতে পরে বিভিন্ন উপায়ে স্টীল বা ইস্পাত প্রস্তুত হয়। লোহার অক্‌সাইডকে বিজারিত করিয়া ব্লাস্ট-ফারনেসে যে পদ্ধতিতে লোহা প্রস্তুত হয়, তাহাকে **স্মেলটিং** (smelting) বলে। কোন ধাতুকে বিজারণ প্রক্রিয়া দ্বারা গলিত অবস্থায় এইরূপে প্রস্তুত করার সাধারণ নাম স্মেলটিং।

ধর্ম : বিশুদ্ধ লোহা ধূসর রংয়ের উজ্জ্বল ধাতু। লোহার গলনাঙ্ক সাধারণ ধাতুগুলির তুলনায় (যেমন, সীসা, দস্তা, অ্যালুমিনিয়াম, তামা প্রভৃতি) অনেক বেশী, প্রায় 1540° সেন্টিগ্রেড। সাধারণ লোহা বাতাসে পড়িয়া থাকিলে উহার উপরে একটি লাল রংয়ের স্তর জমে, উহাকে মরিচা (rust) বলে। ইহা লোহার অক্‌সাইড, ইহার রাসায়নিক নাম ফেরিক অক্‌সাইড। উত্তপ্ত লোহার উপর দিয়া স্টীম চালিত করিলে লোহার ম্যাগনেটিক অকসাইড উৎপন্ন হয়।

ব্যবহারের উপযোগিতা অনুযায়ী বহুবিধ লোহা জানা থাকিলেও মোটামুটিভাবে লোহাকে তিনটি প্রধান শ্রেণীতে ভাগ করা হয়।

ঢালাই লোহা (cast iron),
পেটা লোহা (wrought iron),
ইস্পাত বা স্টীল (steel)।

সকল প্রকার ব্যবহার্য লোহাতে অল্প বিস্তর কার্বন থাকিলেও ঢালাই লোহাতে কার্বনের পরিমাণ বেশী থাকে (শতকরা 4—5 ভাগ)। ঢালাই লোহা খুবই শক্ত ও ভঙ্গুর হয়। অপরপক্ষে পেটা লোহাতে কার্বন প্রায় থাকে না বলিয়া উহা খুবই নমনীয় নয়। পেটা লোহাকে পিটিয়া পাতলা পাত তৈয়ারী হয় এবং টানিয়া সরু তার তৈয়ারী হয়। স্টীলে কার্বনের পরিমাণ বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত করা হয় এবং বিভিন্ন প্রকার স্টীলে ঐ পরিমাণের তারতম্য থাকে। সাধারণ স্টীলে শতকরা এক ভাগের বেশী কার্বন থাকে না। স্টীল শক্ত, কিন্তু ভঙ্গুর না হইয়া অত্যন্ত মজবুত।

ব্যবহার : বর্তমান সভ্যতা মুখ্যত স্টীলের সভ্যতা। রেল, পুল, জাহাজ, যুদ্ধের ট্যাঙ্ক, কামান, বন্দুক, ছাপার কল, সেলাইয়ের কল, যাবতীয় অস্ত্রশস্ত্র, এমন

কি ছোট সূচটি পর্যন্ত স্টীলে তৈয়ারী। স্টীল না হইলে আমাদের জীবন সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে চলিত। কত কোটি কোটি টন লোহা পৃথিবীতে প্রস্তুত ও ব্যবহৃত হইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। ভারতে বর্তমানে প্রায় 40 লক্ষ টন স্টীল প্রস্তুত হয়। ইহার উৎপাদন বাড়াইবার জন্য সকল প্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইতেছে। আমাদের দেশে লোহার যে-খনিজ পাওয়া যায় তাহা অন্যান্য দেশের তুলনায় খুব উন্নত ধরনের। তাহা ছাড়া লোহা নিষ্কাশনের জন্য এবং স্টীল তৈয়ারীর জন্য যে-সকল কাঁচামালের প্রয়োজন, তাহাও আমাদের দেশে যথেষ্ট আছে বলিয়া লৌহ-শিল্প এখন খুব বিস্তার লাভ করিতেছে।

লোহা অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ হইলে তাহাকে পেটা লোহা বা রট আয়রন (wrought iron) বলে। এই লোহা পিটাইয়া বা টানিয়া দা, খন্তা, পেরেক, তার প্রভৃতি নানাবিধ দ্রব্য প্রস্তুত করা হয়। এই লোহার চুম্বক স্থায়ী হয় না বলিয়া ইহার দ্বারা ডাইনামো, টেলিগ্রাফ, বৈদ্যুতিক ঘণ্টা প্রভৃতিতে ব্যবহৃত তড়িৎ-চুম্বক প্রস্তুত করা হয়। রট আয়রন এবং স্টীলের মাঝামাঝি লোহাকে নরম স্টীল (mild steel) বলে। উহা দ্বারা লোহার প্লেট, শীট প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। আমরা যে ট্যাঙ্ক, বালতি, করগেটেড বা ঢেউ-খেলানো লোহা (টিনের ঘরে ব্যবহৃত) প্রভৃতির ব্যবহার দেখি, উহা এই নরম স্টীলে তৈয়ারী। লোহার পাতলা পাত তৈয়ারী করিয়া উহার উপর দস্তার প্রলেপ দিলে তাহাকে গ্যাল্‌ভ্যানাইজড্‌ লোহা (galvanised iron) বলে। বালতি প্রভৃতি জিনিসগুলি এই গ্যালভ্যানাইজড্‌ লোহায় তৈয়ারী করা হয়। এইরূপ দ্রব্যে সহজে মরিচা পড়িতে পারে না।

2. তামা (Copper)

অবস্থান : লাল উজ্জ্বল এই ধাতুটির রং আমরা নতুন পয়সায় অথবা ইলেকট্রিক তারে দেখিতে পাই। তড়িৎ পরিবহণে (conductivity) রূপা ছাড়া ইহার কোন দোসর নাই এবং যেহেতু রূপা মূল্যবান, কাজেই ইলেকট্রিক তার মাত্রই তামায় তৈয়ারী। সোনারূপার মত না হইলেও তামা অতিশয় টেকসই ধাতু বলিয়া পৃথিবীর সকল দেশের মুদ্রাতেই তামা অথবা উহার সংকর ধাতু ব্যবহৃত হয়। পিতল এবং কাঁসা তামারই সংকর ধাতু।

সমস্ত পৃথিবীতে যত তামা উৎপন্ন হয়, তাহার বেশীর ভাগই আমেরিকা হইতে আসে। সমস্ত তামার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ শুধু যুক্তরাষ্ট্রেই উৎপন্ন হয়। গন্ধকের সহিত যৌগিক রূপে তামা খনিতে পাওয়া যায়। তামার প্রধান খনিজ পাথরের নাম ক্যালকোপিরাইট্‌স্ (Chalcopyrites) অথবা কপার পিরাইট্‌স্ (copper pyrites)। এই পাথর দেখিতে ঈষৎ সবুজাভ, মাঝে মাঝে সোনালী ছোপ। অন্যান্য তামার আকরিকের মধ্যে সবুজ রংয়ের ম্যালাকাইট (mala-chite) এবং গাঢ় নীল রংয়ের অ্যাজুরাইট (azurite) সুবিদিত। এগুলি কপারের কার্বনেট। আমাদের দেশে বিহারের সিংভূম জেলায় ঘাটশীলা স্টেশনের নিকটবর্তী অঞ্চলে কপার পিরাইট্‌স পাওয়া যায় এবং উহা হইতে তামা প্রস্তুত করা হয়।

প্রস্তুত পদ্ধতি ঃ কপার পিরাইট্‌স্ বস্তুতপক্ষে তামা ও লোহার সম্মিলিত সালফাইড। উহাকে প্রথমে নানাপ্রকার উপায়ে পরিষ্কার করিয়া লইয়া (concentration) উহাকে বহুতলবিশিষ্ট চুল্লীতে (multiple hearth furnace) বাতাসের মধ্যে জারিত (roast) করা হয়। ইহাতে উহার
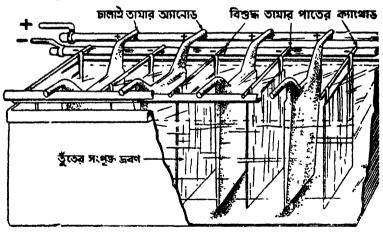
তড়িৎবিশ্লেষণ পদ্ধতিতে তামা পরিশোধন

লোহা আংশিকভাবে অক্সাইডে পরিণত হয়। তারপর উহাকে খুব বেশী উষ্ণতায় পরাবর্ত চুল্লীতে (reverberatory furnace) গলাইয়া ফেলিলে (smelting) উহার অকেজো অংশগুলি স্ল্যাগে পরিণত হয় এবং অপেক্ষাকৃত

বিশুদ্ধ কপার সালফাইড (ম্যাট, matte) উৎপন্ন হয়। অতঃপর কনভার্টার (converter) নামক একপ্রকার সুবৃহৎ পাত্রে ঐ গলিত কপার সালফাইডের মধ্য দিয়া বাতাস চালনা করা হইলে তামা উৎপন্ন হয়। এই তামাকে ব্লিস্টার কপার (blister copper) বলে। ব্লিস্টার কপার পুনরায় গলাইয়া উহাকে মাঝে মাঝে কাঁচা কাঠের দণ্ড (green pole of wood) দিয়া কয়েক ঘণ্টা ধরিয়া নাড়িলে অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ তামা পাওয়া যায়। সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ তামা প্রস্তুত করিতে হইলে তড়িৎ-বিশ্লেষণ পদ্ধতির সাহায্য লইতে হয়। কোন পাত্রে তুঁতে বা কপার সালফেটের দ্রবণ লইয়া যদি কয়েকটি অবিশুদ্ধ তামার পাত ও কয়েকটি বিশুদ্ধ তামার পাত উহার মধ্যে পর পর ডুবানো হয় এবং বিশুদ্ধ পাতগুলি ব্যাটারীর নেগেটিভ প্রান্তের সহিত ও অবিশুদ্ধ পাতগুলি ব্যাটারীর পজিটিভ প্রান্তের সহিত সংযুক্ত করা হয়, তাহা হইলে বিশুদ্ধ তামার পাতের উপর বিশুদ্ধ তামা জমিতে থাকিবে। তামার তড়িৎ-শোধন প্রণালী এই নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত।

ধর্ম : তামা উজ্জ্বল লাল রংয়ের ধাতু। জলে বাতাসে স্থায়ী বলিয়া মুদ্রা প্রস্তুতিতে তামা অথবা তামার সংকর ধাতু যথেষ্ট ব্যবহৃত হয়। তামা অতি উৎকৃষ্ট বিদ্যুৎ পরিবাহক (conductor of electricity) বলিয়া দূর দূরান্তরে বিদ্যুৎ-শক্তি প্রেরণ করিতে তামার তার একেবারেই অপরিহার্য। সোনা রূপা টিন দস্তা অ্যালুমিনিয়াম প্রভৃতি ধাতুর সহিত মিশ্রিত করিলে তামার যে সকল সংকর ধাতু (alloy) উৎপন্ন হয়, তাহা বহুল ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সোনার সহিত অল্প তামার খাদ দিয়া গিনি সোনা প্রস্তুত হয় (22 ভাগ সোনা ও 2 ভাগ তামা)। তামা ও দস্তার সংকর ধাতুর নাম পিতল। জলে বাতাসে তামা সহজে বিকৃত হয় না, কিন্তু অনেকদিন পড়িয়া থাকিলে উহা ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া এক প্রকার সবুজ পদার্থ (লোহায় যেমন মরিচা ধরে) উৎপন্ন হয়। উহাকে প্যাটিনা (patina) বলে। উহা বস্তুত কপারের একপ্রকার সালফেট।

ব্যবহার : বিদ্যুৎ পরিবাহক হিসাবে তামার ব্যবহার সর্বাপেক্ষা বেশী। বড় বড় পাওয়ার হাউস হইতে বিদ্যুৎশক্তি যে তারের মারফত বিভিন্ন শিল্পে, যানবাহনে অথবা নাগরিক ব্যবহারের জন্য পাঠানো হয়, সে সকল তার তামায় প্রস্তুত। বস্তুত সকল প্রকার বৈদ্যুতিক পরিবহণে তামার প্রয়োজন। কাঁসা,

পিতল প্রভৃতি সংকর ধাতুর অন্যতম উপাদান তামা। মুদ্রা প্রস্তুতিতে তামা বহুল প্রচলিত।

3. অ্যালুমিনিয়াম (Aluminium)

অবস্থান : ভূ-পৃষ্ঠের উপরের স্তরে মাটি, শিলা প্রভৃতি বিশ্লেষণ করিয়া দেখা গিয়াছে যে উহাদের মধ্যে যে সকল মৌলিক উপাদান রহিয়াছে তন্মধ্যে অ্যালুমিনিয়ামের পরিমাণ ধাতু হিসাবে সব চাইতে বেশী। প্রাচুর্যের দিক দিয়া ভূ-ত্বকে প্রথম অক্সিজেন, দ্বিতীয় সিলিকন এবং তৃতীয় অ্যালুমিনিয়াম। ভূ-ত্বকে শতকরা প্রায় 7% অ্যালুমিনিয়াম আছে।

অ্যালুমিনিয়ামের প্রধান আকরিক (ore) বক্সাইট। উহা অ্যালুমিনিয়ামের অক্সাইড। অ্যালুমিনিয়ামের কয়েকটি অকসাইড দামী পাথর হিসাবে বিশেষ সুপরিচিত। যথা, লাল চুনি, সবুজ পান্না, নীল নীলকান্তমণি, হলদে পোখরাজ। ক্রাইয়োলাইট নামে অ্যালুমিনিয়ামের একটি আকরিক গ্রীনল্যাণ্ডে পাওয়া যায়। সকল প্রকার মাটিতেই (যেমন, চীনামাটি-chinaclay) অ্যালুমিনিয়াম বর্তমান। ইহারা অ্যালুমিনিয়ামের সিলিকেট।

(১) **প্রস্তুত পদ্ধতি :** পৃথিবীতে অ্যালুমিনিয়ামের এত প্রাচুর্য থাকা সত্ত্বেও ধাতুটি উনবিংশ শতাব্দীর পূর্বে জানা ছিল না। আজ হইতে একশত বৎসর পূর্বেও অ্যালুমিনিয়াম এত মূল্যবান ধাতু ছিল যে সম্ভ্রান্ত মহিলারা এই ধাতুর অলঙ্কার পরিতেন। তড়িৎশক্তি আবিষ্কার এবং উহার বহুল প্রচলন হইবার পূর্বে অ্যালুমিনিয়াম প্রস্তুত সম্ভব হয় নাই। অ্যালুমিনিয়াম অক্সিজেনের সহিত যৌগিকরূপে মাটিতে পাওয়া যায়। যে বিশেষ রকমের খনিজ অ্যালুমিনিয়াম তৈয়ারী করার জন্য ব্যবহৃত হয়, তাহার নাম বক্সাইট (bauxite)। উহা আসলে অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড। অ্যালুমিনিয়াম ধাতু তৈয়ারী করিতে হইলে প্রথমে বক্সাইট হইতে বিশুদ্ধ অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড তৈয়ারী করিতে হয়। বিহারে রাঁচির নিকটবর্তী মুরিতে একটি কারখানায় বিশুদ্ধ অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড প্রস্তুত হয়। ক্রাইয়োলাইট (cryolite) নামক একপ্রকার খনিজ পদার্থ বিদ্যুৎ চুল্লীতে (electric furnace) গলাইয়া তাহার মধ্যে এই বিশুদ্ধ বক্সাইট মিশাইতে হয় এবং তারপর উহার মধ্যে বিদ্যুৎপ্রবাহ চালাইয়া দিতে

হয়। ইহাতে নেগেটিভ প্রান্তে অথবা ক্যাথোডে অ্যালুমিনিয়াম উৎপন্ন হইয়া গলিত ক্রাইয়োলাইটের তলায় জমে এবং পজেটিভ প্রান্তে বা অ্যানোডে অক্সিজেন উৎপন্ন হইয়া অ্যানোডের কার্বনের সহিত মিলিত হইয়া কার্বন

অ্যালুমিনিয়াম উৎপাদনের বিদ্যুৎচুল্লী
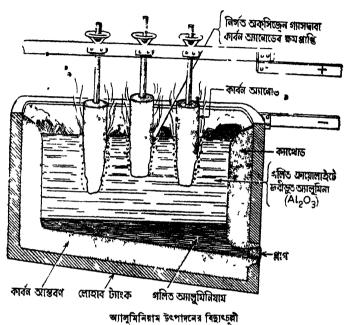
ডাই-অক্সাইডরূপে উপর দিকে বাহির হইয়া যায়। চুল্লীর তলা হইতে গলিত ধাতু বাহির করিয়া নিতে হয়।

ধর্ম ও ব্যবহার: অ্যালুমিনিয়াম ধাতু হিসাবে নরম, পেষণযন্ত্রে চাপ দিলে উহা পাতলা পাতে পরিণত হয়। এই পাত হইতে কড়াই, হাঁড়ি, বাটি প্রভৃতি বিবিধ তৈজসপত্র ও অন্যান্য দ্রব্য প্রস্তুত হয়। হাল্কা, টেকসই, এবং ভাল তাপ-পরিবাহী (conductor) বলিয়া রান্নার পাত্র প্রস্তুত করিতে ইহা উপযোগী। উচ্চ চাপের রোলারের সাহায্যে অ্যালুমিনিয়াম হইতে এত পাতলা পাত তৈয়ারী করা যায় যাহা বেধে এক ইঞ্চির 10/12 হাজার ভাগের একভাগ মাত্র। সিগারেটের প্যাকেটে অথবা চকোলেট মুড়িতে এই রকম পাত ব্যবহৃত হয়। অ্যালুমিনিয়ামের গুঁড়া রং হিসাবে এবং তুবড়ি, হাউই বাজি প্রভৃতিতে

ব্যবহৃত হইতেছে। অ্যালুমিনিয়াম অত্যন্ত হাল্কা ধাতু। ইহার আপেক্ষিক গুরুত্ব 2·7 মাত্র। বিভিন্ন অ্যাসিড অথবা অ্যালকালির দ্রবণে অ্যালুমিনিয়াম সহজেই দ্রবীভূত হয় ও নানাপ্রকার লবণ উৎপন্ন হয়। ফটকিরিতে অ্যালুমিনিয়াম সালফেট নামক লবণ আছে।

চুনি, পান্না প্রভৃতি দামী পাথর আসলে অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড। এই সকল পাথর কৃত্রিম উপায়েও প্রস্তুত হইয়া থাকে। চীনা মাটির বাসন যাহা দ্বারা প্রস্তুত হয় তাহাকে পোর্সিলেন বলে। কেওলিন, ফেলস্পার ও কোয়ার্জ, এই তিনটি মাটি ও বালি জাতীয় পদার্থ কাদার মত করিয়া মিশাইয়া গড়িয়া, পোড়াইয়া কাপ, ডিস, প্লেট ইত্যাদি তৈয়ারী হয়। উহাতে প্রধানত অ্যালুমিনিয়াম সিলিকেট রহিয়াছে। মনে রাখিতে হইবে, এনামেলের সহিত অ্যালুমিনিয়ামের কোন সম্পর্ক নাই। লোহার উপর অস্বচ্ছ কাচের মত কোন বস্তু গলাইয়া যে-প্রলেপ দেওয়া হয় তাহাকে এনামেল করা বা কলাই করা বলে। লোহা ছাড়া অন্যান্য বস্তুর উপরও কলাই করা চলে। (৮)

4. দস্তা (Zinc)

অবস্থান : ক্ষ্যালেরাইট নামক এক প্রকার খনিজ হইতে দস্তা প্রস্তুত হইয়া থাকে। উহা দস্তার সহিত গন্ধকের মিলনে উৎপন্ন একটি যৌগিক পদার্থ, (রাসায়নিক নাম—জিংক সালফাইড)। ইহা ছাড়া দস্তার আরও কয়েকটি আকরিক (ore) পৃথিবীর কোন কোন স্থানে পাওয়া যায়। উহাদের মধ্যে দস্তার অক্সাইড জিংকাইট ও দস্তার কার্বনেট ক্যালামাইন (আমেরিকার স্মিথসোনাইট) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ভারতবর্ষে উদয়পুরের অন্তর্গত জওয়ার নামক স্থানে যে ক্ষ্যালেরাইট পাওয়া যায় তাহাতে শতকরা 5—6 ভাগ দস্তা এবং শতকরা 7—8 ভাগ সীসা থাকে এবং বর্তমানে সীসা প্রস্তুত করিবার জন্য উহা ব্যবহৃত হইতেছে।

প্রস্তুত পদ্ধতি : ক্ষ্যালেরাইট হইতে দস্তা প্রস্তুত করিবার প্রথম পর্যায়ে আকরিক হইতে অকেজো অংশগুলি বাদ দিয়া অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ জিংক সালফাইড প্রস্তুত করিয়া লইতে হয়। অতঃপর সেই জিংক সালফাইডকে প্রচুর বায়ুর মধ্যে 700°—800° সে উষ্ণতায় জারিত করিলে উহা জিংক

অক্সাইডে পরিণত হয়। তখন সেই জিংক অক্সাইডের সহিত ভাল কয়লার গুঁড়া মিশাইয়া সেই মিশ্রণ এক প্রকার মাটির তৈয়ারী রেটর্টে বা বকযন্ত্রে 1200°—1300° সে. উষ্ণতায় গরম করিলে রেটর্টের খোলা মুখ দিয়া জিংক অথবা দস্তা বাষ্পাকারে বাহির হইয়া আসে। বাষ্প ঘনীভূত হইলে উজ্জ্বল দস্তা পাওয়া যায়।

জিংক অক্সাইড＝জিংক ধাতু＋কার্বন মনক্সাইড গ্যাস

ধর্ম: দস্তা রূপার ন্যায় উজ্জ্বল একটি ধাতু। প্রায় 420° সে. উষ্ণতায় ইহা গলিয়া যায়। দস্তা চূর্ণ করিয়া অথবা বাষ্পীভূত করিয়া বাতাসে জ্বালাইলে সবুজ শিখা উৎপন্ন হয় এবং সাদা রংয়ের জিংক অক্সাইড পাওয়া যায়। সাদা রং (white pigment) হিসাবে ইহা সুপরিচিত। কোন বিশেষ তেলের সহিত মিশাইয়া ইহা পেইন্টরূপে (paint) বিক্রয় হয়।

দস্তার সহিত হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড, সালফিউরিক অ্যাসিড ও নাইট্রিক অ্যাসিড মিশাইলে যথাক্রমে জিংক ক্লোরাইড, জিংক সালফেট ও জিংক নাইট্রেট নামক লবণ উৎপন্ন হয়। জিংক সালফেটের দ্রবণকে কেলাসিত (crystallize) করিলে যে সাদা লবণের ন্যায় দানা পাওয়া যায় তাহার নাম হোয়াইট ভিট্রিয়ল (white vitriol)। ঔষধ হিসাবে ইহার ব্যবহার আছে। জিংকের চোকলার সহিত কষ্টিক সোডার দ্রবণ ফুটাইলে হাইড্রোজেন গ্যাস বাহির হয় এবং সোডিয়াম জিঙ্কেট নামক লবণ উৎপন্ন হয়।

দস্তা, অ্যালুমিনিয়াম প্রভৃতি ধাতু তামা, রূপা প্রভৃতি ধাতু অপেক্ষা বেশি পজেটিভ-তড়িৎ ধর্মী (electro-positive)। কপার সালফেট অথবা তুঁতের দ্রবণের মধ্যে দস্তা বা অ্যালুমিনিয়ামের চোকলা ফেলিয়া রাখিলে কপার (তামা) পৃথক্ হইয়া তলানি পড়িবে।

পরীক্ষা—একটি পরীক্ষা নলে খানিকটা তুঁতের দ্রবণ লও ও উহার মধ্যে একটা দস্তা অথবা অ্যালুমিনিয়ামের টুকরা ফেলিয়া রাখ। কিছুক্ষণ পরে দেখিবে লাল রংয়ের ধাতু তামা পৃথক্ হইয়া তলায় জমিয়াছে।

কপার সালফেট＋জিংক＝জিংক সালফেট＋কপার

ব্যবহার: দস্তার ব্যবহার বহুবিধ। তামা ও দস্তা একসঙ্গে মিশাইয়া গলাইয়া ঠাণ্ডা করিলে পিতল প্রস্তুত হয়। সাধারণ ড্রাই ব্যাটারী (যেমন, এভারেডি ব্যাটারী) দস্তায় নির্মিত। একটি দস্তার বাটির মধ্যে অ্যামোনিয়াম

ক্লোরাইড, ম্যাঙ্গানিজ ডাই-অক্সাইড ও কার্বনের গুঁড়ার মিশ্রণ থাকে এবং ঠিক মাঝখানে একটি কার্বনের দণ্ড থাকে। দস্তার বাটির সহিত কার্বনের দণ্ডটি তামার তার দ্বারা সংযুক্ত করিলে উহার মধ্য দিয়া তড়িৎ প্রবাহিত হয়। লোহার পাতলা পাতের উপর দস্তার প্রলেপ লাগাইলে ঐ লোহায় জলে বাতাসে মরিচা ধরে না। এইরূপ পাতকে গ্যালভ্যানাইজ্‌ড লোহা (galvanised iron) বলে। বালতি, ট্যাঙ্ক, ঢেউ খেলানো লোহার পাত (corrugated iron sheet) প্রভৃতি আমাদের অতি পরিচিত। ঐ সকল বস্তুর উপরে দস্তার উজ্জ্বল প্রলেপ সর্বদাই আমাদের চোখে পড়ে।

5. স্টীল (Steel)

মানব সভ্যতায় যে-লোহার দান অপরিমেয় সে-লোহা বিশুদ্ধ লোহা নহে। বিশুদ্ধ লোহা দুর্বল, উহা কোন আঘাত অথবা ভার সহ্য করিতে পারে না; চাপ পড়িলে সহজেই বাঁকিয়া যায়। এইজন্য বিশুদ্ধ লোহাকে কাঁচা লোহা (soft iron) বলে। রেল লাইন, কড়ি-বরগা, পুলের বীম প্রভৃতি যে-সকল মজবুত লোহার জিনিস আমরা সর্বদাই দেখি, উহা স্টীলে প্রস্তুত। স্টীল অথবা ইস্পাত বিশুদ্ধ লোহা নহে। উহাতে লোহার সহিত অল্প পরিমাণে কাবন, ম্যাঙ্গানিজ, নিকেল প্রভৃতি মিশ্রিত থাকে বলিয়াই উহা এত শক্ত ও ভারসহ হয়। কার্বনের পরিমাণ কম থাকিলে উহাকে নরম ইস্পাত (mild steel) এবং অপেক্ষাকৃত বেশী থাকিলে শক্ত ইস্পাত (hard steel) বলে। ভেজাল হিসাবে কার্বন বেশী (4-5%) থাকিলে সেই লোহা শক্ত হইলেও ভঙ্গুর (brittle) হয়। সেই লোহাকে ঢালাই লোহা (cast iron) বলে। ঢালাই লোহার কড়াই হাত হইতে পড়িয়া গেলে ভাঙ্গিয়া যায়, কিন্তু পেটা লোহার কড়াই বাঁকিয়া যাইতে পারে, ভাঙে না। পেটা লোহা (wrought iron) বস্তুত পক্ষে নরম লোহা। ব্লাস্ট-ফারনেস হইতে যে লোহা পাওয়া যায়, তাহা কাস্ট আয়রন বা ঢালাই লোহা। উহা হইতে স্টীল প্রস্তুত করিবার বিভিন্ন পদ্ধতি প্রচলিত আছে।

স্টীল প্রস্তুত পদ্ধতি :

(1) **ওপ্‌ন্‌ হার্থ পদ্ধতি :** ভারতবর্ষে লোহার আকরিক হিমাটাইটে অল্প পরিমাণে ফস্‌ফরাস থাকায় এখানকার লোহার কারখানার সাধারণত বেসিক

ওপন্ হার্থ পদ্ধতি (basic open-hearth process) প্রযুক্ত হইয়া থাকে। এই হার্থ বা চুল্লী লম্বায় 35-40 ফুট এবং প্রস্থে 19-20 ফুট হয় এবং ইহাতে
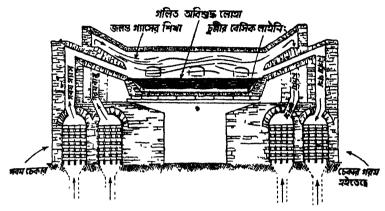
স্টীল প্রস্তুত করিবার ওপন্ হার্থ

একসঙ্গে প্রায় 100 টন স্টীল প্রস্তুত হয়। চুল্লীর তলায ম্যাগনেশিয়াম অক্সাইড দ্বারা প্রস্তুত একটি মোটা স্তর থাকে, উহাকে বেসিক লাইনিং (basic lining) বলে। উহা চুল্লীর তল বা মেঝে (floor)। যে প্রডিউসার গ্যাসের সাহায্যে লোহা উত্তপ্ত হইবে, তাহা চুল্লীর উপরে পার্শ্বদেশ হইতে প্রবেশ করিয়া চুল্লীর মধ্যে জ্বলে ও অপর পার্শ্বের নির্গম পথে বাহির হইয়া যায়। ব্লাস্ট-ফারনেস হইতে লোহা (cast iron) গলিত অবস্থায় আনিয়া এই চুল্লীর মধ্যে ঢালিয়া দেওয়া হয়। ইহা ছাড়া ঐ চুল্লীর মধ্যে কিছু ভাল আকরিক হিমাটাইট, কিছু বাড়তি স্টীল (scrap steel) এবং মাঝে মাঝে কিছু চুনাপাথর, ম্যাগনেশিয়াম কার্বনেট প্রভৃতি দেওয়া হয়। চুল্লীর ভিতরকার, 1400°-1500° সে. উষ্ণতায় নানাপ্রকার রাসায়নিক ক্রিয়া চলিতে থাকে এবং ব্লাস্ট-ফারনেসের অবিশুদ্ধ লোহা (কাস্ট আয়রন) ক্রমে বিশুদ্ধ হইতে থাকে। উহার কার্বন, ফস্‌ফরাস, সিলিকন প্রভৃতি কতকটা গ্যাসরূপে এবং কতকটা স্ল্যাগ (slag) রূপে দূরীভূত হয়। 8-10 ঘণ্টা পরে যখন লোহা যথেষ্ট বিশুদ্ধ হয়, তখন উহার সহিত হিসাব মত কার্বন, ম্যাঙ্গানিজ, প্রভৃতি মিশাইয়া সেই গলিত মিশ্রণ ছাঁচে (moulds) ঢালা হয়। ঠাণ্ডা হইলে যে স্টীল খণ্ডগুলি পাওয়া যায়, তাহাকে ইনগট (ingots) বলে।

(2) **বেসেমার পদ্ধতি :** বেসেমার পদ্ধতিতে (Bessemer process) ইস্পাত উৎপাদন করা হয় বেসেমার কনভারটার (Bessemer converter) নামক চুল্লীতে। বেসেমার চুল্লীর আকার বৃহৎ ডিম্বের ন্যায় এবং ইহা উচ্চতায় প্রায় 30 ফুট ও ব্যাস প্রায় 10 ফুট। একটি মধ্যবর্তী অক্ষকে (axis) কেন্দ্র
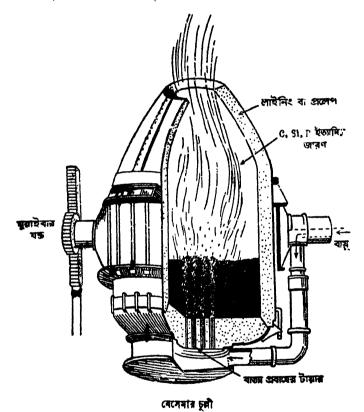
বেসেমার চুল্লী

করিয়া বেসেমার কনভারটার-চুল্লীটি যন্ত্রের সাহায্যে ঝুলানো থাকে এবং প্রয়োজনমত ইহাকে কাত করা যায়। চুল্লীর তলায় কয়েকটি নলের (tuyeres) সাহায্যে গলিত লোহার মধ্যে বায়ু-প্রবাহ চালানো হয়। চুল্লীর ভিতরের প্রাচীরে সিলিকা বা চুন ও ম্যাগনেসিয়ার পুরু লাইনিং বা প্রলেপ দেওয়া থাকে।

ব্লাস্ট-ফার্নেস হইতে লোহা গলিত অবস্থায় বেসেমার চুল্লীতে ঢালা হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে নলের ভিতর দিয়া বায়ু-প্রবাহ চালানো হয়। ইহাতে নানা

প্রকার রাসায়নিক ক্রিয়া চলিতে থাকে। অতঃপর চুল্লীকে কাত করিয়া বায়ু-প্রবাহ বন্ধ করিয়া চুল্লীর মধ্যে নিয়ন্ত্রিত পরিমাণে কিছু লোহা, ম্যাঙ্গানীজ এবং কার্বনের মিশ্র পদার্থ [স্পাইজেল Spiegel] ঢালা হয়। কিরূপ ইস্পাত তৈয়ারী করা হইবে উহার উপর স্পাইজেল সরবরাহের পরিমাণ নির্ভর করে। স্পাইজেল মিশাইবার পরেও অল্পক্ষণের জন্য চুল্লীর মধ্যে বায়ু-প্রবাহ চালানো হয়। এইরূপে ব্লাস্ট-ফারনেসের অবিশুদ্ধ লোহা (কাস্ট আয়রন) স্টীলে পরিণত হয়।

(3) **বৈদ্যুতিক পদ্ধতি :**

কোন কোন যন্ত্রের বিভিন্ন অংশ প্রস্তুত করার জন্য সুদৃঢ় ও মজবুত ধরনের ইস্পাত প্রয়োজন। এরূপ ইস্পাত তৈয়ারী করা হয় বৈদ্যুতিক চুল্লীতে (Electric furnace)। বৈদ্যুতিক চুল্লীতে প্রস্তুত ইস্পাতের গঠন বিসিমার বা ওপেন-হার্থ পদ্ধতিতে তৈয়ারী ইস্পাতের চেয়েও সুনির্দিষ্টভাবে নিয়ন্ত্রিত করা যায়। বৈদ্যুতিক চুল্লীতে ইস্পাত তৈয়ারী করার সময় বায়ু-প্রবাহের প্রয়োজন হয় না। এই প্রকার চুল্লীতে প্রধানত উচ্চ মানের **সংকর ইস্পাত** (alloy steel) তৈয়ারী হয়।

ব্যবহার : ঘড়ির স্প্রীংয়ের স্টীল, ছুরি-কাঁচির স্টীল, মোটা প্লেট তৈয়ারী করিবার স্টীল, মরিচাহীন স্টীল এবং নানাপ্রকার যন্ত্রপাতির উপযোগী হাজার রকম স্টীল আছে। এমন স্টীল আছে, যাহার করাত তৈয়ারী করিয়া অন্য স্টীল কাটিয়া ফেলা যায়।

বিভিন্ন যন্ত্রপাতি নির্মাণে ইস্পাতের চেয়ে সংকর ইস্পাত (alloy steel) বেশি কাযকরী। ইস্পাতের সঙ্গে বিভিন্ন অনুপাতে ম্যাঙ্গানীজ, সিলিকন, নিকেল ক্রোমিয়াম, টাংস্টেন ইত্যাদি মিশ্রিত করিয়া সংকর ইস্পাত তৈয়ারী করা হয়।

ম্যাঙ্গানীজ স্টীল : অত্যন্ত কঠিন বলিয়া ইহা রেল লাইন, সিন্দুক, সৈনিকের হেলমেট, পেষণ ও পালিশ যন্ত্র নির্মাণের জন্য ব্যবহার করা হয়।

সিলিকন স্টীল : এরূপ স্টীল প্রধানত বিদ্যুৎ-যন্ত্র তৈয়ারী করার জন্য ব্যবহৃত হয়।

নিকেল স্টীল : ইহা দ্বারা রেলগাড়ী, মোটর, যুদ্ধ-জাহাজ, সামরিক যন্ত্রপাতি প্রভৃতি তৈয়ারী হয়।

ক্রোমিয়াম স্টীল : ইহা মরিচাহীন (rustless or stainless)। এরূপ স্টীলে রাসায়নিক প্ল্যাণ্ট, মোটরের যন্ত্রপাতি, কাঁটা-চামচ ইত্যাদি তৈয়ারী করা হয়।

6. পিতল (Brass)

পিতল কোন বিশুদ্ধ ধাতু নহে, তামা ও দস্তার মিশ্রণে উহা প্রস্তুত হয়। সুতরাং ইহা একটি সংকর ধাতু (alloy)। দস্তা গলাইয়া উহার সহিত ধীরে ধীরে তামা মিশাইতে হয়। সাধারণ পিতলে শতকরা 30 ভাগ দস্তার সহিত 70 ভাগ তামা মিশ্রিত থাকে। আমাদের দেশে ঘটি, গামলা, গাড়ু প্রভৃতি নানাবিধ তৈজসপত্র পিতলে প্রস্তুত হয়। পিতলের টিউব, রড, বিভিন্ন যন্ত্রপাতি তালা, চাবি প্রভৃতি সর্বদাই চোখে পড়ে। পিতলের জিনিসের উপর তড়িৎ-লেপন (electroplating) করিয়া বিবিধ প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রস্তুত করা হয়।

7. কাঁসা (Bell-Metal)

তামা ও টিন—4 ভাগ : 1 ভাগ—এই অনুপাতে মিশাইলে কাঁসা প্রস্তুত হয়। কাঁসার পাত্রে আঘাত করিলে জোরালো শব্দ হয় বলিয়া ঘণ্টা তৈয়ারী করার জন্য কাঁসা বিশেষ উপযোগী এবং এই জন্য কাঁসার ইংরাজী নাম 'বেল মেটাল' বা ঘণ্টাধাতু। বাসনপত্র তৈয়ারীর জন্য কাঁসার ব্যবহার আমাদের দেশে খুবই প্রাচীন কাল হইতে প্রচলিত। শতকরা 90 ভাগ তামা ও 10 ভাগ টিন মিশাইলে **ব্রোঞ্জ** নামক সংকর ধাতু পাওয়া যায়। নানাপ্রকার তৈজসপত্র ও বিশেষভাবে মূর্তি প্রস্তুত করার জন্য ব্রোঞ্জ ব্যবহৃত হয়। ইহাও একপ্রকার কাঁসা। সস্তা দামের কাঁসায় তামা এবং টিনের সহিত দস্তা মিশানো থাকে। এই তিনটি ধাতুর মধ্যে টিনের দাম সর্বাপেক্ষা বেশী।

অনুশীলনী

1 আমাদের সাধারণ ব্যবহৃত ধাতুগুলির উৎপত্তি স্থান কোথায়? লোহা, তামা, অ্যালুমিনিয়াম ও দস্তার উৎপত্তি সম্বন্ধে যাহা জান লিখ। খনিজ ও আকরিক (mineral and ore) এই দুইটি কথার পার্থক্য বুঝাইয়া দাও।

2. অ্যালুমিনিয়াম উহার অক্সাইড রূপে খনিতে পাওয়া যায়, উহা হইতে কি উপায়ে অ্যালুমিনিয়াম পাওয়া যাইতে পারে, লিখ। কয়েকটি সালফাইড আকরিকের নাম কর।

3. লোহার উৎপাদন প্রণালী বর্ণনা কর এবং ছবির সাহায্যে ব্লাস্ট-ফারনেসের ব্যবহার বুঝাইয়া দাও। লোহাকে সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় ধাতু বলা হয় কেন?

4. তড়িৎ-বিশ্লেষণ কাহাকে বলে? তড়িৎ-বিশ্লেষণের সাহায্যে ধাতুর প্রস্তুত ও শোধনের উদাহরণ দাও। দস্তা ও অ্যালুমিনিয়ামের কি কি মিল আছে এবং কোথায় অমিল আছে লেখ।

5. তামা, অ্যালুমিনিয়াম ও দস্তার ব্যবহার সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

6. স্টীল (বা ইস্পাত) কাহাকে বলে? কাষ্ট আয়রন হইতে ইস্পাত প্রস্তুত করিবার পদ্ধতি বর্ণনা কর। লোহার বিভিন্নরূপ সম্বন্ধে যাহা জান লিখ। নরম লোহা এবং ইস্পাতে পার্থক্য কি? স্টীলের ব্যবহার সম্বন্ধে আলোচনা কর।

7 পিতল ও কাঁসাকে সংকর ধাতু বলা হয় কেন? কি প্রকারে কাঁসা প্রস্তুত করা হয়? ব্রোঞ্জ কাহাকে বলে? পিতল ও কাঁসার ব্যবহার সম্বন্ধে আলোচনা কর।

সংক্ষিপ্ত উত্তরের জন্য বিষয়মুখী Objective Type প্রশ্ন

১। উত্তরগুলির মধ্যে কোন্‌টি সত্য বল :—

(ক) প্রাচুর্য হিসাবে পৃথিবীর মাটিতে সর্বাপেক্ষা বেশী আছে—ধাতু।

(i) লোহা,

(ii) অ্যালুমিনিয়াম,

(iii) তামা,

(খ) অ্যালুমিনিয়াম প্রস্তুত হয় উহার অকসাইডকে —।

(i) তাপে বিশ্লিষ্ট করিয়া,

(ii) কয়লার দ্বারা বিজারিত করিয়া,

(iii) বিদ্যুৎ-প্রবাহে বিশ্লেষণ করিয়া।

(গ) স্টীল —।

(i) এক প্রকার আকরিক........

(ii) একটি সংকর ধাতু.........

(iii) একটি বিশুদ্ধ ধাতু.........

(ঘ) লোহার কার্বনের অংশ বেশী থাকিলে উহা—।

(i) নরম হয়,

(ii) মজবুত হয়,

(iii) ভঙ্গুর হয়।

২। ডানে লিখিত ধাতুগুলির কোন্‌টি বামের আকরিকগুলির কোন্‌টি হইতে প্রস্তুত হয় বল :

(i) বক্সাইট	(i) লোহা
(ii) ক্যালেরাইট	(ii) তামা
(iii) হিমাটাইট	(iii) দস্তা
(iv) ক্যালকো পিরাইটস	(iv) অ্যালুমিনিয়াম

৩। **নিম্নলিখিত ধাতুগুলি পাওয়া — (ক) অক্সাইড রূপে সালফাইড রূপে। কোন্‌টি কিরূপে বল :**

(i) অ্যালুমিনিয়াম— ।

(ii) লোহা ।

(iii) দস্তা — ।

(iv) তামা — ।

৪। **শূন্যস্থান পূর্ণ কর :—**

(i) লোহার আকরিক উহার অক্সাইড। — দ্বারা উহাকে — নামক চুল্লীতে — করিলে গলিত — পাওয়া যায়।

(ii) বাল্‌তি — পাতে প্রস্তুত, উহার উপর - প্রলেপ থাকে বলিয়া উহাতে — ধরে না।

(iii) লোহার সহিত — থাকিলে রেল-স্টীল এবং — থাকিলে মরিচাহীন স্টীল প্রস্তুত হয়।

(iv) শতকরা — ভাগ তামার সহিত — মিশ্রিত থাকিলে উহাকে ব্রোঞ্জ বলে।

(v) কাঁসা প্রস্তুত হয় — তামা ও — টিন এই অনুপাতে মিশাইলে।

(vi) সস্তা দামের কাঁসায় — এবং — সহিত — মিশানো থাকে।

৫। **'হাঁ' অথবা 'না' লিখিয়া উত্তর দাও :—**

(i) বিস্কুটের টিন, টিন দ্বারা প্রস্তুত নহে, লোহার পাতে প্রস্তুত…… .. ।

(ii) ঘরের ছাউনির টিনে টিন নাই…………………………… ।

(iii) বৈদ্যুতিক তার প্রস্তুত করিতে বিশুদ্ধ তামা লাগে ……….. … ।

(iv) কাউপার স্টোভে লোহা প্রস্তুত হয়…………………………… ।

(v) বক্সাইটকে কয়লার দ্বারা বিজারিত করা হয় না ………. ।

(vi) বাল্‌তি দস্তার প্রস্তুত… . … . … . .. . … ।

(vii) ইস্পাত একটি বিশুদ্ধ ধাতু .. .. …. … ……. .. ।

(viii) কাঁসা একটি সংকর ধাতু ….. .. .. ………….. . . … …. ।

৪

জীবজগতের কথা
Living Beings

যে পদার্থ সচেতন, তাহাকে আমরা জীব বলি। জীব দুই প্রকারের হইতে পারে,—উদ্ভিদ্ ও প্রাণী। জীবমাত্রেরই একটি স্বতন্ত্র সীমাবদ্ধ দেহ আছে, এবং ঐ দেহের পুষ্টির জন্য উহার আহার করিবার প্রয়োজন হয়। মৃত্যু ঘটিলে জীব মাত্রেই জড় পদার্থে পরিণত হয়। আহার ছাড়াও জীবের আর একটি লক্ষণ বংশরক্ষার প্রবৃত্তি। প্রত্যেকটি জীবদেহ পরিপুষ্ট হইলে যথাসময়ে উহার দেহ হইতে নূতন জীবদেহের জন্ম হয়।

পণ্ডিতগণ অনুমান করেন, পৃথিবীর প্রথম বয়সে জীবদেহ এখনকার মত এত জটিল ছিল না। সেদিনের উদ্ভিদের দেহে শিকড় কাণ্ড শাখা পাতা ফুল ফল বীজ প্রভৃতি জন্মিত না, আবার প্রাণি-দেহেও নাক মুখ চোখ হৃৎপিণ্ড ফুসফুস প্রভৃতি এত সব দেহযন্ত্র ছিল না। এক সময়ে সমস্ত জীবই হয়ত এককোষী ছিল অর্থাৎ উহাদের দেহ একটিমাত্র দেহকোষ (cell) দ্বারা গঠিত ছিল। কালক্রমে উহাদেরই একটি শাখা বহুকোষী হইয়া ক্রমে পত্র ফুল ফল বিস্তার করিয়া বৃক্ষে পরিণত হইয়াছে এবং অপর একটি শাখা নানাপ্রকার বহুকোষী প্রাণীতে রূপান্তরিত হইয়া অবশেষে মনুষ্যদেহে পৌঁছিয়াছে।

এখানে এমন কয়েকটি জীবের আলোচনা করা হইল যাহাদের দেহের গঠন অপেক্ষাকৃত সরল।

1. অ্যামিবা (Amoeba)

এই পৃথিবীর জলে, মাটিতে ও বায়ুমণ্ডলে এমন লক্ষ লক্ষ জীবাণু সর্বদাই ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, যাহাদিগকে খালি চোখে দেখা যায় না বলিয়া আমরা তাহাদের কোন খবর রাখি না। খালি চোখে অদৃশ্য অতি ক্ষুদ্র এককোষী প্রাণীদের সাধারণ নাম **প্রোটোজোয়া** (protozoa)। অ্যামিবা এই

ফোঁটা জল লইয়া অণুবীক্ষণের নীচে পরীক্ষা করিলে অ্যামিবা ও উহার দেহ গঠন ও জীবনযাত্রা সহজেই জানিতে পারা যায়। ইহার দেহে হাত পা মুখ চোখ কিছুই নাই। শুধু এক বিন্দু জেলির মত থলথলে পদার্থ দ্বারা ইহার দেহ গঠিত। এই থলথলে বস্তুটিকে **প্রোটোপ্লাজম** (protoplasm) বলে। সকল জীবদেহেরই ইহা মৌলিক উপাদান। অ্যামিবা এত ধীরে ধীরে চলাফেরা করে যে অণুবীক্ষণের নীচেই ইহার অঙ্গ সঞ্চালন, খাদ্যগ্রহণ ও পরিপাক, নিজের দেহ হইতে নূতন অ্যামিবার জন্মদান, এই সকল পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাইবে।

অ্যামিবার দেহ প্রোটোপ্লাজমে পরিপূর্ণ। দেহকোষের এই প্রোটোপ্লাজম **সাইটোপ্লাজম ও নিউক্লিয়াস,** এই দুইটি অংশে বিভক্ত। দেহটিকে ঘিরিয়া একটি সূক্ষ্ম পরদা (plasma membrane) আছে, ইহার মধ্যে দিয়া কোন তরল পদার্থ চুয়াইয়া বাহিরে আসিতে পারে অথবা বাহির হইতে দেহকোষের মধ্যে যাইতে পারে। যখন তখন অ্যামিবা আকার বদলায় এবং প্রয়োজন হইলে ইহার দেহ হইতে হাত পায়ের মত অংশ বাহির করিয়া চলাফেরা করে, অথবা কোন খাদ্যবস্তুর দিকে অগ্রসর হয়। প্রয়োজন মিটিয়া গেলে ঐ সকল হাত পা (pseudopoda-সিউডোপোডা) আবার দেহের সহিত মিলাইয়া যায়। দেহের মধ্যে কোন স্থানে অপেক্ষাকৃত অনচ্ছ গোলাকার একটি অংশ আছে,
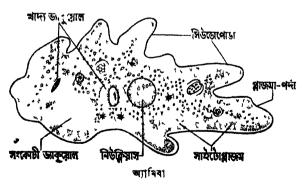
অ্যামিবা

উহাই অ্যামিবার **নিউক্লিয়াস** (nucleus)। এই নিউক্লিয়াসটি অ্যামিবার দেহ কোষের প্রাণকেন্দ্র। শক্তিশালী অণুবীক্ষণ দ্বারা পরীক্ষা করিলে এই নিউক্লিয়াসের মধ্যে সরু সরু সূতার মত আরো ক্ষুদ্র নানা প্রকার অংশ দেখিতে

পাওয়া যায়। নিউক্লিয়াস ছাড়াও অ্যামিবার দেহকোষের মধ্যে কয়েকটি ছোটবড় বুদ্বুদের মত অংশ চোখে পড়ে। এগুলির সাধারণ নাম **ভ্যাকুয়োল** (vacuole)। উহাদের মধ্যে একটি ভ্যাকুয়োল আকারে অপেক্ষাকৃত বড় থাকে, উহার নাম **সংকোচী ভ্যাকুয়োল** (contractile vacuole)। দেহের দূষিত অংশ ও অতিরিক্ত জল ঐ ভ্যাকুয়োলে সঞ্চিত হয় এবং চাপ বাড়িলে প্রাচীর ভেদ করিয়া ভ্যাকুয়োলটি বাহির হইয়া যায়। তখন দেহের অন্যত্র আর একটি ভ্যাকুয়োল ঐ একই উদ্দেশ্যে গড়িয়া উঠে।

অ্যামিবার খাদ্যগ্রহণ খুবই আশ্চর্যজনক। খাদ্যকণা কোন জীবাণুর কাছাকাছি থাকিলে অ্যামিবা উহার দিকে নকল হাত পা বাহির করিয়া উহাকে ঘিরিয়া ফেলে এবং ক্রমে একটি খাদ্য-ভ্যাকুয়োলের মধ্যে উহা জমাইয়া রাখে।

অ্যামিবার খাদ্য-গ্রহণ প্রক্রিয়ার বিভিন্ন পর্যায়
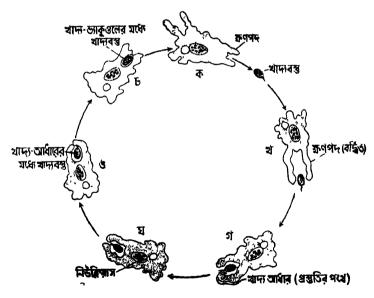
ইহার পর ধীরে ধীরে দেহের সাইটোপ্লাজম হইতে হজম করিবার রস বাহির হইয়া খাদ্যপদার্থের সারাংশকে শরীরে গ্রহণ করে এবং অকেজো অংশ শরীর হইতে বাহির করিয়া দেয়। শ্বাসকার্যে অ্যামিবা সর্বাঙ্গ দিয়া তাহার

প্রয়োজনীয় অক্সিজেন গ্রহণ করে এবং শরীরের মধ্যে উৎপন্ন কার্বন ডাই-অক্সাইড প্লাজমা পর্দা ভেদ করিয়া বাহির হইয়া যায়। কিছু কার্বন ডাই-অক্সাইড সংকোচী ভ্যাকুয়োলের মাধ্যমেও বর্জিত হয়।
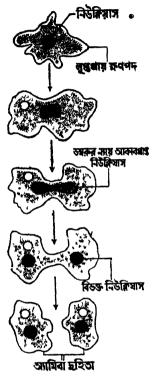
অ্যামিবার বংশ রক্ষা হয় নিজের দেহকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়া। দেহ পরিপুষ্ট হইলে এক সময়ে ভিতরের নিউ-ক্লিয়াসটি লম্বা হইতে থাকে এবং ক্রমে দেখিতে একটি ডম্বরুর মত হয়। তারও পরে উহা দুইটি পৃথক্ নিউক্লিয়াসে বিভক্ত হইয়া যায় এবং তখন দুইটি অ্যামিবার দেহ পৃথক্ হইয়া যায়। এই দ্বিভাজন ক্রিয়াকে যুগ্ম বিভাজন (binary fission) বলে। ইহাদের প্রত্যেকটি অ্যামিবা আবার পুষ্ট হইয়া দুইটি অ্যামিবার জন্ম দেয় এবং এই প্রক্রিয়া বরাবর চলিতে থাকে। অবস্থা অনুকূল থাকিলে এই হিসাবে প্রত্যেকটি অ্যামিবাকেই অমর বলা চলে। জন্ম হইতে কোষ বিভাজনে পৌছিতে অ্যামিবার প্রায় তিন মাস সময় লাগে।

অ্যামিবার যুগ্ম বিভাজন

খাদ্য ও জলের অভাবে প্রতিকূল অবস্থায় সৃষ্টি হইলে অ্যামিবা তাহার চারিদিকে একটি আবরণীর সৃষ্টি করিয়া নিশ্চল পড়িয়া থাকে এবং তখন উহার নিউক্লিয়াসটি অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নিউক্লিয়াসে বিভক্ত হইতে থাকে। প্রত্যেকটি খণ্ডিত অংশের চারিপাশে সাইটোপ্লাজমের একটি আবরণী থাকে। এইরূপ খণ্ডিত অংশগুলিকে **স্পোর** (spore) বলা হয়। অবস্থা অনুকূল হইলে এই স্পোরগুলি আবরণী ভেদ করিয়া আসিয়া আবার এক একটি অ্যামিবায় পরিণত হয়।

অ্যামিবা নানাপ্রকারের হইতে পারে। এখানে যে অ্যামিবা বর্ণিত হইল তাহার নাম **অ্যামিবা প্রোটিয়াস** (amoeba proteus)। বেশ বড়

আকারের হইলে খালি চোখে ইহা একটি সাদা বিন্দুর মত দেখায় এবং দেহ বিস্তৃত থাকিলে উহার ব্যাস 0·01 ইঞ্চি হইতে পারে। আমাদের পৌষ্টিক নালীতে (alimentary canal) এক প্রকার অ্যামিবা পরভোজীরূপে বাস করিয়া ও বংশ বিস্তার করিয়া আমাশয় রোগের সৃষ্টি করে। ঐ অ্যামিবার নাম **এন্ট্যামিবা** (entamoeba)।

2. স্পাইরোগাইরা (Spirogyra)

সবুজ রংয়ের সরু সরু সূতার মত এক প্রকার **শেওলা** (alga = অ্যাল্‌জা) একসঙ্গে অনেকগুলি জট-পাকানো অবস্থায় পুকুরে বা যে কোন স্রোতহীন জলাশয়ে ভাসিয়া বেড়াইতে দেখা যায়। এই শেওলার নাম স্পাইরোগাইরা (spirogyra)। উদ্ভিদ হইলেও ইহাদের দেহে মূল, কাণ্ড, শাখা পাতা প্রভৃতি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নাই বলিয়া ইহাদিগকে **সমাঙ্গী উদ্ভিদ্** (thallophyta) বলে। শেওলা (বহুবচন algæ = অ্যালজি) ছাড়াও আর এক প্রকার সমাঙ্গী উদ্ভিদের কথা আমাদের জানা আছে, উহারা ছত্রাক (fungus = ফাংগাস) জাতীয়।

স্পাইরোগাইরা

স্পাইরোগাইরার রং সবুজ। সবুজ ক্লোরোফিল (chlorophyll) আছে বলিয়া ইহা সূর্যালোকে বায়ু ও জল হইতে আপনার দেহে খাদ্য উৎপাদন করিতে পারে। একটি স্পাইরোগাইরা লইয়া অণুবীক্ষণের নীচে পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে ইহার আগা অথবা গোড়া বলিয়া কিছুই নাই, বহিরাকৃতি নলখাগড়ার কয়েকটি পাবের সমষ্টির মত। ঐ পারগুলি স্পাইরোগাইরার এক একটি কোষ, এবং এইরূপ কয়েকটি কোষ লম্বালম্বি থাকিয়া দেখিতে সূতার মত হইয়াছে। নলাকৃতি এই কোষগুলির প্রাচীর সেলুলোজ ও পেকটিন নামক পদার্থ দ্বারা
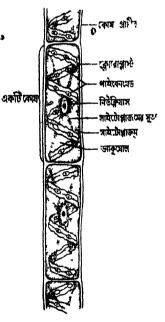
গঠিত। জলে ভিজিয়া পেকটিন জেলির মত পিচ্ছিল হয়, শুকাইলে শক্ত হইয়া যায়। কোষের ভিতরের গাঁয়ে ঘুরিয়া ঘুরিয়া একটি বা একাধিক ফিতার মত ক্লোরোপ্লাস্ট কোষের সাইটোপ্লাজমের মধ্যে সাজানো—দেখিতে ঘোরানো

দুইটি শেওলা, সংযোগ নল, গ্যামেট ও জাইগোস্পোর
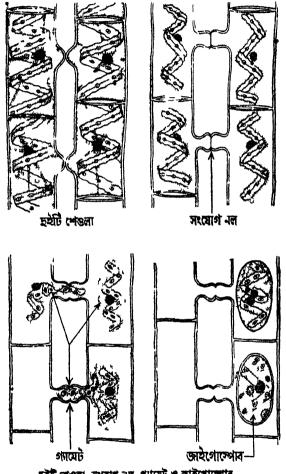
সিঁড়ির মত। এইজন্যই এই শেওলার নাম স্পাইরোগাইরা। ক্লোরোপ্লাস্টের গায়ে ছোট ছোট দানার মত বস্তু দেখা যায়, উহাদিগকে **পাইরেনয়েড** (pyrenoids) বলে। পাইরেনয়েডের উদ্ভিদের উৎপন্ন খাদ্য স্টার্চ সঞ্চিত

থাকে। কোষের মাঝামাঝি জায়গায় উহার নিউক্লিয়াস চারিদিক হইতে কয়েকটি সাইটোপ্লাজমের সূতা দ্বারা ঝুলানো থাকে। কোষের মধ্যে একটি বড় **ভ্যাকুয়োল** (vacuole) দেখিতে পাওয়া যায়।

জনন (Reproduction) ঃ

স্পাইরোগাইরার বংশবিস্তার হয় যৌন পদ্ধতিতে। দুইটি শেওলা পাশাপাশি আসিলে কোষ প্রাচীরের স্পর্শবিন্দুগুলি একটু ফুলিয়া উঠিয়া পরস্পরকে দূরে সরাইয়া দেয় এবং ক্রমে ঐ স্ফীত স্থানের কোষ-প্রাচীর গলিয়া গেলে উভয় শেওলার কোষে কোষে কতকগুলি **সংযোগ নল** (conjugation tubes) উৎপন্ন হয়। দেখিতে অনেকটা মইয়ের মত বলিয়া এই সংযোগকে সোপানাকার সংযোগ (scalariform conjugation) বলা হয়। সংযোগ নল গড়িয়া ওঠার সঙ্গে সঙ্গে উভয় দিকের কোষের প্রোটোপ্লাজম সংকুচিত হইয়া বর্তুলাকার ধারণ করে। ইহাদিগকে জননকোষ বা **গ্যামেট** (gamete) বলে। অতঃপর ঐ গ্যামেটগুলি সংযোগ নলের পথে এক শেওলার-দেহ হইতে অপর শেওলার দেহে প্রবেশ করে এবং উভয় গ্যামেট মিলিয়া একটি **জাইগোটে** (zygote) পরিণত হয়। গ্যামেটগুলির গতি একমুখী অর্থাৎ একটি শেওলার কোষে কোষে জাইগোট উৎপন্ন হয় এবং অপর শেওলার প্রায় সকল কোষগুলিই খালি হইয়া যায়। উভয় শেওলার গ্যামেটগুলি দেখিতে একই রকম বলিয়া উহাদিগকে সমগ্যামেট বা **আইসোগ্যামেট** (isogamete) বলে। চলন্ত গ্যামেটগুলিকে **পুং-গ্যামেট** (male gamete) এবং অপর দিকের স্থির গ্যামেটগুলিকে **স্ত্রী-গ্যামেট** (female gamete) বলা হয়। উৎপন্ন জাইগোট উহার চারিপাশে সেলুলোজের একটি মোটা আবরণী প্রস্তুত করে। এইরূপ আবৃত জাইগোটের নাম **জাইগোস্পোর** (zygospore)।

কোন কোন স্পাইরোগাইরা নিজ দেহেই পাশাপাশি কোষের মধ্যে গ্যামেট উৎপাদন করে। এক প্রান্ত হইতে গণনা করিলে প্রত্যেক জোড়া কোষের মাঝখানকার কোষপ্রাচীর বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় এবং গ্যামেট প্রথম কোষ হইতে দ্বিতীয় কোষে, তৃতীয় কোষ হইতে চতুর্থ কোষে, এই নিয়মে পর্যায়ক্রমে জোড়ায় জোড়ায় মিলিত হইয়া জাইগোট উৎপন্ন করে। এইরূপ সংযোগকে

পার্শ্বীয় সংযোগ (lateral conjugation) বলে। ইহাতে বিজোড় কোষগুলি শূন্য হইয়া যায় এবং জোড় সংখ্যার কোষগুলিতে একটি করিয়া জাইগোস্পোর গড়িয়া উঠে। এ ক্ষেত্রেও চলন্ত গ্যামেটটিকে পুং-গ্যামেট ও স্থির গ্যামেটটিকে স্ত্রী-গ্যামেট বলা হয়।

স্পাইরোগাইরার পার্শ্বীয় সংযোগ জাইগোস্পোরের অঙ্কুরোদ্গম
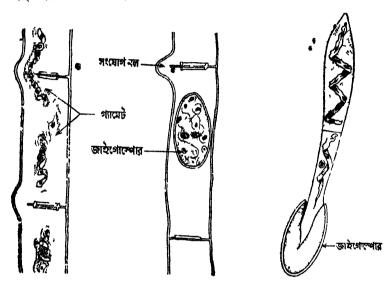
জাইগোস্পোরে যে দুইটি নিউক্লিয়াস থাকে উহারা মিলিত হইয়া এক হইয়া গেলে জাইগোস্পোরগুলি শেওলা-কোষ হইতে বিচ্যুত হইয়া জলাশয়ের তলায় পড়ে। কিছুদিন পরে জাইগোস্পোরের প্রাচীর ফাটিয়া গিয়া ভিতর হইতে একটি নলের মত অঙ্কুর বাহির হইয়া আসে। অঙ্কুরের মধ্যে নবজাত কোষের প্যাঁচানো (spiral) ক্লোরোপ্লাস্ট দেখিতে পাওয়া যায়। অঙ্কুরটি জলের উপর ভাসিয়া উঠে এবং দৈর্ঘ্যের দিকে উহার কোষবিভাজন চলিতে চলিতে এক সময়ে উহা পূর্ণাঙ্গ স্পাইরোগাইরায় পরিণত হয়।

3 ঈস্ট (Yeast)

পূর্বে বলা হইয়াছে উদ্ভিদ্‌জগতে মূল কাণ্ড-পত্রহীন থ্যালোফাইটা দুইটি প্রশাখায় বিভক্ত—

(ক) **শেওলা** বা **অ্যালজি** (algæ , একবচন অ্যালজা—alga) ।

(খ) **ছত্রাক** বা **ফাংগাই** (fungi ; একবচন ফাংগাস—fungus)

অ্যাল্‌জির গায়ের রং সবুজ। ক্লোরোফিল থাকায় অ্যালজি আপন দেহে খাদ্য প্রস্তুত করিতে পারে। পক্ষান্তরে **ফাংগাসের দেহে ক্লোরোফিল নাই**। কাজেই অপরের দেহ হইতে অথবা কোন পচনশীল পদার্থ হইতে উহাকে খাদ্য সংগ্রহ করিতে হয়। রোগের জীবাণু ব্যাকটিরিয়া মাত্রেই এই ফাংগাস বা ছত্রাক জাতীয়। অ্যামিবা যেমন একপ্রকার এককোষী প্রাণী, ঈস্টও তেমনি একপ্রকার এক-কোষী ছত্রাক-জাতীয় উদ্ভিদ্‌।

সাইটোপ্লাজম
নিউক্লিওলাস
কোষ-প্রাচীর
ক্রোমাটিন-জালক
নিউক্লিয় ভ্যাকুয়োল
গ্লাইকোজেনকণা
প্রোটিনকণা

ঈস্ট

তালের রস, খেজুরের রস, নানা প্রকার মধু ও বিভিন্ন প্রকার মিষ্টদ্রব্যে ঈস্ট জন্মে ও সহজেই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। স্টার্চ-জাতীয় অথবা শর্করা-জাতীয় পদার্থের সহিত ঈস্ট মিশিলে মদ জাতীয় বস্তু (alcohol) উৎপন্ন হয়। গুড়ের রস ঈস্ট দ্বারা পচাইয়া (fermentation) স্পিরিট উৎপাদন করা হয়।

অণুবীক্ষণের নীচে নিরীক্ষা করিলে দেখা যায় ঈস্ট **এককোষী**। কোষটি গোলাকার, কোষ ঘিরিয়া কোন জড় পদার্থের একটি পাতলা আবরণ (সম্ভবত চিটিনের—chitin)। ভিতরে সাইটোপ্লাজম, মাঝখানে বিশেষ গড়নের একটি
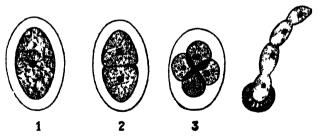
ঈস্ট কোষ ও স্পোরের উৎপত্তি স্পোরের অঙ্কুরোদ্গম

নিউক্লিয়াস রহিয়াছে। একটি নিউক্লিওলাস, একটি বড় ভ্যাকুয়োল ও তাহার মধ্যে ক্রোম্যাটিন নামক পদার্থের একটি জালক লইয়া ঈস্টের নিউক্লিয়াস গঠিত। সাইটোপ্লাজমের মধ্যে প্রোটিন ও গ্লাইকোজেনের কণা দেখিতে পাওয়া যায়।

জনন (Reproduction) :

আপনার অঙ্গ হইতে মুকুল বা **কোরক** (bud) গজাইয়া দেহবৃদ্ধি করা অথবা বংশরক্ষা করা (vegetative reproduction) উদ্ভিদের একটি সাধারণ ধর্ম। একটি ঈস্ট-কোষ আপনার দেহ হইতে একটি কোরক বাহির
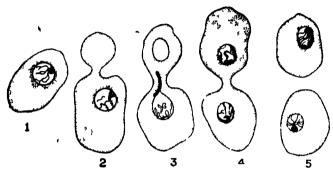
ঈস্টের কোরকোদ্গম

করিয়া দিলে উহা ক্রমে বড় হইতে থাকে এবং ভিতরের নিউক্লিয়াসটিও দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া এক ভাগ ঐ নূতন কোরকের মধ্যে চলিয়া যায়। তারপর কোষদ্বয়ের সংযোগস্থল ক্রমে সরু হইয়া একসময়ে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। কখনো বা বিচ্ছিন্ন না হইয়া অনেকগুলি কোরক একসঙ্গে জুড়িয়া থাকে।
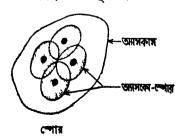
অবস্থা প্রতিকূল হইলে অথবা খাদ্যাভাব ঘটিলে ঈস্ট কোষ হইতে কোরক বাহির না হইয়া কোষটি আকারে বর্ধিত হয় এবং উহার মধ্যে সাইটোপ্লাজমে আবৃত কয়েকটি **স্পোর** গড়িয়া উঠে। বর্ধিত কোষটির নাম **অ্যাসকাস** (ascus) এবং স্পোরগুলির নাম **অ্যাসকোস্পোর** (ascospore)।

স্পোর

পরে অ্যাসকাসের প্রাচীর ভাঙিয়া গিয়া স্পোরগুলি বাহির হইয়া পড়ে ও অনুকূল মাধ্যমে কোরক গজাইয়া বংশবৃদ্ধি চলিতে থাকে।

ঈস্টের ব্যবহার ঃ

ধান, যব, আলু প্রভৃতি স্টার্চ-প্রধান পদার্থ অথবা তালের রস প্রভৃতি শর্করা-প্রধান পদার্থ হইতে ঈস্টের সাহায্যে অ্যালকোহল (স্পিরিট) প্রস্তুত হয়। আক, তাল, খেজুর প্রভৃতির রস হইতে চিনি প্রস্তুত হইবার পর যাহা অবশিষ্ট পড়িয়া থাকে তাহাকে **গুড়** (molasses) বলে। গুড়ের জলীয় দ্রবণের সহিত উপযুক্ত পরিমাণ ঈস্ট মিশাইয়া যদি উহা আটকা পাত্রে দুই-তিন দিন রাখিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে ঐ রস ফুলিয়া ফাঁপিয়া উঠে এবং প্রচুর পরিমাণে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস বাহির হইতে থাকে। ঈস্টের মধ্যে এমন কয়েকটি এঞ্জাইম (enzymes) আছে যাহা শর্করাকে অ্যালকোহল এবং কার্বন ডাই-অক্সাইডে বিশ্লিষ্ট করিয়া দেয়।

চিনি + ঈষ্ট ——→ অ্যালকোহল + কার্বন ডাই-অক্সাইড

এই রাসায়নিক পরিবর্তনকে **ফারমেণ্টেশন** (fermentation) বলে। এই পরিবর্তন সম্পূর্ণ হইয়া গেলে জলীয় দ্রবণ হইতে আংশিক পাতন প্রণালীতে (fractional distillation) অ্যালকোহল (alcohol, ethyl alcohol) এবং জল পৃথক্ করিয়া ফেলা হয়।

ঈস্টের মধ্যে নানাপ্রকার হজমী এঞ্জাইম, ভিটামিন, প্রোটিন থাকাব জন্য ইহা পথ্য ও ঔষধ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। গুঁড়ার আকারে অথবা ঘন লেই-রূপে ইহা বিক্রয় হয়। ইহা দেখিতে হরিদ্রাভ।

4. **ফার্ন** (Fern)

যে সকল অপুষ্পক উদ্ভিদের দেহে মূল, কাণ্ড ও পাতা সুস্পষ্ট তাহাদিগকে **টেরিডোফাইটা** (pteridophyta) বলে। সাধারণ ফার্ন বা ঢেঁকিশাক এই শ্রেণীর উদ্ভিদ। বাংলাদেশের নানা স্থানে জংলা জায়গার ভিজামাটিতে ইহা জন্মিতে দেখা যায়। ইহার কাণ্ড **রাইজোম** (rhizome) জাতীয় বলিয়া ইহা মাটিতে লতাইয়া চলে এবং উহা হইতে নীচের দিকে শিকড় ও উপর দিকে পাতা গজায়। পাতা দেখিতে প্রথমে সাপের ফণার মত (frond) থাকে, পরে বড় হইলে বহুপক্ষযুক্ত যৌগিক পত্রের আকার ধারণ করে।

জনন (Reproduction) ঃ

ফার্নের জননপদ্ধতি বিচিত্র। একটি পরিণত পাতা লইয়া উল্টাইয়া উহার নীচের দিক পরীক্ষা করিলে পাতার শিরার উপরে ছোট ছোট বাদামী

ফার্ন গাছ

রংয়ের সারি সারি ফুটকি দেখিতে পাওয়া যায়। উহাদিগকে **সোরাই** (sori , একবচন—সোরাস্ sorus) বলে। কোন একটি সোরাসের উপর দিয়া প্রস্থচ্ছেদ (cross section) কাটিয়া লইয়া যদি অণুবীক্ষণের নীচে নিরীক্ষা করা যায়

তাহা হইলে দেখা যাইবে পাতার উপর গুটির মত একটি **অমরা** (placenta) হইতে অনেকগুলি **রেণুস্থলী** (sporangia, একবচন—sporangium) বাহির হইয়াছে এবং উহাদিগকে আবৃত করিয়া চিনাবাদামের আধখানা খোলার মত একটি ঢাকনি রহিয়াছে (246 পৃষ্ঠার চিত্র দেখ)। এই ঢাকনিটির নাম **ইণ্ডুসিয়াম** (indusium)। রেণুস্থলীর গোড়ায় একটি ছোট বোঁটা এবং মাথার থলিটি একটি মোটা অপেক্ষাকৃত শক্ত **অ্যানুলাস** (annulus) দ্বারা আংশিক ভাবে আবৃত। বোঁটার কাছাকাছি অনাবৃত অংশটিকে **স্টোমিয়াম** (stomium) বলে। পরিপক্ক হইলে ইণ্ডুসিয়ামটি শুকাইয়া যায় এবং তখন রেণুস্থলীর স্টোমিয়াম ফাটিয়া গিয়া উহার থলি বা **ক্যাপসিউল** (capsule) হইতে **রেণু** বা **স্পোরগুলি** বাহির হইয়া পড়ে। একটি থলিতে
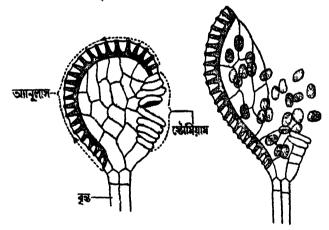
রেণুস্থলীর স্টোমিয়াম ফাটিয়া স্পোর বাহির হইতেছে

সাধারণত 16টি **রেণু মাতৃকোষ** (spore mother-cell) থাকে এবং পরিণত হইলে একটি রেণুমাতৃকোষ মায়োসিস বিভাজন প্রক্রিয়ায় (meiosis or reduction division) চারিটি করিয়া রেণু বা স্পোর উৎপন্ন করে। ইহাতে প্রতি ক্যাপসিউল হইতে 64টি রেণু বাহির হইয়া পড়ে। রেণুগুলি গাঢ় বাদামী রংয়ের এবং উহারা সমজাতীয়। এই জন্য ফার্ন গাছকে **সমরেণুপ্রসূ** (homosporous) বলা হয়।

রেণু যেখানেই পড়ুক না কেন, অনুকূল জল বাতাস পাইলে উহা অঙ্কুরিত হয়। অঙ্কুরটি প্রথমে সরু নলের মত থাকে কিন্তু ক্রমে চ্যাপ্টা হইয়া দেখিতে

পানের মত হয়। আয়তনে ইহার ব্যাস প্রায় 7/8 মিলিমিটার হয় এবং ক্লোরোফিল থাকায় ইহার রং সবুজ হয়। ইহাকে **প্রোথ্যালাস** (prothallus) বলে। প্রোথ্যালাসের নীচের পিঠে এক প্রকার নরম সরু সুতার মত অংশ বাহির হইয়া মাটি হইতে জল ও লবণ সংগ্রহ করে। এই অংশগুলিকে **রাইজয়েড** (rhizoid) বলে। ইহা ছাড়া প্রোথ্যালাসের নীচের পিঠে দুই বিভিন্ন প্রান্তে **পুংজনন কোষ** (male gametes) ও **স্ত্রীজনন কোষের** কয়েকটি (female gametes) আধার গড়িয়া উঠে। প্রথমটিকে
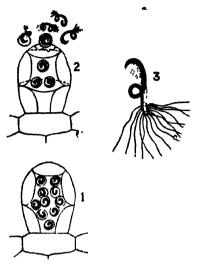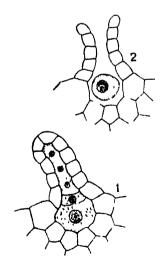
1. পুংধানী 2. পরিণত পুংজনন কোষ
3. একটি পুংকোষ

(antheridium, বহুবচন—antheridia) এবং দ্বিতীয়টিকে **স্ত্রীধানী** (archegonium, বহুবচন—archegonia) বলে। পুংধানীগুলি রাইজয়েডের মাঝে মাঝে বিক্ষিপ্ত থাকে এবং স্ত্রীধানীগুলি প্রোথ্যালাসের খাঁজের কাছাকাছি জড় হইয়া থাকে।

পুংধানী দেখিতে গোলাকার এবং প্রত্যেকটি পুংধানীর মধ্যে অনেকগুলি **পুং-মাতৃকোষ** (antherozoid mother-cells) রহিয়াছে। উহার প্রত্যেকটি কোষের মধ্যে একটি করিয়া প্যাঁচানো চেহারার কতকগুলি রোমযুক্ত পুংজনন কোষ থাকে। স্ত্রীধানী দেখিতে চুমকি ঘটির মত। সরু গলাকে

1. স্ত্রীধানী 2. ডিম্বাণুসহ স্ত্রীধানী।

উহার **গ্রীবা** (neck) এবং নীচের প্রশস্ত অংশকে উহার **অঙ্ক** বা **ভেণ্টার** (venter) বলে। ভেণ্টারের তলদেশে একটি **ডিম্বাণু** (ovum) থাকে। স্ত্রীধানী প্রোথ্যালাসের গায়ে বসানো থাকে।

পরিণত হইলে পুংধানী হইতে পুংজনন কোষগুলি বাহির হইয়া আসে এবং প্রোথ্যালাসের চারিপার্শ্বে জলের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতে থাকে। এদিকে স্ত্রীধানীর গ্রীবা খুলিয়া যায় এবং উহার ভিতর ম্যালিক অ্যাসিড প্রভৃতি পদার্থ নিঃসৃত হইয়া উহা পুংজনন কোষকে আকর্ষণ করে। ইহাতে গ্রীবার পথ বাহিয়া অনেকগুলি পুংকোষ (male gametes) ভিতরে প্রবেশ করে। কিন্তু ভেণ্টারে ডিম্বাণুটি একটিমাত্র পুংকোষ দ্বারা **নিষিক্ত** (fertilized) হয়। এইরূপে উৎপন্ন কোষটিকে **উস্পোর** (oospore) বলে। অন্য পুংকোষগুলি আপনিই বিনষ্ট হইয়া যায়। কালক্রমে উস্পোর অঙ্কুরিত হইলে ফার্নের ভ্রূণ উৎপন্ন হয় এবং প্রোথ্যালাসটি ধীরে ধীরে শুকাইয়া যায়। ভ্রূণ বর্ধিত হইয়া নূতন ফার্ন গাছে পরিণত হয়।

ফার্ণের জীবন-ইতিহাসে পর্যায় ভেদ (Alternation of generation) :

ফার্নের সমগ্র জীবন দুইটি পর্বে ভাগ করা যায়। প্রথম পর্বে উস্পোর হইতে পূর্ণাঙ্গ ফার্নের জন্ম এবং উহার পাতার সোরাসে রেণু মাতৃকোষের উৎপত্তি। ফার্নের জীবনের এই অংশে কোন যৌন-জনন প্রক্রিয়া না থাকায় ফার্ন গাছকে **রেণুধর উদ্ভিদ্** (sporophyte) বলা হয়। রেণুমাতৃকোষ (spore mother-cell) মায়োসিস প্রক্রিয়ায় ভাঙিয়া চারিটি সমধর্মী রেণুতে পরিণত হইবার পর হইতে ঐ রেণুর অঙ্কুরোদ্গম, জননকোষ সমন্বিত প্রোথ্যালাসের উৎপত্তি, পুংকোষ ও স্ত্রীকোষের মিলন এবং ফলে উস্পোরের সৃষ্টি ; ফার্ন গাছের জীবনের এই অংশে যৌন-জনন প্রক্রিয়া থাকায় প্রোথ্যালাসকে **জননকোষধর উদ্ভিদ্** (gametophyte) বলা হয়। ফার্ণ গাছের জীবনে পর্যায়ক্রমে এই দুইটি পর্ব চলিতে থাকে। ফার্ন গাছ মুখ্যত রেণুধর উদ্ভিদ্, প্রোথ্যালাসের যৌনধর্মী জীবন অপেক্ষাকৃত গৌণ ও ক্ষণস্থায়ী।

ফার্নের জীবন-ইতিহাসে পর্বায় ভেদ।

অনুশীলনী
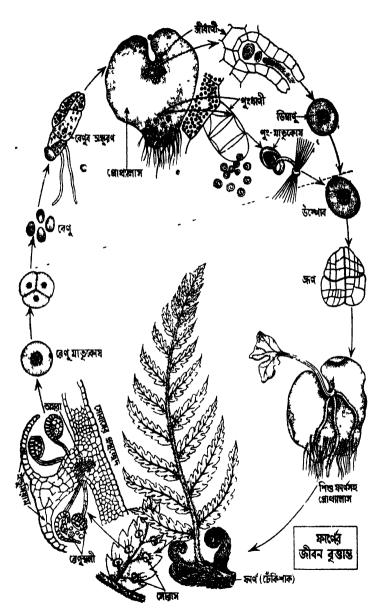
1. অ্যামিবার দেহগঠন বর্ণনা কর। সংকোচী ভ্যাকুয়োল কাহাকে বলে? অ্যামিবার খাদ্য গ্রহণ ও পরিপাক সম্বন্ধে যাহা জান লিখ?

2. অ্যামিবার সহিত ঈস্টের তুলনা কর। উহাদের জীবনে বায়ুর প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা কর। উহারা আমাদের কোন উপকারে আসে কি?

3. স্পাইরোগাইরার জীবন-বৃত্তান্ত লিখ এবং ছবির সাহায্যে উহার জনন-প্রণালী বুঝাইয়া দাও। উদ্ভিদ হিসাবে ইহার সহিত ঈস্টের পার্থক্য কোথায়?

4. ফার্ন গাছের বংশবিস্তার সম্বন্ধে যাহা জান লিখ। উস্পোর এবং জাইগোস্পোরে পার্থক্য কি? রাইজোম কাহাকে বলে?

5. টীকা লিখঃ

ফাংগাস; সোরাই, গ্যামেট, প্রোটোপ্লাজম; ভেন্টার; ফারমেন্টেশন; স্টোমিয়াম, প্রোথ্যালাস; যুগ্মবিভাজন; সংযোগ নল; রেণুধর উদ্ভিদ্।

সংক্ষিপ্ত উত্তরের জন্য বিষয়মুখী (Objective test) প্রশ্ন

1. কোন্‌টি সত্য বল।

(ক) ঈস্ট একপ্রকার (i) এক কোষী প্রাণী, (ii) ছত্রাক জাতীয় উদ্ভিদ্, (iii) জলজ শেওলা।

(খ) ফার্নের বংশবিস্তার ঘটে

(i) উহার কাণ্ড হইতে, (ii) মূল হইতে, (iii) পাতা হইতে।

2. উভয় দিকের উল্লিখিত বিষয়গুলির যোগাযোগ সাধন কর:

(ক) স্পাইরোগাইরা	(ক) রেণুধর উদ্ভিদ্
(খ) প্রোথ্যালাস	(খ) এককোষী প্রাণী
(গ) ফার্ন	(গ) সমাঙ্গী উদ্ভিদ্
(ঘ) ঈস্ট	(ঘ) জননকোষ-ধর উদ্ভিদ্
(ঙ) অ্যামিবা	(ঙ) এককোষী উদ্ভিদ্।

3. 'হাঁ' অথবা 'না' লিখিয়া উত্তর দাও:

(ক) অ্যামিবা পরভোজী উদ্ভিদ্।

(খ) স্পাইরোগাইরা ছত্রাক শ্রেণীর উদ্ভিদ্।

(গ) স্পাইরোগাইরার দেহে দুই প্রকার গ্যামেট উৎপন্ন হয়।

(ঘ) ফার্ন গাছে ফুল ফোটে না।

(ঙ) ফার্নের মূলকে রাইজোম বলে।

(চ) ঈস্ট শেওলা জাতীয় উদ্ভিদ্।

(ছ) সকল উদ্ভিদের দেহে ক্লোরোফিল আছে।

(জ ঈস্ট ও অ্যামিবা উভয়েই এককোষী জীব।

অভিব্যক্তি, বংশগতি ও অভিযোজন
Evolution, Heredity and Adaptation

1. জৈবিক অভিব্যক্তি (Organic Evolution)

বহু কোটি বৎসর পূর্বে একসময়ে এই পৃথিবীতে জীবনের চিহ্নমাত্র ছিল না, ছিল চারিদিকে বিরাট্ মহাসমুদ্রের অনন্ত জলরাশি। সেই জলে একদা কোন অজ্ঞাত আকস্মিক কারণে আদিম জীবপঙ্ক প্রোটোপ্লাজম উৎপন্ন হইয়া অসংখ্য ক্ষুদ্র জীবদেহে পরিণত হইয়াছিল। কোন কোন জীবকণিকার (organism) সবুজ ক্লোরোফিল বায়ুর কার্বন ডাই-অক্সাইড ব্যবহার করিয়া আপনার দেহ পুষ্ট করিতে লাগিল, (যেমন, অ্যালজি—algae), আবার কোন কোন জীব-কণিকা ঐ সকল ক্লোরোফিল-পুষ্ট দেহ আত্মসাৎ করিয়া জীবন ধারণ করিতে লাগিল (যেমন, অ্যামিবা—amoeba)। কালক্রমে সমস্ত সমুদ্রতলে ও পৃথিবীর স্থলভাগেও নূতন নূতন উদ্ভিদ্ ও প্রাণীর আবির্ভাব ঘটিতে লাগিল। পৃথিবীতে জীবসৃষ্টির ইহাই বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাস।

জীবজগতের সর্বপ্রধান লক্ষণ খাদ্যগ্রহণ ও বংশবিস্তার। কোন বিশেষ উদ্ভিদ্ অথবা প্রাণীর খাদ্যগ্রহণ করিয়া পুষ্টিলাভ করিবার পর উহার দেহ হইতে উহারই অনুরূপ শিশু-উদ্ভিদের অথবা শিশু-প্রাণীর উদ্ভব হয়। শিশুর দেহ পিতামাতার মত হইলেও সকল শিশুর দেহে সম্পূর্ণ সাদৃশ্য দেখা যায় না, নানা কারণে অল্পবিস্তর পার্থক্য (variation) থাকে। ঐ সকল শিশুর মধ্যে সবগুলি বাঁচিয়া থাকে না, জন্মগত খুঁত থাকিবার জন্যই হউক, অথবা অপেক্ষাকৃত প্রতিকূল পারিপার্শ্বিক অবস্থার জন্যই হউক, উহাদের মধ্যে যোগ্যতমগুলিই শেষ পর্যন্ত বাঁচিয়া যায়। জীবিত জীবগুলির মধ্যে যে বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে প্রকাশ পায়, সেই সকল বৈশিষ্ট্যই উহাদের দেহ হইতে উৎপন্ন পরবর্তী বংশে খানিকটা টিকিয়া যায়। এমনি করিয়া কোন বিশেষ জীবের দেহ হইতে উৎপন্ন সন্তানগুলি বংশ পরম্পরায় ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হইতে থাকে এবং একসময়ে অনেকগুলি নূতন লক্ষণ প্রকাশ পাইবার ফলে উহাদের রূপান্তর ঘটে এবং এক নূতন প্রজাতি (species) জন্মলাভ করে। কাহারা বাঁচিবার অধিকারী, তাহা প্রকৃতি কর্তৃক নির্বাচিত হয় বলিয়া এই নীতিকে **প্রাকৃতিক নির্বাচন**

(natural selection) বলে। দীর্ঘকালব্যাপী এই প্রকার পরিবর্তনের পথে যাহাদের যোগ্যতা কম থাকে অথবা যাহারা প্রতিকূল অবস্থার সহিত যুদ্ধে পরাজিত হয় তাহারা হয়ত একেবারে নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়। অতীত যুগের অনেক বিলুপ্ত প্রাণী পৃথিবীর পালল স্তরের (sedimentary rocks) ফাঁকে ফাঁকে তাহাদের দেহচিহ্ন অথবা দেহাবশেষ (fossils) রাখিয়া গিয়াছে, আমরা উহা আবিষ্কার করিয়া পৃথিবীর জীবজগতের ধারাবাহিক ইতিহাস রচনা করিতেছে। যে-সকল জীব জীবনযুদ্ধে টিকিয়া গেল, তাহাদের বংশধরেরা আজ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে জীবনধারণ করিতেছে। জীবজগতের এই ক্রম পরিণতিকে **জৈবিক অভিব্যক্তি** (organic evolution) বলে। আদিম জীবজগৎ হইতে যোগ্যতমের উদবর্তন (survival of the fittest) ঘটিবার ফলে বর্তমান জীবজগতের উৎপত্তি। এই মতবাদের প্রবর্তকের নাম চার্লস্ ডারউইন। যে-সকল জীব (organisms) আজ আমরা পৃথিবীতে দেখি,

টমাস হাক্সলি

চার্ল'স ডারউইন

উহার সকলগুলিই সৃষ্টির আদিতে ঈশ্বর কর্তৃক পৃথক্ পৃথক্ভাবে সৃষ্ট হইয়াছিল, ইহাই সকল দেশের প্রাচীন সাধারণ মত এবং সেই মতকে বলা হয় স্বতন্ত্র সৃষ্টির মতবাদ (theory of special creation)। ডারউইনের নূতন মতবাদ রাসেল ওয়ালেস, টমাস হাক্সলি প্রভৃতি মনীষী কর্তৃক অভ্যর্থিত হইবার পর ইংল্যাণ্ডে প্রচণ্ড বিক্ষোভের ঝড় উঠিয়াছিল। খ্রীষ্টান ধর্মযাজকগণ এই ধর্মদ্রোহী

মতের বিরুদ্ধে বৃটিশ অ্যাসোসিয়েশনের এক সভায় (1850) সমবেত হইয়াছিলেন। কথিত আছে, ঐ সভায় অক্সফোর্ডের লর্ড বিশপ ডাঃ স্যামুয়েল
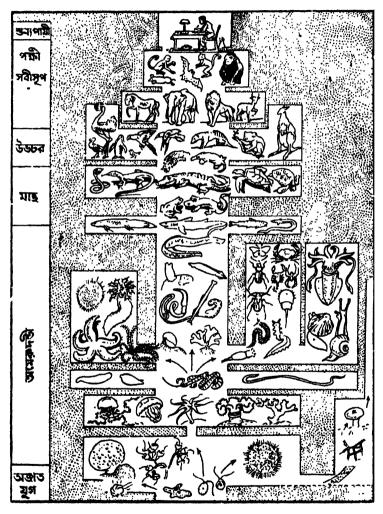
অভিব্যক্তিবাদ—নিম্নতম জীব হইতে মানবের ক্রমপরিণতির আনুমানিক কাঠামো।
বামের আয়তক্ষেত্রগুলি ক্রমবিকাশে বিভিন্ন শ্রেণীর আপেক্ষিক জীবন-কালের দৈর্ঘ্য সূচিত করে।

উইলবারফোর্স হাক্সলিকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, 'বানর (ape) ছিলেন আপনার পিতৃপুরুষ বা মাতৃপুরুষ ?" এবং হাক্সলি উত্তর দিয়াছিলেন, "বুদ্ধিমান হইয়াও

যাহারা সত্যের অপলাপ করেন, তাঁহাদের সহিত আমার সম্পর্ক থাকায় আমি লজ্জিত।” বস্তুতপক্ষে অন্যান্য ইতর প্রাণী সম্বন্ধে অভিব্যক্তিবাদ স্বীকৃত হইতে থাকিলেও সৃষ্টির সর্বশ্রেষ্ঠ জীব মানুষও (homo sapiens) ঐ সকল প্রাণী হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, ইহা প্রথমদিকে কেহই স্বীকার করিতে চাহেন নাই।

জীবজগতের এই অভিব্যক্তি কোটি কোটি বৎসর ধরিয়া এত ধীরে ধীরে চলিতে থাকে যে, দুই চারি হাজার বৎসরের ইতিহাসে সে পরিবর্তনের বিশেষ কিছু লক্ষ্য করা যায় না। অথচ মানব-সমাজের লিপিবদ্ধ ইতিহাসের বয়স চারি হাজার বৎসরের বেশী হইবে না। পৃথিবীর শিলা পরীক্ষা করিয়া অনুমান করা হয় যে, গত প্রায় একশত কোটি বৎসর ধরিয়া জীব জগতের এই ক্রম পরিবর্তন চলিতেছে। এককোষী জীবের দেহে কোন জটিলতা ছিল না। ক্রমে প্রয়োজনের তাগিদে উহা বহুকোষী হইয়াছে এবং
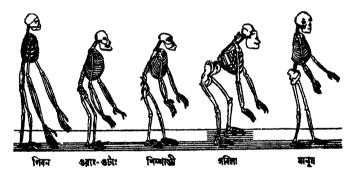
বিভিন্ন কোষ দেহের বিভিন্ন কাযের ভার লইয়াছে। ক্রমে উদর, বক্ষ প্রভৃতি গহ্বরের সৃষ্টি হইয়াছে, নানাপ্রকার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের উদ্ভব হইয়াছে, আবার কোন কোন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দীর্ঘকালের অব্যবহারে বাহ্যিকভাবে লোপ পাইয়াছে। দেহ ক্রমে জটিল হইয়াছে, এবং একসময়ে মস্তিষ্ক গড়িয়া উঠিবার ফলে জীবদেহে বিচারশক্তি (intelligence) দেখা দিয়াছে। পৃথিবীর জীবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জীব মানুষের ক্রমবিকাশও কম বিচিত্র নহে। বানর জাতীয় কোন জীব যে মানুষের পূর্বপুরুষ ছিল ইহা অনুমান করিবার কয়েকটি বিশেষ কারণ আছে। মাথার গড়ন ও উহার ভিতরকার মস্তিষ্কের আকার, নাক, কান, চক্ষু, হাত পায়ের গড়ন ও আঙ্গুলের সংখ্যা প্রভৃতি বিষয়ে বানরের সহিত মানুষের

অনেক সাদৃশ রহিয়াছে। গিবন, সিম্পাঞ্জি, ওরাংওটাং ও গরিলা, এই চারি প্রকারের লেজহীন উন্নত বানর (ape) খানিকটা খাড়া হইয়া প্রায় মানুষের মতই হাঁটিতে পারে এবং সাধারণ বানর অপেক্ষা ইহাদের মগজ (brain) অনেক উন্নত। জীব-বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করেন যে, বানর ও মানুষের আদি পুরুষ (ancestor) একই, এবং ওরাংওটাং, গরিলা প্রভৃতি বানর ক্রমবিবর্তনের ফলে মানুষে পরিণত হইয়াছে। তবে ঐ সকল বানর ও মানুষের মাঝখানকার যোগসূত্র আজিও অনাবিষ্কৃত। ইহাকে **অজ্ঞাত যোগসূত্র** (missing link) বলে। প্রাচীনতম যে-মানুষের খবর আমরা জানিতে পারিয়াছি, তাহার নাম জাভা-মানব ও পিল্টডাউন মানব। এশিয়ার জাভায় এবং ইংল্যাণ্ডের পিল্টডাউনে এই প্রাচীন (5 লক্ষ বৎসর) মানবের দেহাবশেষ পাওয়া গিয়াছে।

নিয়ানডারথ্যাল মানব
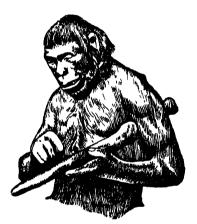
পিল্টডাউন মানব

ইহার পরবর্তী যুগের নানাপ্রকার মানুষের মধ্যে নিয়ানডারথ্যাল-মানব (Neanderthal, Germany) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহারা অস্ত্র প্রস্তুত করিতে পারিত, শব্দ উচ্চারণ করিতে পারিত এবং চামড়ার ব্যবহার জানিত বলিয়া মনে হয়। নিয়ানডারথ্যাল-মানব প্রায় এক লক্ষ বৎসর পুর্বেকার মানব। বর্তমান যুগেও অরণ্যবাসী নানাপ্রকার আদিম জড়বুদ্ধি মানব হইতে আরম্ভ করিয়া অতি উন্নত সভ্য মানব পর্যন্ত নানাপ্রকারের মানবগোষ্ঠী এই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বাস করিতেছে।

2. অভিব্যক্তির প্রমাণ (Evidences of the theory of common origin)

(ক) দৈহিক গঠনগত প্রমাণঃ ক্ষুদ্রতম এককোষী ব্যাকটিরিয়া অথবা প্রোটোজোয়ার দেহ হইতে শুরু করিয়া সকল প্রকার উদ্ভিদ্ অথবা প্রাণীর দেহে প্রোটোপ্লাজম নামক অর্ধতরল সজীব পদার্থটি বর্তমান এবং এইরূপ অনুমিত হয় যে, পৃথিবীতে জীবসৃষ্টির প্রারম্ভে কোন আকস্মিক কারণে এই প্রোটোপ্লাজম উৎপন্ন হইয়াছিল। সকল প্রকার কোষে এই পদার্থের অস্তিত্ব এবং বংশবিস্তারে কোষ বিভাজনের একই রকমের নিয়ম লক্ষ্য করিলে মনে হয় যে এই বিচিত্র জীবজগৎ একই উৎস হইতে গড়িয়া উঠিয়াছে।

সকল প্রকার মেরুদণ্ডী প্রাণীর দেহের কাঠামোর (bone-plan) মধ্যে খানিকটা সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। মেরুদণ্ডী অথবা অমেরুদণ্ডী সকল প্রকার প্রাণীর দেহেই খাদ্য গ্রহণ ও হজম করিবার যন্ত্র, রক্তসঞ্চালনের ব্যবস্থা, অনুভব করিবার শক্তি অল্পবিস্তর বর্তমান। মেরুদণ্ডীদের মধ্যে কোন কোন ক্ষেত্রে
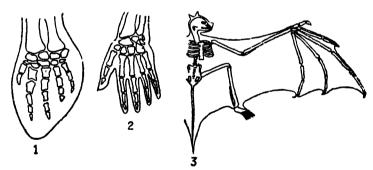
1. তিমির পাখ্না ; 2. মানুষের হাত ; 3. বাদুরের ডানা

অস্থিবিন্যাসের অদ্ভুত সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। বাদুর, তিমি ও মানুষ যথাক্রমে খেচর, জলচর ও স্থলবাসী। কিন্তু উহাদের হাতের অস্থি অনেকটা একই রকমের। বিভিন্ন পরিবেশ ও জীবনপ্রণালীর জন্য উহাদের হাতের বাহিরের আকৃতি পরিবর্তিত হইয়া নূতন আকার ধারণ করিয়াছে।

কোন কোন মেরুদণ্ডী প্রাণী সম্পূর্ণ বিভিন্ন শ্রেণীর হইলেও মায়ের পেটে থাকিবার সময় অর্থাৎ ভ্রূণাবস্থায় উহাদের আকৃতির মধ্যে এমন সাদৃশ্য থাকে

যাহা সত্যই বিস্ময়জনক। মাছ, স্যালাম্যাণ্ডার নামক উভচর, কচ্ছপ নামক সরীসৃপ, মোরগপাখী, খরগোশরূপ চতুষ্পদ স্তন্যপায়ী এবং সর্বশ্রেষ্ঠ জীব মানুষ, এই ছয় প্রকার জীবের ভ্রূণ লক্ষ্য করিলে মনে হয়, উহারা একই উৎস হইতে উদ্ভূত হইয়াছে।

ব্যাঙ উভচর জীব। প্রাণী হিসাবে ইহা মাছ ও সরীসৃপের সম্পর্ক সূচিত করে। ডিম হইতে বাহির হইয়া ইহারা মাছের মত জলে বাস করিয়া বড়
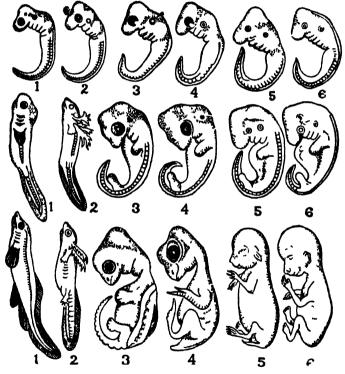
ভ্রূণ অবস্থায় বিভিন্ন প্রাণীর সাদৃশ্য অভিব্যক্তিবাদের যৌক্তিকতা প্রমাণ করে
1 মাছ, 2. স্যালামাণ্ডার, 3 কচ্ছপ, 4. মোরগ 5. খরগোশ, 6 মানুষ

হইতে থাকে। তখন ইহাদের মাছের মতই ফুল্‌কা থাকে, কিন্তু কালক্রমে ইহাদের ফুল্‌কা লোপ পায় এবং বায়ু হইতে অক্‌সিজেন গ্রহণ করিবার জন্য ইহাদের ফুসফুস গড়িয়া ওঠে। আবার এমন প্রাণীও আছে, যাহা সরীসৃপের

মত ডিম পাড়ে, কিন্তু ডিম হইতে বাহির হইয়া স্তন্যপায়ীর ন্যায় মাতৃদুগ্ধে পুষ্টিলাভ করে। ইহারা দন্তুরের মত (rodent) মাটি খুঁড়িতে পারে। ইহাদের ঠোঁট ও পা দেখিতে হাঁসের মত। অস্ট্রেলিয়ার এই স্তন্যপায়ী প্রাণী সম্পূর্ণ দুইটি ভিন্ন জাতীয় প্রাণীর মধ্যে সম্পর্ক সূচিত করে। ক্রম-বিবর্তনের ইহাও একটি প্রমাণ। ইহা প্লাটিপাস নামে পরিচিত একটি ক্রম-বিরল প্রাণী।

প্লাটিপাস

ব্যবহারেব অভাবে কোন বিশেষ অঙ্গ বাহিরে লোপ পাইয়া গেলেও বিশেষভাবে পরীক্ষা করিলে সেই অঙ্গের চিহ্ন কোন কোন প্রাণীর দেহে দেখিতে পাওয়া যায়। মানুষের মেরুদণ্ডের নিম্নপ্রান্তে যে-অনুত্রিকাস্থি (coccyx) আছে, তাহা স-লাঙ্গুল বানর জাতীয় প্রাণীর সহিত মানুষের সম্বন্ধ সূচিত করে। আমাদের ক্ষুদ্রান্ত্রেব নীচের দিকে অ্যাপেনডিক্স নামক অংশটি এখন অবলুপ্তির পথে কিন্তু অন্যান্য ইতর প্রাণীর দেহে উহা এখনও সক্রিয় রহিয়াছে। উটপাখী প্রবলবেগে দৌড়াইতে পারে এবং উহার দেহের ওজনও খুব বেশী (2-3 মণ)। দীর্ঘকাল ধরিয়া উড়িবার অভ্যাস না থাকায় ক্রমে উহার ডানা ছোট হইয়া ব্যবহারের অনুপযোগী হইয়া গিয়াছে। সাধারণ স্তন্যপায়ীর ন্যায় মাতৃগর্ভে তিমির দুই পাটি দাঁত থাকে, কিন্তু জন্মিবার পুর্বেই ঐ দাঁত নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়।
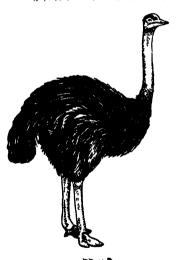
উটপাখী

(খ) **ভূতাত্ত্বিক ও ভৌগোলিক প্রমাণ:** পৃথিবীতে জলের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল জীবসৃষ্টির বহুপুর্বে। সেই যুগে প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টির ফলে ভূ-পৃষ্ঠের শিলা

ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া জলস্রোতে নিম্নভূমিতে গিয়া জমিত এবং স্তরে স্তরে পালল শিলায় (sedimentary rocks) পরিণত হইত। এই সকল শিলার বয়স জানিবার কতকগুলি বৈজ্ঞানিক উপায় আছে এবং তদনুযায়ী বিভিন্ন শিলাস্তরকে বয়স অনুযায়ী বিভিন্ন নাম দেওয়া হইয়াছে। কোন উদ্ভিদ্ অথবা প্রাণীর দেহ ঐ সকল স্তরে আটকাইয়া গেলে দেহের কঠিন অংশ তাহার ছাপ রাখিয়া যায় অথবা রূপান্তরিত অবস্থায় ঐ স্তরের মধ্যে থাকিয়া যায়। ঐরূপ দেহাংশ অথবা উহার ছাপকে ফসিল (fossil) অথবা জীবাশ্ম বলে। মাটি খুঁড়িয়া বিভিন্ন শিলাস্তরে যে সকল প্রাণী অথবা উদ্ভিদের ফসিল পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতে ঐ সকল শিলাস্তরের বয়স অনুযায়ী আমরা প্রাচীন যুগের বিভিন্ন প্রাণী অথবা উদ্ভিদের বয়স জানিতে পারিয়াছি। 200 কোটি বৎসরের প্রাচীন শিলাস্তরে কোন উদ্ভিদের বা প্রাণীর দেহাবশেষ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ইহা হইতে অনুমান করা যায় যে, ঐ সময়ে পৃথিবীতে কোন কঠিন-দেহ জীবের অস্তিত্ব ছিল না। 40 হইতে 45 কোটি বৎসরের প্রাচীন শিলাস্তরে নানা

ডিনোসার

প্রকার সামুদ্রিক অমেরুদণ্ডীর ফসিল পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে এই পৃথিবীতে পর্যায়ক্রমে মাছ, সরীসৃপ, পক্ষী ও স্তন্যপায়ী জীবের আবির্ভাব ঘটিয়াছে। মানুষের আবির্ভাব এই পৃথিবীতে দশ লক্ষ বৎসরের পূর্বে ঘটে নাই। প্রায় 10/12 কোটি বৎসর পূর্বে এই পৃথিবীতে ডিনোসার জাতীয় কতকগুলি বিরাটকায় সরীসৃপের অবির্ভাব ঘটিয়াছিল; প্রাকৃতিক পরিবর্তনের সঙ্গে ঐ সকল প্রাণী আপনাকে খাপ খাওয়াইতে পারে নাই বলিয়া কালক্রমে উহারা পৃথিবী হইতে একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

পৃথিবীর স্থলভাগে মহাদেশগুলির অবস্থান আমরা বর্তমানে যেরূপ দেখিতে পাই, কয়েক কোটি বৎসর আগে উহা ঐরূপ ছিল না। তখন অস্ট্রেলিয়ার

সহিত চীন অথবা আমেরিকার উত্তরাংশ সংযুক্ত ছিল। আবার ভারতবর্ষের সহিত আফ্রিকা একই স্থলভাগের অন্তর্গত ছিল। কালক্রমে অস্ট্রেলিয়া, আফ্রিকা প্রভৃতি ভূ পৃষ্ঠের উত্থান পতনে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাওয়ায় ক্রমবিকাশের কোন কোন ধাপের প্রাণী কোন বিশেষ স্থলভাগে রহিয়া গিয়াছে। অন্যত্র ঐরূপ প্রাণী খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। অস্ট্রেলিয়ার ক্যাঙারু এবং অপোসাম এই জাতীয় প্রাণীর উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত।

3. বংশগতি (Heredity)

কোন উদ্ভিদ বা প্রাণীর দেহ হইতে যে অপত্য (offspring) জন্মে তাহার মধ্যে ঐ বিশেষ উদ্ভিদ্ বা প্রাণীর যাবতীয় বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায় এবং অন্য কোন উদ্ভিদ বা প্রাণীর গুণ বা ধর্ম উহার মধ্যে থাকে না। কুমড়া বীজ মাটিতে পুঁতিলে যে গাছ জন্মে, তাহাতে কুমড়াই ফলে এবং সেই ফলের বীজ ঐ বীজটির প্রতিচ্ছবি (image) হইয়া থাকে। এই নীতি সকল প্রকার উদ্ভিদ, যাবতীয় কীট-পতঙ্গ, জীবজন্তু, এমন কি মানুষের ক্ষেত্রেও সত্য। একজন শ্বেতাঙ্গ ব্যক্তির অপত্য অবিকল ঐ ব্যক্তির প্রতিকৃতি হয়। তাহার নাক, মুখ, চুলের রং, দেহের দৈর্ঘ্য, সবই শ্বেতাঙ্গ-সুলভ হয়। আবার একজন কৃষ্ণকায় কোঁকড়া চুল নিগ্রোর অপত্য অবিকল উহার প্রতিরূপ হইয়া থাকে। আবার বাহিরের পারিপার্শ্বিক অবস্থা অপত্যকে খানিকটা প্রভাবান্বিত করিতেও পারে। ভাল মিষ্ট কুমড়ার বীজ খারাপ জোলো মাটিতে পুঁতিলে উৎপন্ন কুমড়া আকৃতিতে অথবা আস্বাদে বিভিন্ন হইতে পারে। একজন শ্বেতাঙ্গ দীর্ঘকাল কোন গ্রীষ্মপ্রধান দেশে বাস করিলে, তাহার অপত্যদের আকৃতি ও প্রকৃতি ক্রমে পরিবর্তিত হইতে পারে। এই প্রভাব পারিপার্শ্বিক ও বাহিক, ইহাতে অপত্যের কোন মৌলিক পার্থক্য ঘটে না। বাহিরের প্রভাবে বংশগত পার্থক্য সহজে ঘটিতে পারে না। কোন জীবদেহে যে বিশিষ্ট কোষগুলি বর্তমান তাহাই বিভক্ত হইয়া অপত্যের দেহ গড়িয়া তোলে এবং সেই কোষের মধ্যে জনকের (parent) সমস্ত বৈশিষ্ট্যগুলি অতি সূক্ষ্ম রেখায় রেখায় থাকিয়া যায়। ফলে নব গঠিত কোষগুলি জনকের কোষের অবিকল প্রতিকৃতি রূপে গড়িয়া ওঠে।

প্রজনন (Reproduction) যে-সকল ক্ষেত্রে অযৌন (asexual) হয় অর্থাৎ যে-প্রজননে পুংবীজ ও ডিম্বাণুর প্রয়োজন হয় না, সেক্ষেত্রে কোষটি (somatic cells) পরিণত অবস্থা প্রাপ্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গে কোষ বিভাগের আয়োজন চলিতে থাকে। এইরূপ বিভাজনকে মিটোসিস (mitosis) বলে। কোষের নিউক্লিয়াসে সূতার মত কতকগুলি অংশ দেখিতে পাওয়া যায়। উহাদিগকে ক্রোমোসোম (chromosome) বলে। এই ক্রোমোসোমগুলির গায়ে অতিক্ষুদ্র হাজার হাজার পুঁতির মত দানা সাজানো থাকে। ঐগুলিকে জীন (gene) বলে। জীনগুলি সংশ্লিষ্ট প্রাণী বা উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য বহন করিয়া চলে। ক্রোমোসোমের সংখ্যা কোন বিশেষ প্রাণী বা উদ্ভিদের ক্ষেত্রে একেবারেই সুনির্দিষ্ট। মিটোসিসের পর নূতন গঠিত কোষগুলি প্রাণী বা উদ্ভিদের নির্দিষ্ট ক্রোমোসোম সংখ্যা পাইয়া থাকে।

কোন জীবের বংশগত যাবতীয় ধর্ম ক্রোমোসোমের জীন কর্তৃক দেহ হইতে দেহান্তরে নীত হয়। যৌন প্রজনন কার্যে (sexual reproduction) যে-কোষগুলি (germ cell) মিলিত হয়, তাহারা সাধারণ দেহকোষ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। মানুষের এই কোষের নিউক্লিয়াসে 24 জোড়া (মোট 48টি) ক্রোমোসোম থাকে। উহার মধ্যে এক জোড়া ক্রোমোসোম লিঙ্গ নির্ধারণ (sex determination)-এর জন্য দায়ী। এইজন্য উহাদিগকে যৌন ক্রোমোসোম বলে। পুরুষের বেলায় যৌন ক্রোমোসোম দুইটি অসমান এবং উহাদিগকে X এবং Y ক্রোমোসোম বলা হয়। স্ত্রীলোকের ক্ষেত্রে যৌন ক্রোমোসোম দুইটি একই প্রকার এবং দুইটিকেই X ক্রোমোসোম বলে। পুং-বীজ (sperm অথবা male gamete) পরিণত (mature) অবস্থা প্রাপ্ত হইলে উহাতে 24 জোড়ার অর্ধেক মোট 24টি ক্রোমোসোম থাকে। ইহার মধ্যে যৌন ক্রোমোসোমটি X অথবা Y হইবে। ডিম্বাণুও (ovum অথবা female gamete) যখন পরিণত অবস্থা প্রাপ্ত হয় তখন উহাতে ঐরূপ 24টি ক্রোমোসোম থাকে। ইহার যৌন ক্রোমোসোমটি সব সময়েই X হইবে। ডিম্বাণুর সহিত পুং-বীজ মিলিত হইলে উৎপন্ন কোষ অথবা জাইগোটে (zygote) 24 জোড়া ক্রোমোসোম থাকে। এই জাইগোটই কালক্রমে মানবশিশুতে পরিণত হয়। মিলিত কোষে যৌন ক্রোমোসোম দুইটি যদি

X হয়, তবে সন্তান কন্যা, এবং যদি যৌন ক্রোমোসোম দুইটি X এবং Y হয়, তবে সন্তান পুত্র হয়। সাধারণত প্রতি জোড়া ক্রোমোসোম অন্য জোড়া অপেক্ষা স্বতন্ত্র প্রকারের হইয়া থাকে। পিতা ও মাতার দোষগুণ ক্রোমোসোমের অন্তর্গত জীন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

পুরুষের দেহকোষস্থ 23 জোড়া সমান ও একজোড়া অসমান ক্রোমোসোম

কিন্তু বংশগত পার্থক্য ধীরে ধীরে না ঘটিলে অভিব্যক্তিবাদ (evolution) অচল হইয়া পড়ে। আদিম প্রাণীগুলির কোষবিভাগ যদি অবিকল পুনরাবৃত্ত হইতে থাকিত, তাহা হইলে কোন নূতন প্রাণী বা উদ্ভিদের আবির্ভাব একেবারেই অসম্ভব হইত। পূর্বেই বলা হইয়াছে, ক্রোমোসোমের অন্তর্গত জীন জাতকের আকৃতি-প্রকৃতি নিয়ন্ত্রিত করে। যদি জনক এবং জননীর পরিপূরক ক্রোমোসোমদ্বয় (homozygous) উহাদের জীনের অবস্থান ও ধর্ম হিসাবে সর্বসম হয়, তবে সেই জীনের ধর্ম জাতকে (offspring) সম্পূর্ণ বর্তাইবে। কিন্তু জীনের অবস্থান ঠিক থাকিয়া ধর্মের (কটা চোখ, জোড়া ভ্রূ, বেঁটে গড়ন ইত্যাদি) পার্থক্য থাকিলে জাতকে যে-কোন এক ধর্ম প্রকট (dominant) হইতে পারে ও অপরটি অস্ফুট (recessive)

থাকিতে পারে।। উৎপন্ন জাতক হইতে যখন নূতন পুং-বীজ বা ডিম্বাণু (gametes) জন্মে, তখন সেই নবজাত কোষে ঐ দুইটি ক্রোমোসোমের যে-কোন একটি থাকিবে, অর্থাৎ মোট উৎপন্ন গ্যামেটের 50% উহার এক একটি ধর্মের অধিকারী হইবে। এইজন্য বংশপরম্পরায় কতকগুলি নূতন ধর্ম স্থায়ী হইবে। এই তত্ত্ব নানাপ্রকার কীটপতঙ্গ ও জীবজন্তুর উপর পরীক্ষা দ্বারা আলোচিত হইয়াছে ও বংশগতির প্রবণতা সম্বন্ধে নানাপ্রকার তথ্যও আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই সকল গবেষণার প্রথম পথিকৃৎ অষ্ট্রিয়ার বিখ্যাত জীবতত্ত্ববিৎ গ্রেগার যোহান মেণ্ডেল (1882—1884)।

মেণ্ডেল

5-4. অভিযোজন (Adaptation)

বাঁচিয়া থাকার চেষ্টা করা জীবমাত্রেরই সহজাত প্রবৃত্তি এবং যেহেতু বাঁচিয়া থাকিতে হইলে খাদ্য সংগ্রহ কবিতে হয় এবং শত্রুর কবল হইতে আত্মরক্ষা করিতে হয়, এইজন্য প্রত্যেক জীবের দেহেই খাদ্য সংগ্রহ করিবার ও আত্মরক্ষা করিবার উপযোগী অঙ্গপ্রত্যঙ্গ প্রাকৃতিক নিয়মেই গড়িয়া ওঠে। বীজ মাটিতে পুঁতিলে বীজটি যে-ভাবেই পোঁতা থাকুক না কেন, উহার ভ্রূণমূল নিম্নমুখে মাটির মধ্যে প্রবেশ করিতে চায় এবং ভ্রূণকাণ্ড আপনা-আপনি উপরে উঠিয়া আসিয়া সূর্যালোকে পাতা মেলিয়া ধরে। শতপদী কেন্নোর গায়ে শক্ত খোলা গড়িয়া উঠিয়াছে কোমল দেহযন্ত্রগুলিকে রক্ষা করিবার জন্য এবং উহাকে আঘাত করিলে কেন্নো কুণ্ডলী পাকাইয়া নিশ্চল হইয়া পড়িয়া থাকে। শামুক তাহার খোলা হইতে দেহ বাহির করিয়া খাদ্য খুঁটিয়া খায়, আঘাত পাইলে সঙ্কুচিত হইয়া খোলার মধ্যে ঢুকিয়া যায়, কেহ বা ঢাকনি দিয়া খোলার মুখ বন্ধ করিয়া দেয়।

জীবসৃষ্টির গোড়ার দিকে উদ্ভিদ্ ও প্রাণী সকল প্রকার জীব জলে বাস করিত। তখনও দুর্বল সবলের খাদ্য ছিল বলিয়া আত্মরক্ষার তাগিদে দুর্বলকে আত্মরক্ষার জন্য কতকগুলি উপায় অবলম্বন করিতে হইত। পলায়নের চেষ্টা অথবা পাল্‌টা আক্রমণ করিবার প্রবৃত্তি হইতে বংশানুক্রমে হয়তো বা ঐ দুর্বল জীবের দেহে এমন কোন অঙ্গ দেখা দিয়া থাকিবে, যাহাতে উহা দ্রুতগামী হইতে পারে অথবা আঁচড়াইয়া কামড়াইয়া শত্রুকে কাবু করিতে পারে। যতই জীবদেহে পরিপাক যন্ত্র, রক্তসঞ্চালন যন্ত্র প্রভৃতি নানাপ্রকার জটিল অঙ্গ গড়িয়া উঠিতে লাগিল, ততই বাঁচিয়া থাকিবার তাগিদে জীবদেহের গঠনও পরিবর্তিত হইতে লাগিল। পৃথিবীর স্থলভাগে জীবজগৎ গড়িয়া উঠিবার সঙ্গে সঙ্গে জীবদেহে নূতন নূতন অঙ্গ দেখা দিতে লাগিল। মাছের পাখ্‌না, পাখির ডানা এবং মানুষের হাত মেরুদণ্ডীর একই সম্মুখ অঙ্গের (fore-limb) বিভিন্ন রূপ মাত্র। যে-পরিবেশে বাস করিয়া কোন জীবকে খাদ্য সংগ্রহ করিয়া বাঁচিয়া থাকিতে হইবে, সেই পরিবেশের সহিত মানাইয়া চলার নীতিকে **অভিযোজন** (adaptation) বলে। কোন প্রাণী অথবা উদ্ভিদ্ আপনার চেষ্টাতে অভিযোজন ঘটাইতে পারে না, দীর্ঘকাল ধরিয়া ধীরে ধীরে পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে ঐ প্রাণীর অথবা উদ্ভিদের দেহকোষে মৌলিক পরিবর্তন ঘটিতে থাকে এবং তাহারই ফলে উহার দেহে নূতন নূতন বৈশিষ্ট্য দেখা দিতে থাকে। পৃথিবীর প্রাচীন শিলাস্তরে এমন সকল জীবের ফসিল পাওয়া যায় যাহা পর্যবেক্ষণ করিয়া আমরা বুঝিতে পারি, কোন আকস্মিক বিপর্যয়ে অভিযোজন করিবার পক্ষে যথেষ্ট সময় না পাইবার জন্য সে-সকল জীব পৃথিবী হইতে একেবারে বিলুপ্ত হইয়াছে। ডিনোসার জাতীয় বিপুলকায় প্রাগৈতিহাসিক সরীসৃপ ইহার একটি দৃষ্টান্ত।

অভিযোজন নানাপ্রকারে ঘটিতে পারে। এখানে কয়েকটি সাধারণ প্রণালী আলোচিত হইল।

(ক) **স্থলবাসী প্রাণীর দ্রুতিমূলক অভিযোজন** (Cursorial adaptation) **:** খরগোশ নিরীহ প্রাণী, কাজেই উহার শত্রুর অভাব নাই। ফলে খরগোশ আত্মরক্ষার জন্য দ্রুতগামী হইয়া পড়িয়াছে। ঘোড়া তৃণভোজী এবং বাঘ, সিংহ প্রভৃতি মাংসাশী পশুর খাদ্য। কিন্তু আত্মরক্ষার জন্য উহার শিং, নখ প্রভৃতি নাই বলিয়া ঘোড়া দ্রুতগামী।

দৌড়াইবার সুবিধার জন্য কালক্রমে উহার পায়ের হাড়গুলি শক্ত হাড়ে (cannon bone) পরিণত হইয়াছে এবং পায়ের আঙুল-গুলি একটি জোড়া খুরের আকার ধারণ করিয়াছে। ভারীদেহ উটপাখি উড়িতে পারে না বলিয়া উহার ডানা ক্রমে লোপ পাইতে বসিলেও উহার পা দুইটি অত্যন্ত দৃঢ় এবং উহা দ্রুতগামী।
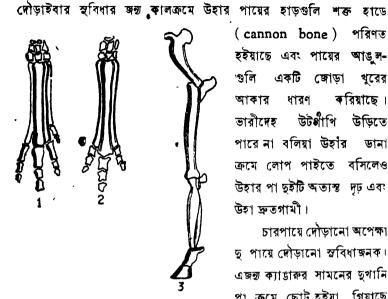
ঘোড়ার পায়ের গড়নের ক্রমবিকাশ
1. প্রথম অবস্থা, 2. দ্বিতীয় অবস্থা ; 3. আধুনিক অবস্থা

চারপায়ে দৌড়ানো অপেক্ষা দু পায়ে দৌড়ানো সুবিধাজনক। এজন্য ক্যাঙারুর সামনের দুখানি পা ক্রমে ছোট হইয়া গিয়াছে এবং পিছনের পা দুইটি দীর্ঘ ও সবল হইয়াছে। উহার লেজও অত্যন্ত শক্তিশালী বলিয়া লাফাইয়া চলিবার সহায়ক।

(খ) **জলচর প্রাণীর অভিযোজন** (Aquatic adaptation): মাছকে জলে বাস করিতে হয় বলিয়া তাহার দেহের সম্মুখ ও পশ্চাৎ সুচালো ও সহজে চলাফেরা করিবার জন্য দুপাশে দুখানি পাখ্না ছাড়াও অন্যান্য ছোট বড পাখনা থাকে। উহার লেজের অগ্রভাগ সবল ও সাঁতার কাটার উপযোগী। পেটের ভিতর বায়ুর থলি বা পট্‌কা থাকায় উহা ইচ্ছামত জলের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করিয়া ভাসিয়া থাকিতে ও বায়ু ছাড়িয়া দিয়া (ভুডভুডি কাটিয়া) জলের তলায় চলিয়া যাইতে পারে।

তিমির পূর্বপুরুষ এক সময়ে স্তন্যপায়ী স্থলচর প্রাণী ছিল, কিন্তু প্রায় 100/120 ফুট লম্বা ও ওজনে হাজার হাজার মনের দেহ (একটি নীলতিমি ওজনে 6-7 হাজার মন হইতে পারে) লইয়া উহাকে জলে বাস করিতে হইত, কারণ দেহের ওজন জলের মধ্যে অনেকখানি কমিয়া যায়। ফলে উহার হাত (অথবা ডানা পাখ্নায় পরিণত হইল, গায়ের লোম লোপ

পাইল এবং লেজ আড়াআড়ি ভাবে চ্যাপ্টা হইয়া সাঁতার কাটিবার সহায়তা করিল। হাঁস পাখি হইয়াও সাঁতার কাটিতে হয় বলিয়া উহার পায়ের আঙুলগুলি পাতলা চামড়া দিয়া জোড়া থাকে।

(গ) **বিবর-বাসী প্রাণীর অভিযোজন** (Fossorial adaptation) :

হাত-পা প্রভৃতি উঁচুনীচু অঙ্গপ্রত্যঙ্গ থাকিলে গর্তে প্রবেশ করিতে অসুবিধা হয় বলিয়া সাপ-জাতীয় সরীসৃপের দেহ সরল অঙ্গপ্রত্যঙ্গহীন। ছোট-বড় নানা আকারের ইঁদুর, যোল প্রভৃতি প্রাণী মাটির গর্তে বাস করে বলিয়া উহাদের শক্ত ও ধারালো দাঁত ও নখ গর্ত খুঁড়িবার উপযোগী হইয়া উঠে। অন্ধকারে বাস করে বলিয়া উহাদের দৃষ্টিশক্তি অত্যন্ত ক্ষীণ হয়।

(ঘ) **আরোহী প্রাণীর অভিযোজন** (Scansorial adaptation) :

কাঠবিড়াল, ভালুক প্রভৃতি প্রাণীর পায়ের পাতা বা থাবা গাছে চড়িবার পক্ষে উপযোগী। টিকটিকি, গিরগিটি প্রভৃতি সরীসৃপের পায়ের পাতায় ঢিলাচামড়া থাকায় উহারা পায়ের তলায় বায়ুশূন্য থলির সাহায্যে খাড়া দেওয়াল, বৃক্ষকাণ্ড প্রভৃতির গায়ে পা আটকাইয়া অনায়াসে ওঠানামা করিতে পারে। কোন কোন বানরের সম্মুখের পায়ের পাতা ও আঙুল গাছের ডালপালা ধরিয়া গাছে গাছে চলাফেরা করার উপযোগী। অনেক বানর লেজের সাহায্যে গাছে গাছে যাওয়া-আসা করে।

উদ্ভিদের দেহেও অনেক সময় উপর দিকে বাহিয়া উঠিবার উপযোগী অঙ্গ থাকিতে পারে। অধিকাংশ লতানে গাছের গায়ে (যেমন লাউ, কুমড়া, ঝিঙা, শশা প্রভৃতি) যে আকর্ষ (tendril) জন্মায়, তাহা কঞ্চি প্রভৃতিকে জড়াইয়া ধরিয়া উপরে উঠিয়া যায়। ঐ আকর্ষ প্রকৃতপক্ষে পাতার অথবা কাণ্ডের রূপান্তর মাত্র এবং অভিযোজন করিবার জন্যই ঐরূপ রূপান্তর ঘটে।

(ঙ) **খেচর প্রাণীর অভিযোজন** (Volant adaptation) :

জীবের ক্রমবিকাশে সরীসৃপ হইতে পাখির উৎপত্তি উহাদের দেহের অস্থির গঠন হইতে প্রমাণিত হইয়াছে। সরীসৃপের সম্মুখের অঙ্গ হাত ক্রমে উড়িবার প্রয়োজনে ডানায় পরিণত হইয়াছে। পাখির হাড়ের আকার ও ওজন ক্রমে হাল্কা হইতে গিয়া উহা ফাঁপা ও বায়ুপূর্ণ হইয়াছে। বৃহত্তম উড়ন্ত পাখি কনডরও ওজনে আধমণের বেশী হয় না। আকাশে উড়িতে হয় বলিয়া

পাখির পেশী অত্যন্ত সবল, গায়ের উষ্ণতা বেশী (প্রায় 45° সে., আমাদের গায়ের উষ্ণতা 36° 'সে.), এইজন্য খাদ্যের পরিমাণও বেশী। গায়ে যথেষ্ট পালক থাকায় উহার গায়ের উষ্ণতা রক্ষা করা অপেক্ষাকৃত সহজ হয়। উঁচু আকাশে উঠিয়া খাদ্যের সন্ধান করিতে হয় বলিয়া বাজ, শকুন প্রভৃতি পাখির দৃষ্টিশক্তি অত্যন্ত প্রখর হয়।

বাদুড় স্তন্যপায়ী, কিন্তু উড়িয়া খাদ্য সংগ্রহ করিতে হয় বলিয়া উহার হাতের হাড় ও আঙুল সমস্ত শরীরের সহিত পাতলা চামড়ায় আবৃত। বাদুড় ও চামচিকা ঐ চামড়ার ডানার সাহায্যে উড়িয়া বেড়ায় ও খাদ্য সংগ্রহ করে। স্পর্শশক্তি অত্যন্ত প্রখর বলিয়া ইহারা নানাপ্রকার বাধা এড়াইয়া অনায়াসে উড়িয়া বেড়াইয়া প্রচুর পরিমাণে পোকামাকড় উদরস্থ করিতে পারে। অতি ক্ষীণ আলোকেও ইহাদের উড়িবার কোন অসুবিধা হয় না।

লিমার (Lemer) বানরজাতীয় প্রাণী। মালয় অঞ্চলে একপ্রকার উড়ন্ত লিমারের পায়ের পাতা ও আঙুল এমনভাবে চামড়া দ্বারা সংযুক্ত থাকে
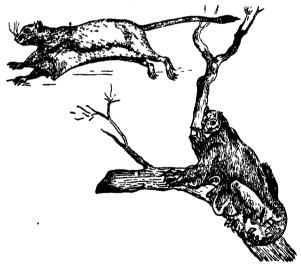
উড়ন্ত কাঠবিড়াল

যাহাতে উহারা ডালে ডালে উড়িয়া চলাফেরা করিতে পারে। ফিলিপাইন. বোর্নিও, জাপান প্রভৃতি অঞ্চলে ছোট ছোট একপ্রকার উড়ন্ত কাঠবিড়াল দেখিতে পাওয়া যায়। বাদুড়ের মত ইহারা নিশাচর জীব।

গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলের সমুদ্রে যে উড়ন্ত মাছ দেখিতে পাওয়া যায় উহারাই সম্ভবত উড়ন্ত মেরুদণ্ডীর প্রাচীনতম উদাহরণ। শত্রুর হাত হইতে

উড়ন্ত মাছ

আত্মরক্ষার প্রয়োজনে উহারা প্রসারিত পাখ্‌নার সাহায্যে বেশ কয়েক গজ শূন্যে উড়িয়া যাইতে পারে।

(চ) **দেহের জলীয় অংশ রক্ষার জন্য** (Adaptation for moisture conservation) :

মরুভূমি অঞ্চলে ভার বহনের জন্য উট ব্যবহৃত হয়। উহার পাকস্থলীতে অনেকগুলি জলপূর্ণ কোষ থাকে। প্রয়োজনমত সেই থলি হইতে জল বাহির করিয়া উটেরা তৃষ্ণা মিটায়।

উদ্ভিদ্‌-জগতে জল সঞ্চয় করিবার অথবা দেহে জল ধরিয়া রাখিবার জন্য নানাপ্রকার অভিযোজন দেখিতে পাওয়া যায়। মরুভূমির খেজুর গাছ মাটির অনেক নীচে উহার মূল চালাইয়া দেয় এবং সেখানে উহার সঞ্চয়ী মূল (tap-root) গড়িয়া উঠে। ফণীমনসা জাতীয় মরুভূমির গাছগুলিতে পাতা প্রায় থাকে না, কোন কোন গাছে পাতা ক্রমে সঙ্কুচিত হইয়া কাঁটায় পরিণত হয়। পাতা থাকিলে উহার রন্ধ্র দিয়া জলীয় বাষ্প বাহির হইয়া যাইবে বলিয়াই এইরূপ অভিযোজনের প্রয়োজন হয়।

(ছ) **দেহযন্ত্রের অভিযোজন** (**Physiological adaptation**) :

মেরুদণ্ডী প্রাণীর মধ্যে যাহারা উন্নত, তাহাদের রক্ত উষ্ণ, অর্থাৎ বাহিরের উষ্ণতার পরিবর্তনে তাহাদের দেহের উষ্ণতার তারতম্য ঘটে না (যেমন, মানুষের দেহের স্বাভাবিক উষ্ণতা প্রায় 37° সে.)। তাহাদের শরীরে বিশুদ্ধ

রক্ত সঞ্চালিত হইয়া থাকে। অবিশুদ্ধ রক্ত সঞ্চালিত হইবার পূর্বে ফুসফুসে অক্সিজেনের সাহায্যে বিশুদ্ধ রক্তে পরিণত হইয়া হৃৎপিণ্ডে ফিরিয়া আসে এবং পরে রক্তস্রোতে সঞ্চালিত হয়। কিন্তু সাপ, বেঙ প্রভৃতি অনুন্নত প্রাণীর দেহের রক্তস্রোত মিশ্রিত অবস্থায় থাকে বলিয়া উহাদিগকে শীতল রক্ত (cold blooded) বলে। উহারা উষ্ণতার সমতা রক্ষা করিতে পারে না বলিয়া সমস্ত শীতকাল ঘুমাইয়া কাটায়।

পেটের ভিতরকার ফিতা কৃমি সম্পূর্ণরূপে অপরের হজম করা খাদ্য আত্মসাৎ করিয়া বাঁচিয়া থাকে। এইজন্য উহার দেহে হজম করিবার যন্ত্র একেবারেই থাকে না।

এই সকল বিশেষ অভিযোজন ছাড়াও প্রাণীজগতে প্রাকৃতিক অবস্থার সহিত মানাইয়া চলার নানাপ্রকার রীতি চোখে পড়ে। বাঘের গায়ের রং পাটকিলে, মাঝে মাঝে কালো ডোরা, শিকারের প্রতীক্ষায় ঝোপ-জঙ্গলের পাশে বসিয়া থাকিলে পরিবেশের রংয়ের সহিত এমন মিলিয়া যায় যে কাহারও চোখে পড়ে না। এরূপ আত্মগোপন খাদ্যসংগ্রহের জন্য। অপরপক্ষে জেব্রার গায়ের রং ধূসর এবং উপরে কালো ডোরা। এক্ষেত্রে নিরীহ জেব্রা পরিবেশের রংয়ের সহিত আপনাকে মিলাইয়া রাখিয়া আত্মগোপনের চেষ্টা করে আত্মরক্ষার জন্য। সিংহের গায়ের রংও পিঙ্গল। উহা তৃণভূমিতে বাস করে। ঘাসের রংয়ের সহিত উহার গায়ের রং মিলিয়া যায় বলিয়া শিকার ধরার সুবিধা হয়। কিন্তু নবজাত সিংহের গায়ে চাকা চাকা দাগের আভাস দেখিয়া মনে হয় যে একসময়ে পশুরাজ চিতা প্রভৃতি পশুর ন্যায় গভীর জঙ্গলে বাস করিত। লাউডগা সাপ এমনভাবে সবুজ লতাপাতার সহিত মিশিয়া থাকে যে উহার খাদ্য পোকামাকড় নিশ্চিন্তে উহার মুখের নিকট আসিয়া বসে। সবুজ ফড়িং সবুজ ঘাসের সহিত মিলিয়া থাকিয়া আত্মরক্ষা করে। ছড়ি-পোকা সরু ডালপালার উপর বসিলে উহাকে ডালপালা বলিয়াই মনে হয়। যুদ্ধে শত্রুর চোখ এড়াইয়া জাহাজের অথবা সৈন্যদলের বিচরণ করিবার কৌশলকে ক্যামোফ্লাজ (Camouflage) বলে। সম্ভবত পশুপক্ষীর আত্মগোপনের কৌশল হইতে আমরা ঐ বিদ্যা শিখিয়াছি।

অনুশীলনী

১। অভিব্যক্তিবাদ কাহাকে বলে? অভিব্যক্তির অনুকূলে কি কি যুক্তি আছে, সংক্ষেপে আলোচনা কর।

২। জীব ও উদ্ভিদের বংশ বিস্তারের নীতি আলোচনা কর। বংশগতি বলিতে কি বুঝ লিখ। ক্রোমোসোম এবং জীন কাহাকে বলে? বংশানুক্রমে কিরূপে পরিবর্তন আসিতে পারে বল।

৩। অভিযোজন সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

সংক্ষিপ্ত বিষয়মূলক Objective Type প্রশ্ন

১। বিভিন্ন বিকল্প উত্তরগুলির মধ্যে কোনটি সত্য বল।

(ক) ডিনোসার প্রাচীন যুগের এক প্রকার অতিকায়—

(i) সরীসৃপ (ii) উভয়চর (iii) স্তন্যপায়ী

(খ) কাঙারু পাওয়া যায়—।

(i) দক্ষিণ আমেরিকায় (ii) অস্ট্রেলিয়ায় (iii) আফ্রিকায়

(গ) ব্যাঙ যে দুইটি বিভিন্ন প্রাণীর যোগসূত্র, তাহারা —।

(i) সরীসৃপ ও স্তন্যপায়ী (ii) সরীসৃপ ও মৎস্য

(ঘ) তিমি একপ্রকার ——

(i) মাছ (ii) সরীসৃপ (iii) স্তন্যপায়ী

এবং চিংড়ী এক প্রকার ——

(i) উভচর (ii) মাছ (iii) অমেরুদণ্ডী

(ঙ) উড়িতে হয় বলিয়া পাখির হাড় — থাকে।

(i) সরু (ii) বায়ুপূর্ণ (iii) নরম

উহার পেশী খুব — থাকে।

(i) সরু (ii) দুর্বল

উহার গায়ের উষ্ণতা আমাদের চাইতে —।

(i) বেশী (ii) কম

(চ) জীবের বংশগত বৈশিষ্ট্য বহন করিয়া চলে —

(i) রক্ত (ii ক্রোমোসোম (iii) জীন

২। শূন্যস্থান পূর্ণ কর:

(ক) বাদুড়ের —— শক্তি অত্যন্ত ক্ষীণ, কিন্তু — — শক্তি অত্যন্ত প্রখর। উহা পাখি নহে —।

(খ) ডিপনর — বটে, কিন্তু উহার — আছে। উহা মাছ ও — এই দুই শ্রেণীর প্রাণীর যোগসূত্র। ইহা — বাদের একটি —।

(গ) — বাস করিতে হয় বলিয়া সাপের — নাই। ইহা—এর একটি প্রমাণ। শীতল রক্ত বলিয়া উহারা — ঘুমাইয়া কাটায়।

(ঘ) মানুষের উদরে ক্ষুদ্রান্ত্রের নীচে যে — নামক অংশ আছে ইতর স্তন্যপায়ীর দেহে উহার নাম সিকাম। এই অবলুপ্ত-প্রায় অঙ্গ — বাদ প্রমাণ করে।

(ঙ) কোন কিছু জড়াইয়া উপরে ওঠার তাগিদে লাউ গাছে — থাকে। উহা কাণ্ডের রূপান্তর। ফণীমনসার কাঁটা উহার — রূপান্তর। — ক্রিয়া কমাইবার জন্য মরুভূমির গাছের এই রূপ — প্রয়োজন হইয়া পড়ে।

৩। হাঁ অথবা না লিখিয়া উত্তর দাও :—

(ক) মাছ নিশ্বাস ছাড়িবার সময় ভুড়ভুড়ি কাটে।

(খ) সিংহের গায়ের রং তাহার আত্মগোপনের অনুকূল।

(গ) তাড়াতাড়ি চলিতে পারে বলিয়া উটকে মরুভূমির জাহাজ বলে।

(ঘ) বাদুড়ের দুইটি হাতই উহার ডানা।

(ঙ) কাঠবিড়াল গিরগিটির ন্যায় সরীসৃপ।

(চ) অস্ট্রেলিয়ার প্লাটিপাস একপ্রকার পাখি।

(ছ) জলে ও স্থলে থাকিতে পারে বলিয়া ব্যাঙকে উভচর বলে।

(জ) কুমীর শীতকালে অনাহারে পড়িয়া থাকে।

(ঝ) বৃহত্তম মাছের নাম তিমি।

(ঞ) প্রোটোপ্লাজম এক প্রকার জীবাণু।

(ট) অভিব্যক্তিবাদে পক্ষীর পরেই স্তন্যপায়ী।

(ঠ) ক্রোমোসোম একপ্রকার রাসায়নিক পদার্থ।

———

কতিপয় পরিচিত ব্যাধি ও মারী
(Common diseases and Epidemics)

সূচনা

শরীরের স্বাভাবিক সুস্থ অবস্থার ব্যতিক্রমকে রোগ বা ব্যাধি বলা হয়। দেহযন্ত্র স্বভাবতই এমন সুদৃঢ় ও সুকৌশলে নির্মিত যে সুস্থ থাকাই তাহার সহজ ধর্ম। স্বাস্থ্য-তত্ত্বের নিয়মভঙ্গ না করিলে শরীরে ব্যাধি প্রবেশ করা সচরাচর সম্ভব নহে। তবে এমন কতকগুলি রোগ আছে যাহার নিদান এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই, এবং সেই রোগগুলি হইতে রক্ষা পাওয়ার কোন উপায় এখন পর্যন্ত নিশ্চয় করিয়া কোন স্বাস্থ্য-বৈজ্ঞানিক বলিতে পারেন নাই। Cancer বা কর্কটরোগকে এই পর্যায় ফেলা যায়। তাহা ছাড়া আঘাত বা অপঘাত-জনিত ব্যাধির উপর আমাদের স্বাস্থ্য-তত্ত্বের নিয়ম কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। হঠাৎ পড়িয়া গিয়া হাড় ভাঙ্গিলে যে স্বাস্থ্যভঙ্গ হইল তাহাকে অনিবার্য ব্যাধি বলিতে হইবে। শরীরে বিষ বা বীজাণু সংক্রমণের ফলে যে-রোগ হয়, ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত সতর্কতা অবলম্বন করিলে সে-রোগ নিবারণ করা সম্ভব। কলেরা, বসন্ত, প্লেগ, উদরাময় ইত্যাদি নিবার্য ব্যাধি। সৌভাগ্যক্রমে চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের দ্রুত অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে বহু রোগের উৎপত্তি ও নিদান আবিষ্কৃত হইয়া গিয়াছে। দেখা গিয়াছে, অধিকাংশ রোগই নিবার্য। কীট-পতঙ্গ-বাহিত রোগ, খাদ্য বিপর্যয় ও খাদ্যের প্রধান উপকরণগুলির অভাব বা অতিভাবজনিত রোগ, কলকারখানা ও খনি-পরিবেশজাত রোগ, এবং সর্বোপরি উদ্ভিজ্জ ও অপরাপর পরজীবী-জনিত রোগ নিবার্য ব্যাধির অন্তর্গত।

আয়ুর্বিজ্ঞানের আবির্ভাবের পূর্বে রোগের উৎপত্তি ও পরিচয় সম্বন্ধে মানুষের অতি অদ্ভুত ও বিকৃত ধারণা ছিল। বিধাতার অভিশাপ, গ্রহের কুদৃষ্টি অথবা অজ্ঞাত অতিপ্রাকৃত কারণ হইতেই রোগ জন্মে—ইহাই ছিল সাধারণ বিশ্বাস। যাদুমন্ত্র বা অভিচার দ্বারা মানুষের দেহে রোগ সঞ্চার করা যায়, এ-ধারণাও সমাজের প্রতি স্তরে বদ্ধমূল ছিল। চিকিৎসা-বিজ্ঞানের অরুণোদয়ে এই সকল

অন্ধ কুসংস্কার শিক্ষিত মানুষের মন হইতে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। এখন আর দেবতাকে নৈবেদ্য দিয়া বা ভূত-পিশাচের পুজা করিয়া অথবা গ্রহশান্তি করিয়া বা ডাইনীদের পোড়াইয়া মারিয়া রোগ নিবারণ বা প্রশমন করার প্রথা শিক্ষিত সমাজে প্রচলিত নাই। বিজ্ঞানের সোনার কাঠি মানুষের বহু যুগের ঘুম ভাঙ্গাইয়াছে। চিকিৎসা-বিজ্ঞানের কৃপায় মানুষ রোগ-নিবারণ ও রোগ-মুক্তির নূতন দিশা পাইয়াছে। এই নবযুগের যাঁহারা দিশারী তাঁহাদের মধ্যে লুই পাস্তর, রবার্ট কক্, রোনাল্ড্ রস্ প্রভৃতি মনীষীর নাম সর্বাগ্রগণ্য।

রোগ বা ব্যাধির কারণ ও প্রতিরোধের ব্যবস্থা

ব্যাধিবীজ (**Disease-producing organisms**) **:** সকল প্রকার ব্যাধি-সংক্রমণের মূলে রহিয়াছে অতি ক্ষুদ্র অণুতুল্য এক প্রকার প্রাণী; এগুলিকে সাদা চোখে দেখা যায় না। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে ইহারা দৃষ্টিগোচর হয়। ইহাদের সংক্রমণহেতু শরীরের বিশেষ স্থানে বা সর্বশরীরব্যাপী রক্তে যে-বিষক্রিয়া হয় তাহাতেই সুস্থ শরীরের অবস্থান্তর ঘটে ও দেহে রোগ বা ব্যাধি উৎপন্ন হয়। এই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীবগুলিকে **ব্যাধিবীজ** (germ) বলা হয়। এই ব্যাধিবীজগুলি ভূ-পৃষ্ঠে ও নিম্নস্তরের বায়ুমণ্ডলে সর্বত্র বিরাজমান। জলে-স্থলে আকাশে-বাতাসে সর্বত্র ইহাদের অনায়াস গতিবিধি। তবে আলোক ও উত্তাপ ইহারা অধিক পরিমাণে সহ্য করিতে পারে না। অত্যধিক শীতলতা ও উত্তাপ ইহাদের নির্জীব করিয়া ফেলে। 10-15 মিনিট ফুটন্ত জলে থাকিলে ইহাদের অধিকাংশই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। অন্ধকার ও স্যাঁতসেঁতে স্থান পাইলে বা প্রতিরোধ-শক্তিহীন দেহে আশ্রয় পাইলে দ্রুতগতিতে ইহাদের বংশ বৃদ্ধি পায়।

স্বাভাবিক প্রতিরোধের ব্যবস্থা : দেহের শোণিতে ব্যাধি-প্রতিরোধের প্রবল সহজাত শক্তি আছে। তাহা না হইলে আকাশে-বাতাসে মৃত্তিকায় সর্বত্র বিরাজমান ব্যাধিবীজের কবল হইতে আমরা কেহই কোন সময়েই রক্ষা পাইতাম না, এবং বাঁচিয়া থাকাটা অতি অনিশ্চিত এক বিড়ম্বনার ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইত। কৃত্রিম উপায়ে ও প্রয়োজনবোধে আমরা এই প্রতিরোধ-শক্তিকে অধিকতর কার্যকরী করিয়া তুলিতে পারি। স্বাভাবিক নিয়মেও শরীরে ব্যাধি সংক্রমিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই রক্তে উপযুক্ত পরিমাণ প্রতিরোধশক্তি

সৃষ্ট হয়। যদি কোনও কারণে এই শক্তি আক্রমণকারী ব্যাধির সমকক্ষ না হয় তবেই দেহ সেই ব্যধির কবলে পড়ে। **দেহের এই রোগবীজ ধ্বংসকারী ক্ষমতার নাম অনাক্রম্যতা** (immunity)।

সহজাত বা অন্তর্নিহিত অনাক্রম্যতার (natural বা inherited immunity) তারতম্য অনুসারে দেহের ব্যাধি-প্রবণতা নির্ভর করে। এই শক্তির তারতম্য জন্মগত, জাতিগত, বা কখনও কখনও ভৌগোলিক পরিস্থিতিগত কারণে ঘটিয়া থাকে।

দেহে ব্যাধিবীজ প্রবেশ করার স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া হিসাবে অনাক্রম্যতার যে অস্থায়ী বা স্থায়ী বৃদ্ধি ঘটিয়া থাকে তাহাকে সংপ্রাপ্ত অনাক্রম্যতা (acquired immunity) বলে।

কৃত্রিম উপায়ে প্রতিরোধের ব্যবস্থা

আপনা হইতে দেহে রোগবীজ প্রবেশ করিয়া অনাক্রম্যতা শক্তিকে যে সক্রিয় করিয়া তোলে তাহাকে **সংপ্রাপ্ত স্বাভাবিক সক্রিয় অনাক্রম্যতা** (natural active acquired immunity) বলে। আর যদি ব্যধিবীজ শল্যসহযোগে (ইন্‌জেক্‌শন পদ্ধতিতে) শরীরে প্রবেশ করানোর ফলে উপরোক্ত প্রতিক্রিয়া হয় তবে তজ্জনিত শক্তিকে **সংপ্রাপ্ত কৃত্রিম সক্রিয় অনাক্রম্যতা** (artificial active acquired immunity) বলা হয়। টাইফয়েড জ্বর, হাম, বসন্ত, প্লেগ প্রভৃতি রোগ হইলে দেহে প্রথমোক্ত ভাবে ও কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি রোগের প্রতিষেধক টিকায় দ্বিতীয়োক্ত ভাবে অনাক্রম্যতা সক্রিয় ও সতেজ করিয়া তোলা হয়। এই কৃত্রিম অনাক্রম্যতা সৃজনের তত্ত্বটি একটি আকস্মিক পর্যবেক্ষণের ফলে আবিষ্কৃত হয়।

টিকা

Dr. **এডওয়ার্ড জেনার** নামক একজন ইংরাজ চিকিৎসককে একদিন এক রোগিণী বলে যে, তাহার মারী বসন্তে (small pox) রোগাক্রান্ত হইবার ভয় নাই, কেন না তাহার গো-বসন্ত (cow pox) রোগ পূর্বেই হইয়া গিয়াছে। এই ইঙ্গিতটুকুর সূত্র ধরিয়া **জেনার** জানিতে পারেন যে বসন্ত রোগাক্রান্ত গাভী দোহন করিলে মারী বসন্তের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাওয়া যায় এরূপ একটি বিশ্বাস গ্রাম্য গোয়ালিনীদের মধ্যে বিরল নহে। অতঃপর বহু

গবেষণার পর, 1796 সালের 14ই মে তিনি বসন্তের টিকার প্রথম পরীক্ষা করেন জেমস্ ফিপস্ নামক এক বালকের দেহে। তিনি অতঃপর লক্ষ্য করেন যে তাঁহার প্রত্যাশা ব্যর্থ হয় নাই। গো-বসন্ত বীজের প্রভাবে তাহার শরীরে যে প্রতিক্রিয়া হয়, তাহাতে মারী বসন্ত প্রতিষেধক অনাক্রম্যতা প্রস্তুত হইয়া গিয়াছে। **এই টিকাকে** vaccination বলে। ইহা ল্যাটিন ভাষায় vacca অর্থাৎ গরু কথাটি হইতে বানানো হইয়াছে। এই টিকা আবিষ্কারের ফলে **জেনার** মানব জাতির এক প্রধান শত্রুকে কবলে আনিয়া বিশ্ববিশ্রুত কীর্তি রাখিয়া যান।

এডওয়ার্ড জেনার

সিরাম ইন্‌জেকসন

আর এক প্রকার অনাক্রম্যতা আছে। তাহার নাম **নিষ্ক্রিয় সংপ্রাপ্ত অনাক্রম্যতা** (passive acquired immunity)। কৃত্রিম উপায়ে ক্রমবর্ধমান মাত্রার বিশেষ বিশেষ ব্যাধিবীজ প্রাণিদেহে প্রবেশ করানোর ফলে তাহার **রক্তমস্তু** (serum)-তে বিশেষ বিশেষ রোগের বিষ-প্রতিষেধক শক্তি আবির্ভূত হয়। এই শক্তিসম্পন্ন রক্তমস্তু মানুষের শরীরে ইন্‌জেক্‌শন পদ্ধতিতে প্রবেশ করাইলে সেই রোগ-নিবারক বা নিয়ন্ত্রক অনাক্রম্যতার সৃষ্টি হয়। ধনুষ্টঙ্কার, ডিপথিরিয়া, মেনিঞ্জাইটিস প্রভৃতি রোগের প্রতিষেধক চিকিৎসা এইভাবেই হইয়া থাকে।

রাসায়নিক ও জীবজ প্রতিষেধক

উল্লিখিত বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় দেহের অনাক্রম্যতা শক্তিকে উদ্‌বুদ্ধ করিয়া তোলাই দেহকে রোগবীজের হাত হইতে রক্ষায় সর্বপ্রধান উপায়। দেহপ্রবিষ্ট রোগবীজকে নিষ্ক্রিয়, নিয়ন্ত্রিত বা ধ্বংস করার অন্যান্য উপায়ের মধ্যে অধুনা

আবিষ্কৃত রাসায়নিক ও জীবজ (antibiotic) ঔষধগুলি সর্বাপেক্ষা কার্যকর। এই ঔষধগুলির আবিষ্কার চিকিৎসা-শাস্ত্রে এক যুগান্তকারী অধ্যায়ের সূচনা করিয়াছে। বীজ-সংক্রামিত প্রধান প্রধান ব্যাধিগুলি চিকিৎসকের সম্পূর্ণ আয়ত্তে আসিয়া গিয়াছে। বিভিন্ন প্রকারের বিষ-ব্রণ, বিষাক্ত ক্ষত, মেনিঞ্জাইটিস, টাইফয়েড, রক্তমাশয় ও অপরাপর বীজাণুজনিত আন্ত্রিক ব্যাধি, ধনুষ্টঙ্কার, ডিপথিরিয়া, টিউবারকিউলোসিস্ ইত্যাদি মারাত্মক ব্যাধির কবল হইতে লক্ষ লক্ষ ব্যক্তি এই ঔষধগুলির কল্যাণে সম্পূর্ণ মুক্তিলাভ করিতে সক্ষম হইতেছে।

রাসায়নিক ঔষধগুলির মধ্যে সাল্ফা (sulphonamide বা সংক্ষেপে 'sulpha') গোষ্ঠীর প্রবর্তন সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা। জার্মান রাসায়নিক **ডোমাগ্** (Domagk) এ-বিষয়ে পথপ্রদর্শক। 1935 সাল হইতে 'সাল্ফা' চিকিৎসায় ব্যবহৃত হইতেছে। 'সাল্ফা' অতি শক্তিশালী ঔষধ। ইহা দেহস্থিত রোগ-বীজকে নাশ করিতে পারে না বটে, কিন্তু ইহার প্রভাবে দেহের মধ্যে বীজগুলির বংশবৃদ্ধি অসম্ভব হইয়া পড়ে বলিয়া রোগের বিস্তার সম্ভব হয় না, ইতিমধ্যে দেহের অনাক্রম্যতা শক্তি আসিয়া বীজের ধ্বংস-সাধন করে ও দেহ রোগমুক্ত হয়। নিউমোনিয়া, মস্তিষ্ক-মেরুদণ্ড অধিকারী জ্বর (cerebro-spinal fever), বিষাক্ত ব্রণ ও ক্ষত, কর্ণের অভ্যন্তর-প্রদাহ, রক্তামাশয়, মূত্রযন্ত্রের সংক্রমণ, কুষ্ঠ প্রভৃতি রোগে 'সাল্ফা'র কার্যকারিতা প্রমাণ হইয়া গিয়াছে। তবে টাইফয়েড, প্যারাটাইফয়েড, ডিপথিরিয়া, ধনুষ্টঙ্কার, টিউবারকিউলোসিস্ প্রভৃতি রোগ 'সাল্ফা' প্রয়োগে আরাম হইতে এখন পর্যন্ত দেখা যায় নাই।

জীবজ ঔষধ (antibiotics)-এর আবিষ্কার এক স্মরণীয় ঘটনা। এ-পর্যন্ত রোগবীজজনিত যাবতীয় রোগের ঔষধ গাছ-গাছড়া বা রাসায়নিক পদার্থ হইতেই প্রস্তুত হইত। 1928 সালে প্রফেসার **আলেক্জাণ্ডার ফ্লেমিং** কর্তৃক আবিষ্কৃত পেনিসিলিন্-ই সর্বপ্রথম জীবজ ঔষধ। লণ্ডনের এক হাসপাতালে স্ট্যাফাইলোকক্কাস্ রোগবীজ লইয়া গবেষণা করিবার সময় ফ্লেমিং একদিন সবিস্ময়ে লক্ষ্য করিলেন যে, একজাতীয় ছাতা (Penicillium notatum) পড়ার ফলে পরীক্ষাপাত্রস্থ বীজাণু-উপনিবেশগুলির প্রান্তদেশ

স্বাভাবিক নিয়মে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত না হইয়া বরঞ্চ ক্ষয়িষ্ণু হইয়া পড়িয়াছে। তিনি এই ছাতাকেই বীজাণু ধ্বংসের কারণ বলিয়া নির্দেশ করেন। এই ছাতাগুলি উদ্ভিদজাতীয় জীব। স্যাঁৎসেঁতে আবহাওয়ায় বহু নিত্যব্যবহার্য দ্রব্য ও খাদ্যবস্তুতে নীলাভ বা ঈষৎ সবুজ ছাতাপড়া আমরা সকলেই লক্ষ্য করিয়াছি। Penicillium notatum হইতে উদ্ভূত বলিয়া ফ্লেমিং এই নূতন বীজাণুনাশক পদার্থের নাম দিলেন **পেনিসিলিন্**। এই পদার্থের সম্পূর্ণ পরিচয় পাইতে ও ঔষধ আকারে ইহাকে প্রস্তুত করিতে আরও কয়েক

আলেকজাণ্ডার ফ্লেমিং

বৎসর লাগিয়া গেল। **ডাঃ ফ্লোরি ও ডাঃ চেইন্ নামক দুই সুযোগ্য বৈজ্ঞানিকের সহায়তায় ডাঃ ফ্লেমিং-এর বিস্ময়কর ঔষধ (wonder drug) গবেষণাগার হইতে মুক্তিলাভ করিয়া চিকিৎসার ব্যাপক-ক্ষেত্রে আসিয়া পড়িল**। 1940-41 সালে ইহা যুদ্ধে আহত সৈনিকদের চিকিৎসায় ব্যবহৃত হইল। 1946 সালে ইহা ব্যাপকভাবে প্রস্তুত হওয়ায় অসামরিক ব্যক্তিরাও নূতন ঔষধের গুণাগুণ পরীক্ষা করিতে পারিলেন। বর্তমানে পৃথিবীর বহু স্থানে পেনিসিলিন প্রস্তুতের কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। ভারতেও পুনার নিকট পিম্‌পিরি নামক স্থানে সরকারী সংযোগিতায় এইরূপ একটি কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। পেনিসিলিন-এর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া ক্রমে **অরিয়োমাইসিন** (Aureomycin) **স্ট্রেপটোমাইসিন** (Streptomycine), **ক্লোরোমাইসিটিন** (Chloro mycetin) প্রভৃতি অন্যান্য জীবজ ঔষধ আবিষ্কৃত হইয়াছে। সবগুলিই বিভিন্ন প্রকারের ছাতা (mould) হইতে প্রস্তুত। ক্লোরোমাইসিটিন রাসায়নিক প্রক্রিয়াতেও প্রস্তুত হইতেছে। পূর্বে যক্ষ্মা, টাইফয়েড ইত্যাদি দুরারোগ্য ব্যাধিগুলি চিকিৎসার কোন উপায় ছিল না। এখন সে সমস্যা নাই। "সাল্‌ফা' দ্বারা যে রোগ আরোগ্য হয় তাহা সাধারণত antibiotic দ্বারাও আরোগ্য হয়। উপরন্তু সাল্‌ফা যেখানে ব্যর্থ হইয়াছে

সেক্ষেত্রেও antibiotic কার্যকর হইয়াছে। তবে একটি কথা বিশেষভাবে মনে রাখা প্রয়োজন যে, বীজাণুরাও তাহাদের এই বিষম বিপদের মুখে চুপ করিয়া বসিয়া নাই। নূতন ঔষধগুলি প্রয়োগের ফলে প্রতিরোধশক্তি-সম্পন্ন (resistant trains) নূতন শ্রেণীর রোগবীজ শরীর আশ্রয় করিতেছে। সেজন্য, বিশেষ বিশেষ নির্বাচিত ক্ষেত্রে যেখানে রোগবীজের কোন তীব্র আক্রমণ হইতে দেহকে রক্ষা করার অন্য উপায় নাই, সেখানেই ইহাদের প্রয়োগ করা উচিত। নচেৎ-প্রতিরোধ-শক্তি-বিশিষ্ট নূতন নূতন ব্যাধিবীজ সৃষ্টির সহায়তা করিয়া চিকিৎসকগণ এই অমূল্য ঔষধগুলির কার্যকারিতা হরণ করিবেন ও তজ্জনিত নূতন সমস্যার উদ্ভব হইবে।

সংক্রমণ প্রতিরোধ ব্যবস্থা

রোগবীজ (germ)-এর সংক্রমণই মানবদেহে ব্যাধির সর্বপ্রধান কারণ। "রোগের আরোগ্য অপেক্ষা রোগ নিরোধই শ্রেয়" ("Prevention is better than cure")—এই নীতি অবলম্বন করিয়া পৃথিবীর সকল সভ্য দেশেই সরকারী স্বাস্থ্যবিভাগ রোগ নিবারণের দিকে উত্তরোত্তর অধিকতর অবহিত হইতেছেন। রোগবীজের ধ্বংস ও নিয়ন্ত্রণই রোগনিবারণের প্রধান উপায়।

জীবাণু নিরোধক প্রক্রিয়া: রোগবীজের ধ্বংসসাধনকে **নির্বীজন** (disinfection) বলা হয়। এই নির্বীজন প্রক্রিয়া এরূপ উপায়ে করিতে হইবে যাহাতে বীজগুলি সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয় অথচ মানবদেহের সংস্পর্শে আসিলে নির্বীজনের উপাদান দেহের বিশেষ কিছু ক্ষতি করিতে পারে না। ব্যাধিবীজের ধ্বংস সাধারণত দেহের বাহিরেই করিতে হয়। সম্পূর্ণ ধ্বংস যেখানে সম্ভব হয় না সেখানে বীজের বংশবৃদ্ধি, বিস্তার ও বিষক্রিয়াকে নিবারণ করিবার ব্যবস্থা করিতে হয়। দেহাভ্যন্তরে এই ধ্বংসসাধন, প্রশমন বা নিয়ন্ত্রণ বিভিন্ন ঔষধ সাহায্যে হইয়া থাকে। পেনিসিলিন প্রভৃতি antibiotic, **নির্বিষক** (anti-toxin) এই ঔষধগুলির মধ্যে প্রধান। দেহের ক্ষত স্থানকে নির্বীজন করিবার জন্য যে ঔষধ ব্যবহৃত হয় তাহাকে ক্ষত সংক্রমণ **নিরোধক** (antiseptic) বলা হয়। লর্ড লিস্টার নামক একজন বিখ্যাত ইংরাজ অস্ত্র-চিকিৎসক শেষোক্ত সংক্রমণ-নিরোধক পদ্ধতির উদ্ভাবক। পাস্তর ও কক্-

এর জীবাণু-তত্ত্ব অনুসরণ করিয়া 1866 সালে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হন যে, রোগবীজ (germ) সংক্রমণের ফলেই অস্ত্রোপচারের ক্ষত আশানুরূপ শীঘ্র সারিয়া ওঠে না ও অনেক ক্ষেত্রে রোগীর জীবন বিপন্ন হইয়া পড়ে। এই সিদ্ধান্তের বশে তিনি অস্ত্রোপচারের কক্ষ, অস্ত্রোপচারে ব্যবহৃত যাবতীয় বস্তু, রোগীর দেহে অস্ত্রোপচারের ক্ষেত্র ও অস্ত্রোপচারীর হস্ত জীবাণু নিরোধক প্রক্রিয়ায় জীবাণু সংক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার উপদেশ দেন। তাঁহার উদ্ভাবিত পদ্ধতিতে প্রথমে কার্বলিক অ্যাসিডই জীবাণু-নাশক ঔষধ হিসাবে ব্যবহৃত হইত। পরে এ পদ্ধতির বহু উন্নতি হয়। আধুনিক হাসপাতালে অস্ত্রোপচারকে সম্পূর্ণরূপে সংক্রমণশূন্য করিবার বহু বৈজ্ঞানিক উপায় অবলম্বিত হইয়া থাকে। অস্ত্রোপচারে ব্যবহৃত পদার্থগুলিকে নির্বীজ করিবার জন্য অধিকতর বায়ুচাপ বিশিষ্ট বাষ্পযন্ত্র (sterilizer)-এর মধ্যে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য রাখিয়া দেওয়া বর্তমান শোধন পদ্ধতির প্রধান অঙ্গ।

রোগবীজ-ধ্বংসী নির্বীজন : রোগবীজ-ধ্বংসী নির্বীজন (disinfection) প্রণালীকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যায় :

(1) প্রাকৃতিক উপাদান সাহায্যে নির্বীজন (**Disinfection by natural agents**) : মুক্ত বায়ু ও সূর্যরশ্মি বীজনাশক। রৌদ্র ও বায়ুর প্রবেশ নিষিদ্ধ বাসগৃহই ব্যাধিবীজের রাজধানী।

(2) ভৌতিক উপাদান সাহায্যে নির্বীজন (**Disinfection by physical agents**) : ফুটন্ত জল বা 100° ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত উত্তপ্ত জলে 15—20 মিনিট থাকিলে প্রায় সকল ব্যাধিবীজই বিনষ্ট হয়। ফুটন্ত জলে রোগীর ব্যবহৃত বা ব্যবহার্য বস্তু শোধিত করিয়া লওয়া সর্বাপেক্ষা সুলভ নির্বীজন পদ্ধতি। উষ্ণ-বাষ্পও বীজাণুনাশক। ইহাও অপেক্ষাকৃত সুলভ পদ্ধতি।

(3) রাসায়নিক উপাদান সাহায্যে নির্বীজন (**Disinfection by chemical agents**) : এই উপাদানগুলি কঠিন, তরল বা গ্যাসজাতীয় হইতে পারে। কঠিন উপাদানের মধ্যে সাধারণ চুন অথবা কলিচুন সুলভ। দেওয়ালে মধ্যে মধ্যে চুনকাম-করা গৃহের ব্যাধিবীজ নিবারণ প্রণালীর অন্যতম। আলকাতরাজাত (Coal-tar derivative) রাসায়নিক বীজনাশক উপাদানের মধ্যে লাইজল (Lysol), ফিনল (Phenol বা carbolic acid) ও ক্রিজল (Cresol) প্রধান। জলের সহিত বিভিন্ন পরিমাণে মিশ্রিত

করিয়া ইহাদের দ্রবের (solution) মধ্যে সংক্রমিত বস্তু ডুবাইয়া রাখিয়া নির্বীজিত করা হয়। ফর্‌ম্যাল্‌ডিহাইড্ (formaldehyde) গ্যাস প্রয়োগে সংক্রমিত কক্ষ বা আবদ্ধ স্থানকে বিশুদ্ধ করা হয়। কোথাও কোথাও গন্ধক পোড়াইয়াও অনুরূপ ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে। গ্যাস প্রয়োগে আবদ্ধ স্থানকে নির্বীজিত করার নাম ফিউমিগেশন (fumigation)। 10% ফরম্যালিন (formalin) দ্রবে ডুবাইয়া রোগীর ব্যবহৃত দ্রব্য বা মলমূত্র, থুথু নির্বীজ করিতে পারা যায়।

জল, দুধ প্রভৃতি ফুটাইয়া খাওয়া, ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা সম্বন্ধে অবহিত থাকা, খাদ্যদ্রব্য উত্তমরূপে ঢাকিয়া রাখা সংক্রামক ব্যাধি নিরোধ বা নিয়ন্ত্রণের পক্ষে অত্যাবশ্যক।

জনসাধারণের স্বাস্থ্যের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিবার জন্য পৃথিবীর সকল সভ্যদেশেই সরকারী জনস্বাস্থ্য বিভাগ গঠিত। জনবহুল নগরগুলিতে পৌর-প্রতিষ্ঠান (Municipal Corporation) এ বিষয়ে সাহায্য করেন। তাহা ছাড়া সারা পৃথিবীতে সবময় দৃষ্টি রাখিবার জন্য সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ (United Nations)-এর অধীন বিশ্ব-স্বাস্থ্য সংস্থা (World Health Organisation বা সংক্ষেপে W. H. O.) রহিয়াছে।

স্বতন্ত্রীকরণ ব্যবস্থা: সংক্রামক ব্যাধির বিস্তার বন্ধ করিতে হইলে ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তির স্বতন্ত্রীকরণ (isolation) অবশ্যকর্তব্য। প্লেগ, কলেরা, টাইফয়েড, ডিপথিরিয়া, মেনিঞ্জাইটিস্, বসন্ত প্রভৃতি সংক্রামক ব্যাধির আবির্ভাব হইলে সঙ্গে সঙ্গে জনস্বাস্থ্য অধিকর্তাকে তাহা বিজ্ঞাপিত করা (notification) আইনানুসারে অবশ্যকর্তব্য। সংক্রামক ব্যাধি চিকিৎসার স্বতন্ত্র হাসপাতাল বা ওয়ার্ড-এ রোগীকে অবিলম্বে ভরতি করিয়া তাহার বাসগৃহ, ব্যবহৃত পোশাক-পরিচ্ছদ, আসবাব ইত্যাদি নির্বীজন করা জনস্বাস্থ্য বিভাগের কর্ম। রোগের মূল কেন্দ্র নিরূপণ করিয়া রোগ-উচ্ছেদের ব্যবস্থা এই বিভাগ করিয়া থাকেন। বন্দর ও বিমানঘাঁটির স্বাস্থ্য-অধিকর্তারাও বিদেশ হইতে আসিয়া কোন রোগী বা তৎসংশ্লিষ্ট অপর কোন ব্যক্তি যাহাতে রোগ ছড়াইতে না পারে সে বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়া থাকেন। সন্দেহজনক ক্ষেত্রে যাত্রীর পর্যবেক্ষণমূলক স্বতন্ত্রীকরণ (quarantine)-এর ব্যবস্থা আছে।

সংক্রামক ব্যাধিগুলি বিভিন্ন পথ (channel) দিয়া দেহে প্রবেশ করে নাসাপথ, মুহ-গহ্বর ও ত্বক্ রোগবীজ প্রবেশের তোরণস্বরূপ। ব্যাধিবীজ বায়ু-চালিত হইয়া নাসাপথ ও মুখ দিয়া শ্বাসযন্ত্রে প্রবেশ কবিতে পাবে, খাদ্য ও পানীয়ের সহিত মিশিয়া পরিপাকযন্ত্রে প্রবেশ কবিতে পাবে, কীট-পতঙ্গ-বাহিত হইয়া অথবা সংক্রমিত ব্যক্তিব দেহে বা ব্যবহৃত দ্রব্যের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে ত্বক মাধ্যমে প্রবেশ করিতে পাবে। কোন সংক্রামক ব্যাধি যদি একই কালে অপেক্ষাকৃত বৃহৎ ক্ষেত্র জুড়িয়া বহু ব্যক্তিকে আক্রমণ করে তবে তাহাকে মারী (Epidemic) বলে। মাবী যদি বিশালক্ষেত্রে ভীষণ আকারে দেখা দেয় তবে তাহাকে মহামারী (Pandemic) বলা হয়। 1957 সালে ইনফ্লুয়েঞ্জা (Influenza বা Flue) রোগ আমাদের দেশে ও জাপানে মারীরূপে দেখা দিয়াছি। প্রথম মহাযুদ্ধেব পব এই রোগ মহামারীব করালরূপ ধরিয়া সারা পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড়িযাছিল।

1. **বায়ু-বাহিত ব্যাধি** (Air-borne disease)

বায়ু-পরিচালিত সংক্রামক ব্যাধিব মধ্যে সর্দি-কাশি, ইনফ্লুয়েঞ্জা, নিউমোনিয়া, যক্ষ্মা ও ডিপথিরিয়াই প্রধান।

সর্দি-কাশি (Common cold) :

এই রোগে আক্রান্ত হওয়াব দুর্ভাগ্য অল্পাধিক সকল ব্যক্তিরই হইয়া থাকে। অনেকের দেহে এ রোগেব বিরুদ্ধে অনাক্রম্যতা বড়ই অল্প, সেজন্য প্রায়ই তাহাদেব সর্দি-কাশিতে ভুগিতে হয়।

রোগলক্ষণ—রোগেব প্রারম্ভে নাসাপথ ও গলনালীর শুষ্কতা ও একটা অস্বস্তিবোধ আসে। সমস্ত শরীরে একটা অস্বাচ্ছন্দ্যবোধ ও অল্প জ্বরভাব থাকে। পরে নাক বন্ধ হইয়া যায়, নাক-চোখ দিয়া জল পড়ে, হাচি হইতে থাকে। নাকের তরল জল ক্রমে গাঢ় ও পুঁজ-শ্লেষ্মার মিশ্রণ হইয়া দাঁড়ায়। মাথাধরাও একটি সাধারণ লক্ষণ। পরে কাশি দেখা দেয়। সপ্তাহ দুই রোগ-ভোগের পর রোগী সুস্থ হইতে আরম্ভ করে। কোন একটি বিশেষ বীজাণু হইতে যে এ রোগেব উদ্ভব, তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ এখন পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই ; তবে Micrococcus Catarrhalis, Friendlander's Bacillus Pneumococcus Bacillus Influenza, Streptococcus, staphylococcus প্রভৃতি

বীজাণু একক বা সম্মিলিত ভাবে দায়ী বলিয়া মনে হয়। হঠাৎ গরম হইতে ঠাণ্ডা বা ঠাণ্ডা হইতে গরমে আসিলে অনেক সময়ে দেহের প্রতিবোধ-শক্তি কমিয়া যায়। সে সময়ে উপরোক্ত রোগ-বীজের সংক্রমণে সর্দি-কাশির সূত্রপাত হয়।

চিকিৎসা—এ রোগের নির্দিষ্ট কোন চিকিৎসা নাই। লক্ষণ বুঝিয়া ঔষধ দেওয়া প্রয়োজন। ক্ষার (alkali), কুইনাইন, স্যালিসিলেট্, মেন্থল, ইউক্যালিপ্টাস্ প্রভৃতি সুগন্ধি উদ্ভিজ্জ তৈল, সাল্ফা ইত্যাদি ঔষধ সাধারণত ব্যবহৃত হয়। নাসাপথে ফোঁটা বা কণিকা আকারে নানাপ্রকার ঔষধ প্রয়োগ করিয়া নাক পরিষ্কার রাখার ব্যবস্থা আছে।

প্রতিরোধের উপায়—যাহাদের পুনঃ পুনঃ সর্দি কাশি রোগ হয়, চলতি ভাষায় যাহাদের 'সর্দির ধাত'—তাহাদের উপরোক্ত বীজাণুগুলি হইতে প্রস্তুত টিকার সাহায্যে অনাক্রম্যতা বাড়াইবার চেষ্টা করা হয়। অনেক সময় ইহাতে সুফল পাওয়া যায়। সংক্রমিত ব্যক্তির সংস্পর্শে না আসা, মুক্ত বায়ু সেবন করা, স্যাঁৎসেঁতে আলো-বাতাসহীন কক্ষে বাস না করা, শীতাতপের অসাম্য সম্বন্ধে সতর্ক হওয়া এই রোগ-প্রতিরোধের উপায়।

ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা (Influenza) :

ইনফ্লুয়েঞ্জা বা ফ্লু (Influenza or Flue) অতি সহজেই এক রোগী হইতে অন্য রোগীতে সংক্রমিত হয় ও দ্রুতগতিতে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। ইহা কখনও কখনও বিচ্ছিন্নভাবে (sporadic) ঘটিলেও সাধারণত মারী ও মহামারী-রূপেই দেখা দেয়।

রোগলক্ষণ—জ্বর, সর্বাঙ্গে ব্যথা—বিশেষ করিয়া মাথা ও সন্ধিগুলির (joints) তীব্র যন্ত্রণা—অত্যধিক দুর্বলতা ও অল্পাধিক পরিমাণে শ্বাসযন্ত্রের প্রদাহ এই রোগের প্রধান লক্ষণ। জ্বর অনেক সময়ে ক্ষিপ্রগতিতে বাড়িয়া যায়। কখনও কখনও সারা দেহে লালাভ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুটি বাহির হয়। চক্ষু প্রদাহ ও নাকে সর্দি লাগা প্রায় সকল রোগীর মধ্যেই দেখা যায়। 4 হইতে 6 দিন রোগভোগের পর সাধারণত রোগমুক্তি হয়। হৃদযন্ত্রের দুর্বলতা ও মানসিক অবসাদ এ রোগের সর্বপ্রধান উপসর্গ। অনেকের মতে Bacillus Influenza (বা Pfeiffer's Bacillus)-ই ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগের মূল কারণ। তবে সকল ক্ষেত্রেই দেখা যায় ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগীর দেহে অন্যান্য ব্যাধিবীজ, যথা

Micrococcus Catarrhalis, Staphylococcus aureus মূল বীজ B Influenza-র সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করিয়া বসিয়াছে। ফলে ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা একটি বহুরূপী ব্যাধি। ইহার লক্ষণ ও উপসর্গ বিভিন্নভাবে দেওয়া হয়।

চিকিৎসা— এ রোগের কোন নির্দিষ্ট চিকিৎসাক্রম নাই। রোগীর অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করিতে হয়। ক্ষার, স্যালিসিলেট, সালফা, ভিটামিন 'সি', পেনিসিলিন্, অ্যাসপিরিন্ প্রভৃতি ঔষধ এ রোগের চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়। রোগের সময়ে ও রোগমুক্তির পরে রোগীর কিছুদিন সম্পূর্ণ বিশ্রাম প্রয়োজন, নচেৎ হৃদ্‌যন্ত্রের দুর্বলতায় রোগীর আকস্মিক মৃত্যু পর্যন্ত ঘটিতে পারে।

প্রতিরোধের উপায়—ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা রোগীর স্বতন্ত্রীকরণ ব্যতীত এ রোগ প্রতিরোধের অন্য কোন উপায় নাই। এ-রোগ রোগীর দেহে কোনরূপ অনাক্রম্যতা সৃষ্টি করে না। টিকা দ্বারা ইহার প্রতিষেধ হয় না।

2. জলবাহিত ব্যাধি (Water-borne disease)

পানীয়বাহিত সংক্রামক ব্যাধির মধ্যে কলেরা, টাইফয়েড ও আমাশয়ই প্রধান।

কলেরা (Cholera):

কলেরা, ওলাওঠা বা বিসূচিকা (Cholera) রোগ একপ্রকারের সংক্রামক ও মারাত্মক উদরাময়।

রোগলক্ষণ—ভেদবমি, হাতপায়ে খিল ধরা, প্রস্রাব রোধ ও গভীর শারীরিক অবসাদ এ রোগের প্রধান লক্ষণ। ঘন ঘন মলত্যাগ ও বমির জন্য রোগীর দেহে জলীয় ভাগের হ্রাস ঘটে। এজন্য পিপাসার শান্তি হয় না। মল ক্রমে জলের মত পাতলা হয় ও পিত্তের স্বাভাবিক বর্ণ লোপ পাওয়ায় অনেকটা চাল-ধোয়া জলের মত দেখায় (rice-water stools)। রোগী সম্পূর্ণ অবসন্ন হইয়া পড়ে, ত্বক্ বিবর্ণ হইয়া যায়, মুখ চুপসাইয়া যায়, আঙ্গুলের চর্ম কুঞ্চিত হয়, গলার স্বরের বিকৃতি ঘটে, দেহের উত্তাপ অস্বাভাবিকরূপে নামিয়া যায় এবং সুচিকিৎসার ব্যবস্থা না হইলে 12 হইতে 36 ঘণ্টার মধ্যে রোগী মৃত্যুমুখে পতিত হয়। মূত্রযন্ত্রের বিকলতা ও প্রস্রাব রোধ (uraemia) শেষ পর্যন্ত কঠিন উপসর্গ হইয়া দাঁড়ায়।

চিকিৎসা—অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধির ন্যায় **এক্ষেত্রেও Sulfa-প্রমুখ রাসায়নিক ঔষধ ও ক্লোরোমাইসেটিন, স্ট্রেপটোমাইসিন প্রভৃতি অ্যান্টিবায়োটিক ঔষধ যুগান্তর সৃষ্টি করিয়াছে**। ভেদবমির সহিত দেহের জলীয় ও লবণজাতীয় পদার্থ প্রভূত পরিমাণে বাহির হইয়া যাওয়ার ফলে যে সকল আশঙ্কাজনক উপসর্গ দেখা দেয় সেগুলি রোধ করিবার জন্য **রোজার্স** (Sir Leonard Rogers) **উদ্ভাবিত ক্ষার ও লবণ সংমিশ্রিত দ্রবণ (Roger's Alkaline saline solution) রোগীর শিরায় প্রবেশ করাইয়া দেওয়া কলেরা চিকিৎসার একটি অতি প্রয়োজনীয় অঙ্গ। Vibrio Cholerae নামক এক জীবাণুর সংক্রমণই কলেরা রোগের হেতু। 1883 সালে রবার্ট কক্ এই জীবাণু আবিষ্কার করেন।** অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে লক্ষ্য করিলে দেখা যায়, ইহার আকৃতি অনেকটা ইংরাজী কমা (,) চিহ্নের ন্যায়। ইহারা অপেক্ষাকৃত ক্ষীণজীবী। সূর্যালোক ইহারা সহ্য করিতে পারে না। ফুটন্ত জল বা নির্বীজক রাসায়নিক পদার্থের সংস্পর্শে আসিলে ইহারা সহজেই বিনষ্ট হয়। তবে ঠাণ্ডায় ইহাদের বিশেষ ক্ষতি হয় না। এমন কি বরফের মধ্যেও ইহাদের বাঁচিয়া থাকিতে দেখা যায়।

প্রতিরোধের উপায়--কলেরা মারী হইতে রক্ষা পাইবার সর্বপ্রধান উপায় কলেরা-প্রতিষেধক টিকা লওয়া। এই টিকার অনাক্রম্যতা স্বল্পকাল স্থায়ী। সেজন্য এই টিকা পুনঃ পুনঃ লওয়া প্রয়োজন হইতে পারে। রোগীর স্বতন্ত্রীকরণ ও তাহার ব্যবহৃত দ্রব্যের নির্বীজন বা বিনাশ একান্ত কর্তব্য। রোগীর মল যাহাতে যত্র-তত্র নিক্ষিপ্ত না হয়, নিক্ষেপের পূর্বে নির্বীজিত হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। বিভিন্ন উপায়ে পানীয় ও খাদ্যের বিশুদ্ধতা ও সংক্রমণ-শূন্যতার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। মক্ষিকাদি বীজাণুবাহক যাহাতে খাদ্য ও পানীয়কে সংক্রমিত করিতে না পারে সেদিকেও সতর্ক দৃষ্টি রাখা আবশ্যক।

টাইফয়েড (Typhoid) :

রোগলক্ষণ—টাইফয়েড বা আন্ত্রিক জ্বর (Typhoid বা Enteric fever) সাধারণত পানীয়ের মাধ্যমেই সংক্রমিত হয়। ইহা পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র বিচ্ছিন্ন (sporadic) ভাবে প্রাদুর্ভূত হয়। তবে পৌর-স্বাস্থ্যের মান উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে ইহা অনেকটা নিয়ন্ত্রিত হইয়া আসিতেছে।

অপেক্ষাকৃত মন্থর সংক্রমণ, ক্রমবর্ধমান মেয়াদী জ্বর, শিরঃপীড়া, অগ্নিমান্দ্য, অবসাদ, মুখ ও জিহ্বার শুষ্কতা, সামান্য প্লীহা (spleen) বৃদ্ধি, কোষ্ঠকাঠিন্য অথবা উদরাময়. অল্প অল্প কাশি, হৃদ্‌যন্ত্রের দুর্বলতা, নাড়ীর গতি হ্রাস ও বিকার এ রোগের প্রধান লক্ষণ। টাইফয়েড ব্যাধিবীজজনিত বিষক্রিয়াই রোগীর শারীরিক অবনতির কারণ। সুচিকিৎসার আশ্রয় না লইলে রোগ দুই হইতে তিন সপ্তাহ পর্যন্ত স্থায়ী থাকে ও ক্রমে ধীরে ধীরে জ্বর নামিতে থাকে। তবে ইতোমধ্যে মারাত্মক উপসর্গ দেখা দিতে পারে। টাইফয়েড জীবাণুর আক্রমণের ফলে ক্ষুদ্র অন্ত্রের স্থানে স্থানে ক্ষত দেখা দেয়। ক্ষত হইতে অধিক রক্তমোক্ষণের ফলে রোগীর মল অস্বাভাবিক বর্ণযুক্ত হয়। রোগের এই অবস্থাটি বড় মারাত্মক। কখনও কখনও ক্ষতের ফলে অন্ত্র ছিদ্র হইয়া যায় ও রোগীর জীবনসঙ্কট উপস্থিত হয়। সৌভাগ্যক্রমে জীবজ ঔষধ (antibiotics) আবিষ্কারের ফলে এই ভয়াবহ রোগজনিত মৃত্যুর হার বিশেষ ভাবে হ্রাস পাইয়াছে।

চিকিৎসা—যথাসময়ে চিকিৎসা আরম্ভ হইলে প্রায় সকল ক্ষেত্রেই রোগীকে আরোগ্য করা যায়। **ইহার শ্রেষ্ঠ ঔষধ ক্লোরোমাইসিটিন**। ইহা বর্তমানে রাসায়নিক পদ্ধতিতে প্রস্তুত হইতেছে। ইহার মৌলিক নাম ক্লোরাম-ফেনিকল। ইহার **সহিত অথবা স্বতন্ত্র ভাবে টেরামাইসিন, অ্যাক্রোমাইসিন্, আইলোটাইসিন্ প্রভৃতি অ্যান্টিবায়োটিক ঔষধ ব্যবহার করিয়া টাইফয়েড রোগকে চিকিৎসার আয়ত্তে আনা হইয়াছে**। তবে লক্ষণ ও উপসর্গ বিচার করিয়া অন্যান্য ঔষধও প্রয়োগ করা হয়। টাইফয়েড রোগীর শুশ্রূষা বিশেষ যত্নের সহিত করা প্রয়োজন। দুঃখের বিষয়, আরোগ্যলাভ করিয়া আপাতত স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসার পরও অত্যল্প কাল মধ্যেই অল্পসংখ্যক রোগী টাইফয়েড রোগে পুনরাক্রান্ত হয় (relapse cases)। **Bacillus Typhosus (of Eberth) নামক *এক প্রকার ব্যাধিবীজ দেহে প্রবেশ করিয়া দেহের রক্তস্রোতে* মিশিয়া যাইবার ফলেই এই রোগের সৃষ্টি হয়**। রক্তের মাধ্যমে ইহা ক্ষুদ্র অন্ত্র, আন্ত্রিক গ্রন্থিগুচ্ছ, যকৃৎ, পিত্তকোষ প্রভৃতি আক্রমণ করে।

প্রতিরোধের উপায়—টাইফয়েড রোগ একবার আক্রমণ করার ফলে সাধারণত রোগীর দেহে স্থায়ী অনাক্রম্যতার সৃষ্টি হয়। কলেরার ন্যায়

টাইফয়েড-এরও প্রতিষেধক টিকা আছে। সম্মিলিত টি. এ. বি. সি. (Typhoid-Para-typhoid A and B Cholera)-র টিকা লইলে টাইফয়েড, প্যারাটাইফয়েড (টাইফয়েড জাতীয় অপেক্ষাকৃত মৃদু রোগ) ও কলেরার আক্রমণ হইতে সাময়িকভাবে রক্ষা পাওয়া যায়। এক্ষেত্রেও রোগবিস্তার নিরোধ করিতে হইলে মক্ষিকাদি নিয়ন্ত্রণ, রোগীর স্বতন্ত্রীকরণ ও তাহার যাবতীয় ব্যবহৃত দ্রব্যের উপযুক্তরূপ নির্বীজন প্রয়োজন। মলমূত্রাদি নির্বীজন ও নিক্ষেপের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে। সংক্রমণ হইতে আত্মরক্ষাকল্পে সবপ্রকার সতর্কতা অবলম্বন রোগীর পরিচর্যাকারিকদের পক্ষে অবশ্যকতব্য। খাদ্য ও পানীয় পবিশুদ্ধ রাখিবার প্রযত্ন করিতে হইবে।

আমাশয় (Dysentery):

আমাশয় একাধিক প্রকারের আছে। তন্মধ্যে ব্যাধিবীজসৃষ্ট রক্ত আমাশয় (Bacillary dysentry) একটি কঠিন সংক্রামক ব্যাধি। সাধারণত ইহার বীজাণু খাদ্য ও পানীয়ের দ্বারা সংবাহিত হইয়া এক দেহ হইতে অন্য দেহে সংক্রমিত হয়।

রোগলক্ষণ—রোগীর হঠাৎ কঠিন উদরাময়ের লক্ষণ প্রকাশ পায়। ঘন ঘন মলত্যাগের বেগ, পেটে তীব্র যন্ত্রণা, বমিভাব ও জ্বর রোগীকে অক্ষম ও শয্যাগত করিয়া ফেলে। মলের সহিত প্রচুর রক্ত ও শ্লেষ্মা নির্গত হয়। যথাসময়ে উপযুক্ত চিকিৎসা না করাইলে এ রোগ মারাত্মক হইয়া উঠিতে পারে।

চিকিৎসা—অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধির ন্যায় এখন ইহাও নবাবিষ্কৃত সালফা- ও অ্যান্টিবায়োটিক ঔষধগুলির আয়ত্তে আসিয়া পড়িয়াছে। **সালফাগুয়া-নিডিন, সালফা-থায়োজোল, ক্লোরাম্ফেনিকল্, স্ট্রেপটোমাইসিন, টেট্রাসাইক্লিন্** প্রভৃতি ঔষধ এ রোগে প্রায় অব্যর্থ। Bacillus dysenteriae নামক ব্যাধিবীজ সংক্রমণের ফলেই এই রোগ জন্মে। 1897 সালে জাপানী বৈজ্ঞানিক শিগা সর্বপ্রথম ইহা আবিষ্কার করেন। ঐ বৎসরই জার্মান বৈজ্ঞানিক ক্রুজ তাহা সমর্থন করেন। এজন্য **এই ব্যাধিবীজের অপর নাম** Shiga-Kruse. bacillus. 1900 **সালে ফ্লেক্স্নার নামক অপর এক বৈজ্ঞানিক ইহারই সমগোত্রীয় বীজ আবিষ্কার করেন। তাহার নাম**

Flexner's bacillus. এই শিগা বা ফ্লেক্স্নার শ্রেণীর আমাশয়-বীজ রোগীর বৃহৎঅন্ত্রে ক্ষত সৃষ্টি করে।

প্রতিরোধের উপায়—এ রোগ প্রধানত পানীয়-বাহিত। এজন্য পানীয় জলের বিশুদ্ধতা রোগবিস্তার প্রতিষেধের জন্য অত্যাবশ্যক। মক্ষিকা ও ধূলাবালির মাধ্যমে সংক্রমণ বিস্তার লাভ করে। এজন্য খাদ্য ও পানীয়কে উপরোক্ত সংক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে হইবে। রোগীর স্বতন্ত্রীকরণ ও তাহার ব্যবহৃত দ্রব্যাদির নির্বীজন, মলের নির্বীজন ও উপযুক্ত প্রক্ষেপণ একান্ত প্রয়োজন।

3. কীটপতঙ্গ-বাহিত ব্যাধি

(Insect-borne diseases)

ম্যালেরিয়া (Malaria) :

ম্যালেরিয়া একপ্রকার সকম্প সবিরাম, রক্তক্ষয়ী, প্লীহাবর্ধক জ্বর। ম্যালেরিয়া কথার অর্থ বিষাক্ত বায়ু (Mal=bad, aer=air) অস্বাস্থ্যকর জলাভূমির বিষাক্ত বায়ুই রোগের মূল কারণ—এই বিশ্বাসই পূর্বে প্রচলিত ছিল। বৈজ্ঞানিকদের ধারাবাহিক অক্লান্ত সাধনার ফলে এ ধারণা দূর হইয়া ম্যালেরিয়ার প্রকৃত কারণ প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে। এই রোগ গ্রীষ্মমণ্ডলের সর্বত্র (tropical countries) বিস্তৃত, এবং প্রাণহানির কথা বিবেচনা করিলে ইহা মানুষের সর্বপ্রধান শত্রু। বিভিন্ন প্রকারে স্বাস্থ্যহানি ঘটাইয়া ইহা মানুষকে দুর্বল ও অক্ষম করিয়া তোলে (malarial cachexia), যথাবিহিত চিকিৎসা করিলে রোগ সারিয়া যায়। নচেৎ ইহা পুনঃপুনঃ জ্বরের প্রত্যাবর্তন, দেহে রক্তাল্পতা ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক লক্ষণের সৃষ্টি করে ও তদুপরি যক্ষ্মা, আমাশয় প্রভৃতি মারাত্মক ব্যাধির ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া থাকে।

রোনাল্ড্ রস ও ম্যালেরিয়া :

ইংরাজ বৈজ্ঞানিক স্যার রোনাল্ড্ রস্ ভারতীয় চিকিৎসা বিভাগের উচ্চপদস্থ চিকিৎসক ছিলেন। কলিকাতার প্রেসিডেন্সী জেনারেল হাসপাতাল (অধুনা শেঠ সুখলাল কারনানী হাসপাতাল)-এর প্রাঙ্গণে অবস্থিত এক

ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে দীর্ঘকাল ধরিয়া অনুসন্ধান করিবার ফলে 1807 সালে তিনি এক জগদ্বিখ্যাত তত্ত্ব আবিষ্কার করেন। তিনি নিঃসংশয়ে প্রমাণ করিয়া দেন, ম্যালেরিয়া-আক্রান্ত এক ব্যক্তির রক্ত হইতে যে অপর ব্যক্তির রক্তে পরজীবী (Malarial Parasite) সংক্রমিত হয় তাহার মূলে রহিয়াছে এক প্রকার মশক। তিনি এই তথ্য প্রমাণ করিবার পূর্বে ইহা কোন কোন বৈজ্ঞানিকের মস্তিষ্কে অনুমান হিসাবেই প্রতিষ্ঠিত ছিল। পরে আরো অনুসন্ধানের ফলে প্রমাণিত হয় যে, অ্যানোফিলিস জাতীয় মশকীর দংশনেই ম্যালেরিয়া দেহ হইতে দেহান্তরে ছড়াইয়া পড়ে। ম্যালেরিয়া রোগ প্রতিরোধ ও চিকিৎসা ব্যাপারে রস্-এর আবিষ্কার যুগান্তকারী বলা চলে।

রোনাল্ড রস্

রোগলক্ষণ—জ্বর সাধারণত শীত ও কম্প দিয়া আসে ও কয়েক ঘণ্টা থাকিবার পর ঘাম দিয়া জ্বর ছাড়িয়া যায়। প্রকারভেদে এই জ্বর নিয়মিত সময়ের ব্যবধান বজায় রাখিয়া আসিতে থাকে। কোটিডিয়ান ম্যালেরিয়া জ্বর (quotidian) প্রতিদিন আসে ও ছাড়িয়া যায়, কোয়ার্টান (quartan) প্রতি চতুর্থ দিনে ও টার্শিয়ান্ (tertian) প্রতি তৃতীয় দিনে আসে। টার্শিয়ান্ ম্যালেরিয়ার দুইটি রূপ আছে : **অপেক্ষাকৃত নিরাপদ** (B. T বা Benign Tertian) ও **সাংঘাতিক** (M.T. Malignant বা Tertian)। প্রোটোজোয়া (protozoa) **জাতীয় সর্বনিম্নস্তরের এককোষী** (unilcellular) **অতি ক্ষুদ্র একপ্রকার পরজীবীই** (malaria parasite) **ম্যালেরিয়া রোগের সৃষ্টিকারক**। এই পরজীবীর অনেকগুলি শ্রেণী আছে, Plasmodium ইহার গোষ্ঠীগত নাম। ইহার মধ্যে Plasmodium vivax বি টি-র, Plasmodium malariae কোয়ার্টান-এর ও Plamodium falciparum এম. টি-র কারণ বলিয়া নির্ধারিত হইয়াছে। 1880 **খ্রীষ্টাব্দে লাভেরাঁ** (Alphonse

Laveran) **নামক এক ফরাসী চিকিৎসক এই পরজীবী আবিষ্কার করেন।** 1894 হইতে 1897 সালের মধ্যে বহু গবেষণা ও পর্যবেক্ষণের ফলে **ম্যানসন্** (Manson) ও **রস্** (Ronald Ross) প্রমাণ করিতে সক্ষম হন যে এই পরজীবীর জীবনধারণের জন্য মনুষ্য ও মশক উভয়ের দেহকেই সাময়িক-ভাবে আশ্রয় করা একান্ত আবশ্যক। মশক দংশনের মুহূর্তে ইহারা এই দেহ পরিবর্তনটুকু সারিয়া লয়। প্রকৃত পক্ষে রস্-ই প্রথম এই স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে মনুষ্য হইতে মনুষ্যান্তরে ম্যালেরিয়া বিস্তারের একমাত্র উপায় ম্যালেরিয়া জীববাহী মশকের দংশন। পরবর্তী গবেষকরা প্রমাণ করেন যে অ্যানোফেলিস্ (anopheles) জাতীয় মশকীরাই এজন্য দায়ী।

চিকিৎসা—ম্যালেরিয়ার সর্বজনপরিচিত ঔষধের নাম **কুইনিন্**। ইহা সিঙ্কোনা গাছের ছাল হইতে প্রস্তুত হয়। 1638 সালে দক্ষিণ-আমেরিকার পেরু দেশে লাট-পত্নী কাউন্টেস্ অব্ সিঙ্কোন্ জ্বরাক্রান্ত হইয়া পড়েন। স্থানীয় এক অধিবাসী এক বৃক্ষের বল্কল হইতে ঔষধ প্রস্তুত করিয়া তাহাকে আরোগ্য করে। তাঁহার নামেই বৃক্ষের নামকরণ হয়। কুইনিন্ ব্যতীত আরও কতকগুলি ঔষধ ম্যালেরিয়া চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়। **অ্যাটেব্রিন্, প্লাস্মোচিন্** বা **প্লাস্মোকুইন্, মেপাক্রিন্, নিভাকুইন্, ক্যামোকুইন্ প্রভৃতি আধুনিক ঔষধগুলি অনেকের মতে কুইনিন্ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।** তবে সকল প্রকার সুবিধা-অসুবিধা বিচার করিয়া দেখিলে এই মতকে নিঃসংশয়ে গ্রহণ করা চলে না বলিয়া বোধ হয়।

প্রতিরোধের উপায়—ম্যালেরিয়ার ব্যাপক প্রতিরোধ করিতে হইলে মশক-নিধনই সর্বপ্রধান কর্তব্য। এজন্য মশকীদের প্রজনন স্থল, স্রোতহীন অপরিচ্ছন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলাভূমিগুলি ভরাট করিয়া বা তদুপরি যথেষ্ট পরিমাণে তৈলাক্ত ডি. ডি. টি (D. D. T.) ছড়াইয়া মশক ধ্বংস করা প্রয়োজন। ঝোপেঝাড়ে ও গৃহের ভিতরেও ডি. ডি. টি. ছড়ানো আবশ্যক। মশারির ভিতরে নিদ্রা যাওয়া ও ম্যালেরিয়া-রোগীর সম্পূর্ণ চিকিৎসা করা ম্যালেরিয়া নিরোধের পক্ষে অপরিহার্য। অনেকের মতে ম্যালেরিয়ায় ভুগিয়া ভুগিয়া রোগীর দেহে অনাক্রম্যতার সৃষ্টি হয়। কতকটা এই কারণে ও কতকটা সরকারী ম্যালেরিয়া-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় বাংলাদেশে ও ভারতের অনেক স্থানে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ কিছু কমিয়াছে বলিয়া মনে হয়।

প্লেগ (Plague)

প্লেগ একটি অতি মারাত্মক সংক্রামক ব্যাধি। বহু প্রাচীন কাল হইতেই ইহা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বিবিধ ভূখণ্ডে মহামারীরূপে দেখা দিয়া লক্ষ লক্ষ লোকের প্রাণহানির কারণ হইয়া আসিতেছে। সম্প্রতিকালে ইহা উষ্ণমণ্ডলেই সীমাবদ্ধ। ভারতবর্ষের বহু স্থানে ইহার প্রাদুর্ভাব মাঝে মাঝে ঘটিয়া থাকে। কিছুদিন পূর্বে ইহা কলিকাতা মহানগরীতেও মারীরূপে দেখা দিয়াছিল।

রোগলক্ষণ—প্লেগের কয়েকটি প্রকার ভেদ আছে। তাহার মধ্যে গ্রন্থি প্রদাহিক (Bubonic) প্লেগই প্রধান। সংক্রমণের দুই হইতে পাঁচ দিনের মধ্যে হঠাৎ কম্প দিয়া তীব্র জ্বর আসিয়া পড়ে। সেই সঙ্গে উৎকট মাথাধরা, মাথাঘোরা, বমি, উদরাময়, দৌর্বল্য ও মানসিক উদ্বেগ দেখা দেয়। রোগের দ্বিতীয় বা তৃতীয় দিনে কুঁচকি, বগল, ঘাড় প্রভৃতি স্থানের লসিকা-গ্রন্থিগুলি (lymph glands) ফুলিয়া ওঠে ও ক্রমে পাকিয়া যায়। চিকিৎসিত না হইলে রোগীর মৃত্যু প্রায় অবধারিত। রোগ আরম্ভ হইবার তৃতীয় হইতে পঞ্চম দিবসের মধ্যেই সাধারণত মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। রক্তের মধ্যে অসংখ্য প্লেগবীজাণুর বিষক্রিয়ার ফলে বা শ্বাসপথের সংক্রমণে প্লেগরোগের অন্যান্য প্রধান লক্ষণগুলি যথাক্রমে প্রকাশ পায়। **বিকার, দেহের নানাস্থান হইতে রক্তস্রাব, গভীর শারীরিক দুর্বলতা, সারাদেহে যন্ত্রণা, শ্বাসকষ্ট, কাশি এই লক্ষণগুলির অন্যতম। ব্যাসিলাস পেস্টিস** (Bacillus pestis) **নামক জীবাণু হইতেই প্লেগের সৃষ্টি হয়।** 1894 সালে জাপানী বৈজ্ঞানিক কিটাসাটো (Kitasato) প্রথম এই জীবাণু আবিষ্কার করেন। ইন্দুর-বাহিত মক্ষিকা (rat-flea, Xenopsylla cheopis)-কে আশ্রয় করিয়া এই ব্যাধিবীজ চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়ে। মক্ষিকার উদরে বীজাণুর বংশবৃদ্ধি হয় ও ইহার বিষ্ঠার সহিত অসংখ্য বীজাণু বাহির হয়। মক্ষিকার মুখে অবস্থিত বা তাহার উদগারের সহিত আগত বীজাণুও রোগবিস্তারে সাহায্য করে।

চিকিৎসা—পূর্বে এ-রোগের প্রকৃত চিকিৎসা একরূপ অসম্ভব ছিল। **নবাবিষ্কৃত অ্যান্টিবায়োটিক ঔষধ, যথা—স্ট্রেপ্টোমাইসিন ইহাতে বিশেষ কার্যকর বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে।** এই মূল ঔষধ ব্যতীত লক্ষণানুযায়ী অন্যান্য ঔষধ প্রয়োগ প্রয়োজন।

প্রতিরোধের উপায়—প্লেগ প্রতিরোধের সর্বপ্রধান উপায় ইন্দুর ধ্বংসের সামগ্রিক ব্যবস্থা। শস্যভাণ্ডারে ইন্দুরের প্রবেশপথগুলি বন্ধ করিয়া দিতে হইবে। রোগীর স্বতন্ত্রীকরণ, তাহার ব্যবহৃত দ্রব্যাদির নির্বীজক গ্যাস প্রয়োগে শোধন—প্লেগ-নিয়ন্ত্রণের পক্ষে অত্যাবশ্যক। যথাসময়ে টিকা লইলে সাময়িকভাবে প্লেগের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাওয়া যায়।

3. চর্ম রোগ
(Diseases by contact)

সচরাচর যে সংক্রামক চর্মরোগ দেখিতে পাওয়া যায় উহাদের মধ্যে দদ্রু বা দাদ (Ringworm) ও পাঁচড়া (Scabies) প্রধান।

দদ্রু (Ringworm) :

ছত্রাক (ছাতা) জাতীয় একপ্রকার নিম্নস্তরের উদ্ভিদ্ (fungus)। ত্বক, চুল, নখ প্রভৃতি দেহের আবরণস্থান আক্রমণ করার ফলে দদ্রু রোগের সৃষ্টি হয়। আক্রমণকারী fungus-এর শ্রেণীভেদে দাদও বিভিন্ন প্রকারের হয়।

রোগলক্ষণ—মাথার চুল অথবা চুলের গোড়া আক্রান্ত হইলে মাথা খুশ্‌কিতে ভরিয়া যায়, চুল ক্রমশ নিস্তেজ ও ভঙ্গুর হইয়া ঝরিয়া পড়ে। নখে এই রোগ হইলে নখের স্বাভাবিক বৃদ্ধি নষ্ট হইয়া যায়। নখে ক্ষত দেখা দেয়। হাত-পায়ের আঙ্গুলগুলির মাঝে বা জঙ্ঘার সন্ধিস্থলে প্রায়ই দাদ হইতে দেখা যায়। অপরিচ্ছন্ন ও আর্দ্র থাকার ফলেই এরূপ হইয়া থাকে। ক্ষতের পরিধি ঈষৎ উন্নত ও লালাভ হয়। ক্ষতটা অনেকটা পাংশু বর্ণের দেখায় ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আঁশ বা খুশ্‌কিতে ভরিয়া যায়। চুলকানি অতি তীব্র ও যন্ত্রণাদায়ক হয়। চুলকানোর পর পরিধি হইতে আঠা-আঠা রস গড়ায়।

চিকিৎসা—**স্যালিসিলিক্ অ্যাসিড্** (Salicylic acid), **বেন্‌জোয়িক্ অ্যাসিড্** (Benzoic acid), **জেন্‌শিয়ান্ ভায়োলেট্** (Gentian violet), **ভায়োফরম্** (Vioform) **প্রভৃতি ঔষধ-সংযুক্ত মলম এই রোগের চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়**। অন্য চিকিৎসায় ফল না পাইলে অনেক সময় রঞ্জনরশ্মি (X-ray) প্রয়োগে এ-রোগের চিকিৎসা করিতে হয়।

প্রতিষেধের উপায়—রোগীর অথবা তাহার ব্যবহৃত শয্যাদ্রব্য, পরিধেয় প্রভৃতি সংক্রমিত বস্তুর সংস্পর্শে না আসাই এ-রোগ প্রতিষেধের উপায়। দেহের পরিচ্ছন্নতা সম্বন্ধে সর্বদা সজাগ দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন।

পাঁচড়া (Scabies) :

পাঁচড়া অপরিচ্ছন্ন দেহের চর্মরোগ। ইহা চর্মের একপ্রকার ক্ষত।

রোগলক্ষণ—ক্ষতস্থানে চুলকানি থাকে। ঐ স্থানে ফুস্কুড়ি ও পুঁয সঞ্চার হয়। চিকিৎসিত না হইলে এ-রোগ দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে ছড়াইয়া পড়ে। চুলকানোর ফলে ক্ষত হইতে আঠা-আঠা রস গড়ায়। রস, পুঁয ইত্যাদি শুকাইয়া ক্ষতের উপর একটি পাতলা চামড়ার ন্যায় আবরণ সৃষ্টি করে। ক্ষত আরোগ্য হইয়া গেলে ঐ স্থানে নতন ত্বক জন্মায়। **অতি ক্ষুদ্র মাকড়সার ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট অষ্টপদযুক্ত সাদা রং-এর এক প্রকার কীটাণু** (Sacroptes Scabiei) **হইতেই এই রোগ জন্মায়।** এই কীটাণু অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্য না লইয়াও দেখা যায়। স্ত্রী কীট ডিম পাড়িবার উদ্দেশ্যে ত্বকের উপরিতল স্তর ভেদ করিয়া অতি ক্ষুদ্র গর্ত সৃষ্টি করিয়া তাহার মধ্যে আশ্রয় লয়। এ অবস্থায় খালি চোখে ইহাদিগকে ক্ষুদ্র বিন্দুবৎ দেখায়। দুই-তিন সপ্তাহ ইহারা একভাবে টিকিয়া থাকে ও প্রায় ৩০টি ডিম পাড়ে। তিন চার দিনের মধ্যে ডিম ফুটিয়া বাচ্চা বাহির হয় ও আরও এক সপ্তাহের মধ্যে এগুলি পূর্ণাঙ্গ কীটাণুর অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এই কীটাণু দেহের অন্যান্য স্থানে ছড়াইয়া পড়ে।

চিকিৎসা—পাঁচড়ার ক্ষতগুলি গরম জল ও নির্বীজক সাবান সাহায্যে উত্তমরূপে পরিষ্কৃত করিয়া গন্ধক (Sulphur)-যুক্ত মলম লাগানোই এতদিন এ-রোগের শ্রেষ্ঠ চিকিৎসা ছিল। অধুনা **বেন্‌জিল বেন্‌জোয়েট** (Benzyl Benzoare) **নামক রাসায়নিক পদার্থ সংযুক্ত ঔষধ প্রয়োগে বিশেষ সুফল পাওয়া যাইতেছে।**

প্রতিষেধের উপায়—রোগীর স্বতন্ত্রীকরণ ও তাহার শয্যাদ্রব্য ও পরিধেয় বস্ত্রাদি উত্তমরূপে নির্বীজন এই রোগ প্রতিষেধের উপায়। দেহ ও পরিবেষ্টনীর পরিচ্ছন্নতা সর্বাগ্রে আবশ্যক।

অনুশীলনী

১। ব্যাধি সংক্রমণের মূল কি ?

২। মনুষ্যদেহে ব্যাধি-প্রতিরোধের সহজাত শক্তি কি প্রকারে জন্মায় ? উহা কিসে নষ্ট হয় ? কৃত্রিম উপায়ে প্রতিরোধের ব্যবস্থা বর্ণনা কর।

৩। রাসায়নিক ও জৈবিক প্রতিরোধক সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

৪। বায়ুবাহিত ব্যাধি কি কি ? উহারা কিরূপে সংক্রমিত হয় ?

৫। সর্দি, কাশি ও ইনফ্লুয়েঞ্জা ব্যাধির প্রধান লক্ষণ, কারণ, চিকিৎসা ও সংক্রমণ প্রতিরোধের উপায় আলোচনা কর।

৬। জলবাহিত ব্যাধি কি কি ? কলেরা, টাইফয়েড, আমাশয় প্রভৃতি ব্যাধির প্রধান লক্ষণ, কারণ, চিকিৎসা এবং সংক্রমণ প্রতিরোধের উপায় লিখ ?

৭। কীটবাহিত ব্যাধি কি কি ? উহাদের প্রধান লক্ষণ, কারণ, চিকিৎসা ও সংক্রমণ নিবারণের উপায় আলোচনা কর।

৮। ম্যালেরিয়া রোগের কারণ এবং উহা কি প্রকারে সংক্রমিত হয় লিখ।

৯। ম্যালেরিয়া ও প্লেগ রোগের প্রতিরোধের উপায় বর্ণনা কর।

১০। ছোঁয়াচে রোগ কি কি ? উহাদের লক্ষণ, কারণ, চিকিৎসা এবং সংক্রমণ প্রতিরোধ উপায় বর্ণনা কর।

সংক্ষিপ্ত বিষয়মূলক প্রশ্ন (Objective type)

১। বিভিন্ন বিকল্প উত্তরগুলির মধ্যে কোনটি সত্য বল ঃ

(ক) সর্দি-কাশির সাধারণ লক্ষণ

(i) জ্বরে তীব্র যন্ত্রণা

(ii) মাথাধরা

(iii) কাশি

(খ) ইনফ্লুয়েঞ্জার সাধারণ লক্ষণ

(i) নাক চোখ দিয়া জল পড়ে

(ii) অত্যধিক দুর্বলতা

(iii) মানসিক অবসাদ

(গ) কলেরা রোগের সাধারণ লক্ষণ

(i) জ্বর

(ii) ভেদবমি

(iii) মূত্রযন্ত্রের বিকলতা

(ঘ) টাইফয়েডের লক্ষণ

(i) ঘন ঘন মলত্যাগ ও বমি (ii) উদরাময় (iii) শিরঃপীড়া

(ঙ) আমাশয় রোগের সাধারণ লক্ষণ

(i) ক্রমবর্ধমান মেয়াদী জ্বর

(ii) কঠিন উদরাময়

(iii) মলের সহিত প্রচুর রক্ত ও শ্লেষ্মা নির্গত হওয়া

(চ) ম্যালেরিয়া রোগের সাধারণ লক্ষণ

(i) উৎকট শিরঃপীড়া

(ii) জ্বর দিনে রাতে উঠানামা করা

(iii) জ্বর প্রতিদিন আসে ও ছাড়িয়া যায়

(ছ) প্লেগ রোগের সাধারণ লক্ষণ

(i) সন্ধির (joint) বেদনাসহ তীব্র জ্বর

(ii) নাসিকা গ্রন্থিগুলির ফুলিয়া ওঠা ও ক্রমে পাকিয়া যাওয়া

(iii) দেহের নানাস্থান হইতে রক্তস্রাব

২। (i) 'হ্যাঁ' বা 'না' লিখিয়া উত্তর দাও

(ক) টীকা দ্বারা ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগের প্রতিরোধ হয় —

(খ) কলেরা রোগীর স্বতন্ত্রীকরণ একান্ত আবশ্যক —

(গ) টাইফয়েড কীটবাহিত ব্যাধি —

(ঘ) ম্যালেরিয়া পানীয়বাহিত সংক্রামক ব্যাধি —

(ঙ) প্লেগ ছোঁয়াচে রোগ —

(চ) পাঁচড়া বায়ুবাহিত ব্যাধি —

(ii) কোন্ কোন্ রোগের চিকিৎসার কোন্ কোন্ ঔষধ ব্যবহার করিতে হয় বল

(ক) সর্দি-কাশি	বেঞ্জিল বেঞ্জোয়েট
(খ) ইনফ্লুয়েঞ্জা	কুইনাইন
(গ) ম্যালেরিয়া	মেন্থল
(ঘ) টাইফয়েড	অ্যাস্পেরিন
(ঙ) আমাশয়	ক্লোরোমাইসিটিন
(চ) কলেরা	অ্যাটেব্রিন
(ছ) প্লেগ	ষ্ট্রেপটোমাইসিন
(জ) দদ্রু	সেলিসিলিক অ্যাসিড
(ঝ) পাঁচড়া	সালফা